অকারণের পথ

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৩৩৭

—সাড়ে চার টাকা—

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করকমলেষু



অকারণের পথ

এক

—'চল যাই !'

কথাটা যেন কেমন দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শোনাল। যেতে কারও ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে আরও কিছুক্ষণ—আরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। কিন্তু বেলা পড়ে এল, আর দেরি করা চলে না—এর পর যদি কাছে-পিঠে কোথাও আশ্রয় না পাই তবে বিষম বিপদে পড়তে হবে।

কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে উঠতেও তো মন সরে না !—আশ্চর্য, এই পথে কতবার যাতায়াত করেছি, একাধিকবার পরেশনাথ আরোহণও করেছি, কিন্তু হাতের কাছেই যে এত সুন্দর অথচ এমন রহস্যময় একটা স্থান পড়ে রয়েছে সে কথা তো কারও কাছে কোনদিন শুনতে পাই নি !

আমরা যেখানে বসে আছি ঠিক তার সামনে দিয়ে একটি ক্ষীণতোয়া খরধারা পার্বত্য স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে। কিন্তু এই জলধারার খাতটি একটু অসাধারণ—দেখলে মনে হয় যেন ময়-দানবের সগোত্র কোন প্রাগৈতিহাসিক স্থপতি বজ্রশিলার কংক্রিট ঢেলে একদা একটা বিরাট নালা তৈরি করেছিল, সেই নালা বেয়ে জলের স্রোত ছুটেছে। বিরাট একখানা পাথর—নিরেট, নীরন্ধ্র, তাম্রাভ কৃষ্ণবর্ণ আগ্নেয়শিলা—পরেশনাথের পাদদেশে ঢালু হয়ে পড়ে আছে; দৈর্ঘ্য খুব কম হলেও তিন-চার শ গজ, বিস্তার চল্লিশ-পঞ্চাশের বেশি নয়। পাহাড় থেকে ঝরে পড়া জলস্রোত আশপাশের সমস্ত নরম জমি ছেড়ে এই কঠিন পাথরেরই বুক চিরে লম্বালম্বি পথ করে নিয়েছে। শত-শতাব্দীর প্রবাহ-প্রচেষ্টার ফলে আজ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এই বিচিত্র পাথুরে নদী। দু পাশের তীরভূমি শান-বাঁধানো ঘাটের মত মসৃণ, পরিচ্ছন্ন। ঝরে পড়া শুকনো পাতাও তার উপর দাঁড়াতে পারে না—গড়িয়ে গিয়ে জলে পড়ে, তার পর স্রোতের টানে ভেসে চলে যায়। আদিম অতিকায় জীবের কঙ্কালের মত কয়েকখানা বড় বড় পাথর এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে—যেন

আগন্তুক দর্শকদের জন্য বসবার আসনের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। জলের মধ্যেও দু-একখানা পাথর আছে—বুড়ো পরেশনাথের এই বোবা মেয়েটিকে খুনসুড়ি করে মুখরা করে তোলবার জন্য যে ক'খানা দরকার ঠিক সেই ক'খানা।

ডাইনে বাঁয়ে পিছনে জলধারার ওপারে সুনিবিড় আগাছার জঙ্গলের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে, শুধু গাছ বলে তাদের পরিচয় দিলে নিতান্ত অবিচার করা হয়; মহীরুহ বনস্পতি প্রভৃতি গালভরা নামগুলো বোধ হয় এদের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। শাখাপ্রশাখাহীন বিরাট বিরাট কাণ্ডগুলো বেলে পাথরের রুক্ষদেহ থামের মত সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে; দেখলে কেমন ভয় করে, আবার এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিতেও ইচ্ছা করে—পোষা হাতি বা মহিষ বা ভালুক দেখলে যেমন হয়। মাথার উপর অনেক উঁচুতে শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবের জটিল সমাবেশে রচিত সবুজ চাঁদোয়া। আকাশের আলো তার ভিতর দিয়ে যেন 'ফিলটার' হয়ে পড়ছে। ঈষৎ শ্যামল স্তিমিত আলোকের মোহাঞ্জন-স্পর্শে বনতলচারিণী নির্ঝরিণী রহস্যময়ী যাদুকরীর মূর্তি ধারণ করেছে। আর তারই মর্মরমন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে আমরা ক'টি প্রাণী মোহমুগ্ধের মত নির্বাক্ নিশ্চল হয়ে বসে আছি।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ডুমরিতে ডান দিকে মোড় ঘুরে আমরা যখন গিরিডির পথ ধরি তখন বেলা প্রায় বারোটা। সঙ্গে ঝুড়ি-ভর্তি ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য আছে, কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল আছে, ফ্লাস্কে গরম চা আছে। গাড়ির জঠরেও তেলের অভাব নেই। সুতরাং আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত। মতলব ছিল পথের পাশেই কোথাও গাছতলায় বসে মাধ্যাহ্নিক জলযোগটা সেরে নেব, তার পর ধীরে-সুস্থে বিকেল নাগাদ গিরিডি পৌঁছে যা হ'ক একটা আস্তানা খুঁজে নিয়ে রাত্রিবাস করব।—কিন্তু তা হল না।

পরেশনাথকে ডানদিকে রেখে পার্বত্য সানুদেশ বেয়ে পথ ধীরে ধীরে উঁচু

হয়ে উঠেছে। দু-পাশে আরণ্যক শোভার নির্জন সমারোহ,—গাড়ির চাকার গর্জন ছাপিয়ে হাজার হাজার ঝিঁঝিঁর আওয়াজ কানে এসে বাজছে। সবাই আমরা যেন কেমন একটা নেশায় বুঁদ হয়ে আছি।

হঠাৎ সমর চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কি!—ওগুলো কি?'

দূরে পরেশনাথের গায়ে আমাদের পথ থেকে প্রায় হাজার বারো শ ফুট উঁচুতে অনেকগুলো সাদা চুনকাম করা বড় বড় বাড়ি একসঙ্গে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের বুকের কাছে প্রগাঢ় অরণ্য-শ্যামলিমার মধ্যে কতকগুলো সাদা সাদা পাখির বাসা নিরালায় ঝুলছে। সমর এই প্রথম দেখছে—তার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু আমাদের কাছে দৃশ্যটা যদিও পুরনো তবু আমরাও একবার চেয়ে সহজে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

আমিই উত্তর দিলাম, 'মধুবন—জৈন মন্দির আর ধর্মশালা। জৈন তীর্থযাত্রীরা ওখান দিয়েই পরেশনাথে উঠতে শুরু করে। নিমিয়াঘাটের পথটা নেহাতই অধার্মিক—তীর্থমহিমা তার কিছুই নেই।'

—'হ'ক তীর্থ, কিন্তু জায়গাটা কি চমৎকার!'

—'যেতে চাও? দিব্যি সোজা রাস্তা আছে।'

—'ঐখানে গাড়ি যাবে? ঐ অত উঁচুতে?'

বড়দা গম্ভীরভাবে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, 'হুঃ!'—অর্থাৎ 'আবার তোমরা সিডিউল ভাঙতে চাও!'

বড়দার সিডিউল-প্রীতি আমাদের কারও অজানা নয়। কখন কোথা থেকে আমরা গাড়ি ছাড়ব, কোথায় গিয়ে কতক্ষণ থামব, কোন্ পথ কতক্ষণে অতিক্রম করব, কোথায় খাব, কোথায় ঘুমব—সব আগে-ভাগে ছক বেঁধে নিয়ে তবে তিনি বাড়ি থেকে বেরোন। পথেও তাঁর একটা চোখ সব সময়েই রোডম্যাপ আর ঘড়ির কাঁটার উপর নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু হায়, তাঁর এত সাধের সিডিউল তিনি কোনদিনই বজায় রাখতে পারেন না—শুধু আমাদের জন্য। তিনি সিডিউল গড়েন আর আমরা সিডিউল ভাঙি। এই অতি পুরাতন

টাগ-অব-ওআর-এর ফলে প্রতিবারই আমাদের ভ্রমণে নতুন নতুন উত্তেজনার সঞ্চার হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

আবার ডানদিকে মোড় ঘুরে খাড়া চড়াইএর পথ ধরে গাড়ি মধুবনের দিকে চলল। বড়দা আবার বললেন,—'হুঁঃ!'

চিনিবাবুর হাতে স্টিয়ারিং—তিনি শুধু নীরবে একটু হাসলেন।

যে বাড়িগুলো দূর থেকে চোখ ও মনকে এত টানে, কাছে এসে পড়লে কিন্তু তাদের মধ্যে রস বা রহস্য কিছুরই কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সারি সারি কতকগুলো মারোয়াড়ী প্যাটার্নের ছোট-বড় বাড়ি—মন্দির, ধর্মশালা, আর পুরোহিত সেবাইত ও কর্মচারীদের বাসস্থান। গঠন-সৌকর্য ও সংস্থান-সন্নিবেশের মধ্যে যে স্থাপত্য-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তা খুব নিম্নস্তরের। বাইরের পরিবেশটিও অত্যন্ত নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। অনেকগুলো গেটের দরজা খোলা পড়ে রয়েছে। ভিতরে উঁকি মারলে দেখা যায় মার্বেল মোজেইক পেটেন্ট স্টোন ও নানারঙের বাহারী ডেডোর ছড়াছড়ি, ছোট ছোট জ্যামিতিক পুষ্পোদ্যানের টুকরো; আর কয়েকটি দেবমূর্তি—সাদা মার্বেল পাথরের মুখে নিরুত্তাপ হাসি ফুটিয়ে সোনা বা রুপোর তৈরি আকর্ণ-বিস্তৃত চোখ মেলে প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে।—ভিতরে ঢোকবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এখানে এলে টের পাওয়া যায় অন্য ধরনের একটা টান—উপরে ওঠবার টান—পরেশনাথের টান।

কিন্তু বেলা একটা বেজে গেছে, পর্বতারোহণের সময় এটা নয়। তবু সময়ের শখ মেটানোর জন্য কিছুদূর উঠতে হল। পাকদণ্ডির দু-চার প্যাঁচ ঘুরেই বুঝতে পারলাম, আগে যাই কেন না করে থাকি এখন পাহাড়ে চড়বার বয়স আমার যেতে বসেছে। হাঁটু কোমর ও ফুসফুস একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল—হৃৎপিণ্ডের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও মনে কিছু শঙ্কা ছিল। বুঝলাম চল্লিশ বছর বয়সে যা সম্ভব ছিল পঞ্চান্ন বছরে তা সম্ভব হলেও যুক্তি-যুক্ত হবে না।

সুতরাং পথের পাশে একখানা পাথরের উপর বসে পড়ে জানিয়ে দিলাম আমার আরোহণ-পর্বের এইখানেই ইতি। বড়দা ততক্ষণে সিডিউল-ভঙ্গ-জনিত ক্ষোভের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন, তিনি সময়কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন। চিনিবাবু আমাদের সঙ্গে আসেন নি, গাড়ির এ-সি পাম্প ঘটিত কি একটা গোলযোগ সংশোধনের উদ্দেশ্যে এঞ্জিনের ঢাকনা খুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কলকজা ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিয়েছিলেন, পরেশনাথের ঊর্ধ্বতন প্রদেশ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।

এইখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে বড়দা ও আমি প্রায় একবয়সী হলেও তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশি শক্তসমর্থ মানুষ, ওজনেও অনেক বেশি হালকা। তা ছাড়া ছেলেবেলায় তিনি নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন, এখনও দৌড়-ঝাঁপের সুযোগ পেলে পেছ-পা হন না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে এ নিয়ে বেশ একটু অভিমান তাঁর আছে। কাজেই আমার যা অসাধ্য সেটা যে তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য—শারীরিক দিক দিয়ে তা সত্য তো বটেই, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তা প্রমাণ করাও তাঁর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং আমি যতটা উঠেছি তিনি অন্তত তার ডবল উঠবেনই। কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

বেশ লাগছিল একা একা বসে থাকতে।...

আমার মনের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে একাকী এসে পড়লে আমি একটা অদৃশ্য চাবি ঘুরিয়ে ভিতরের ভাবনার যন্ত্রটাকে 'সুইচ অফ' করে দিতে পারি। তার পর শুধু চোখ মেলে দেখা আর কান পেতে শোনা—পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপভোগ, সমস্ত মনটাকে একটা স্পঞ্জের মত করে নিয়ে বাইরের জগতের রসসত্তাকে অবিরাম শুষে নেওয়া। এই বিচার-বিশ্লেষণহীন স্থাবর আনন্দ কোনদিন যে উপভোগ করে নি, অন্তত আমার মনে হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ লাভ কোনদিনই তার অদৃষ্টে ঘটে নি। সে শুধু বাইরেটাই দেখেছে, খোসা চিবিয়েই ভেবেছে শাঁসের সন্ধান মিলল।

আমার ঠিক সামনে পাহাড়ের ঢালু গা খাড়া গড়িয়ে অনেকদূর নীচে নেমে গেছে। চোখের সামনে যে গাছগুলোর মাথা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে কয়েকটা বন-শিউলি ও দেব-কাঞ্চন রয়েছে—শারদীয় পুষ্পার্ঘ্যের ডালি সাজিয়ে যেন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অচেনা বনফুলের তীব্র গন্ধও নাকে এসে লাগছে। দু-একটা পাখি ডাকছে।

খদের ওপারে আর একটা পাহাড়, কিন্তু খুব ছোট—পরেশনাথের নাতিপুতি-স্থানীয় হবে। কাঁচা বয়স, কাজেই তার উপর এখনও বড় বড় গাছ জন্মাবার সময় হয় নি—শুধু ঝাঁটির জঙ্গল আর মুলিবাঁশের ছোটখাটো ঝোপঝাড়। দুই পাহাড়ের মাঝখানে, অনেক নীচে, একেবারে তাদের পায়ের গোড়ায় ছোট্ট এক টুকরো তিনকোণা উপত্যকাভূমি, সেখানে একখানি গ্রাম।

সেদিন পরেশনাথের কুক্ষিদেশ থেকে হেঁট হয়ে উঁকি মেরে গাছপালায় ঢাকা এই ছোট গ্রামখানিকে দেখে যে সুস্নিগ্ধ প্রীতি ও কৌতুক অনুভব করেছিলাম দার্জিলিঙের সমুন্নত শিখরলোক থেকে বহুনিম্নের মেঘনগরীর ইন্দ্রজাল দেখেও তা করি নি। মেঘের মায়া আর মানুষের মায়া তো ঠিক এক জিনিস নয়।

কার ঘরে উনুন জ্বলেছে, নীল ধোঁয়ার একটা নিরীহ কুণ্ডলি আস্তে আস্তে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে উপরদিকে ভেসে উঠছে। শ্যামল পত্রাবরণের ফাঁকে ফাঁকে দু-একখানি কুঁড়েঘরের খোড়ো চাল দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে তৃণভূমির ফিকে সবুজ রঙ। নারীকণ্ঠের একটা দীর্ঘায়িত আহ্বান দুই পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে কেঁপে কেঁপে উঠে আসছে। এই অসময়ে কে যেন মাদলে মৃদু মৃদু আঘাত করে বোল তুলছে। কোথায় বোধ হয় দুটো ছেলে ঝগড়া করছে। হঠাৎ একটা মোরগ ডেকে উঠল। মনে হচ্ছে যেন একটা পুরু কাচের জানালার ওপার থেকে আওয়াজগুলো ভেসে আসছে—সব মিলিয়ে যেন একটা ধ্বনির কুয়াশা।…

গাড়ির কাছে যখন আবার আমরা ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায়

আড়াইটে। ততক্ষণে তিনজনের মধ্যে একটা অকথিত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে—এখুনি খেতে হবে, আর বিন্দুমাত্র দেরি করা চলবে না। সমরের তো মুখের দিকে চাওয়াই যায় না, বেচারী যেন খিদের আগুনে একেবারে ঝলসে গেছে—এখুনি হয়তো টলে পড়বে।

দেখলাম চিনিবাবুর যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে গেছে। তিনি পিছনের সিটে আরাম করে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। জাগিয়ে তুলতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন, 'উঃ, বেজায় খিদে পেয়েছে!'

কিন্তু এইবার ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিল।

আমাদের সঙ্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলো সবই এমন উৎকট ধরনের আমিষজাতীয় যে জৈন তীর্থভূমির বুকের উপর জৈন মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাদের নাম উচ্চারণ করলেও শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। কাজেই—

কিন্তু চিনিবাবু বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, বললেন, 'একপেট না খেয়ে আমি কিছুতেই স্টিয়ারিঙে হাত দেব না—সাফ বলে দিচ্ছি।'

অথচ এও সকলের জানা আছে যে চিনিবাবুর ধড়ে প্রাণ থাকতে তিনি আর কাউকে স্টিয়ারিঙে বসতে দেবেন না—তার জন্য লাঠালাঠি করতেও তিনি অপ্রস্তুত নন।

পাশেই একজন স্থানীয় ভদ্রলোক ঘোরাফেরা করছিলেন, হাবভাব দেখে মাঝারি শ্রেণীর কনট্রাকটর বলে মনে হচ্ছিল—বোধ হয় পাহাড়ের পথ সংস্কার উপলক্ষে সেখানে এসেছিলেন। আমাদের বিপন্ন মুখভাব দেখে একটু এগিয়ে এসে সব শুনে হেসে বললেন, 'তার জন্য চিন্তা কি! ঐ তো ওদিকে বনের মধ্যে ঝরনা রয়েছে—খাসা জায়গা। সেখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করুন গিয়ে, কেউ দেখতে যাবে না। গাড়ির জন্য ভাবনা নেই, এ চোর-ছ্যাঁচড়ের জায়গা নয়—তা ছাড়া সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এইখানেই আছি।'

তিনিই কোথা থেকে একটা ছোকরা ডেকে দিলেন—আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, জিনিসপত্রও বইবে।...

একখানা করে ডিমভাজা ও একজোড়া করে কাটলেট শেষ করবার পর উদরের বহ্নি কথঞ্চিৎ প্রশমিত হল। মুরগির ঝোল ও আসানসোল থেকে কেনা তন্দুরি রুটি সামনে নিয়ে আমরা প্রথম আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম।

মুখ দিয়ে যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল, 'বাঃ!'

কিন্তু স্থানটি শুধু মনোরম নয়, রহস্যময়ও বটে—চুপ করে চারি দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে বুকের মধ্যে কেমন একটা ছমছমে ভাব জমে উঠতে থাকে। মনে হয় যেন বর্তমানের বাঁধা শড়ক থেকে অনেকদূর পেছিয়ে গেছি—শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, পরেশনাথের উত্তুঙ্গ আকর্ষণ, পিচঢালা পথের উপর মোটর গাড়ির অবিশ্রান্ত অগ্রগতি, মন্দির-ধর্মশালার খেলো মনগড়া মহিমা, সব যেন স্বপ্নের মত অবাস্তব হয়ে গেছে। কোন্ এক আদিম আরণ্যক জগতের নিগূঢ় শীতল নিস্তব্ধতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা এই ক'টি মানব-সন্তান আনন্দে, আতঙ্কে, নিষ্ক্রিয় প্রত্যাশায় স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি।

নিস্তব্ধতা?—হাঁ৷ নিস্তব্ধতাই বটে। কারণ জলকল্লোল ধ্বনি নয়, জলকল্লোল নিস্তব্ধতারই মুখের ভাষা।

—'চল যাই!'

বড়দাই তাগাদা দিলেন, কিন্তু সে তাগাদায় কোন উত্তাপ নেই, আছে যেন কেমন একটা অসহায় অপরাধবোধের সুর। হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কোথাও থাকব বলে তো আমরা ঘর থেকে বেরুই নি—আমাদের যে পথ চলাতেই আনন্দ।

কিন্তু আরও কিছুক্ষণ আমাদের থাকতে হল, কারণ হঠাৎ বিনা নোটিশে শূন্য রঙ্গমঞ্চে ছোট্ট একটি নাটিকার অভিনয় শুরু হয়ে গেল।—

ওপারের আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা অতি দ্রুত খস্ খস্ সর্ সর্ শব্দ

—তার পরই কি একটা সাদা-কালো পুটলির মত জিনিস ঢালু পাড় বেয়ে গড়িয়ে ঝুপ করে জলের মধ্যে এসে পড়ল।

চকিত হয়ে চেয়ে দেখলাম ছায়াচ্ছন্ন কালো জলের উপর কালো একখানা মুখ—নাতিদীর্ঘ কালো চুল স্রোতের টানে ভাসছে, আর তার সঙ্গে ভাসছে ফিকে লালপাড় জোলাই শাড়ির সাদা আঁচল। একটি আদিবাসী তরুণী—একখানা জলে-ডোবা পাথরের পিছনে সারা দেহ ডুবিয়ে কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে প্রাণপণে লুকোবার চেষ্টা করছে। কালো চিক্কণ মুখের উপর দুটি বড় বড় আয়ত চক্ষু—আকুল আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ওপারের জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে। এপার থেকে চারজোড়া চোখের উৎসুক কৌতূহল তার উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়ে পড়েছে, কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেবার অবকাশ তার নেই। সে যেন একান্ত একাকিনী—দলচ্যুতা বন্য হরিণীর মত কোন্ এক অদৃশ্য অজগরের ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ ও মন নিয়ে হতাশ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

আবার পদধ্বনি। কিন্তু এবার কোন ক্ষিপ্রতা নেই অস্থিরতা নেই, দৃঢ় নিশ্চিন্ত পদক্ষেপের নীচে শুকনো পাতা মচ মচ করে ভাঙছে। মাঝে মাঝে ক্ষণিক নিস্তব্ধতা—মনে হয় যেন যে আসছে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিপাশের বনভূমি পর্যবেক্ষণ করতে করতে আসছে; তার কোন তাড়া নেই, অনুসরণের পরিণতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহও নেই।

তার পর অরণ্য-যবনিকা ভেদ করে যে বীভৎস মূর্তিটি ওপারের শিলা-ভূমির উপর এসে দাঁড়াল তার দিকে একবারমাত্র চেয়েই আমাদের সমস্ত অনিশ্চয় ঘুচে গেল। সত্যই আজ আমাদের চোখের সামনে আদিমতম গুহা-জগতের দরজা খুলে গেছে। আর সেই নেপথ্যলোক থেকে যারা এসে এই আরণ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছে তাদের জীবনে আমরা নিতান্তই অবান্তর। তারাই এখানে স্বাভাবিক, আমরা আকস্মিক—সুতরাং উপেক্ষণীয়।

দৈর্ঘ্যে পাঁচফুটের বেশি কিছুতেই নয়, কিন্তু বিরাট গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। কুচকুচে কালো কপালের উপর খানিকটা সিঁদুর থ্যাবড়ানো, তার উপর

একমাথা কাঁচাপাকা জটপাকানো নোংরা চুলের জঙ্গল। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম হবে না, গায়ের চামড়া শ্লথ হয়ে ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়েছে; কিন্তু তার নীচেকার সাপের মত পাকানো পাকানো পেশীগুলো অটুট শারীরিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। পরনে একখানা ময়লা নেংটি মাত্র, কিন্তু গলায় অনেকগুলো অদ্ভুত ধরনের মালা, লাল কালো সাদা—বিচিত্র বর্ণের আস্তরণে বেঢপ চওড়া বুকের প্রায় আধখানা ঢেকে রেখেছে। ডান হাতে একটা মুলিবাঁশের লম্বা মজবুত লাঠি।

প্রথমেই এপারের এই চারিটি নিরীহ ভদ্রসন্তানের উপর দিয়ে তার ঝকঝকে দুই চোখের দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে নিল—কি অপরিসীম ঔদ্ধত্য আর অপরিসীম ঔদাসীন্য সে দৃষ্টিতে! বাঘের পেট যখন ভরা থাকে তখন বোধ হয় সে এমনি ভাবেই হরিণের পালের দিকে তাকায়।

তার পর তর্ তর্ করে লোকটা জলের ধারে নেমে এল। চেয়ে দেখি মেয়েটা ডুব দিয়েছে। কিন্তু হায়, কালো চুল আর সাদা আঁচল তখনও জলের উপর ভাসছে। তিন লাফে লোকটা তার পাশের পাথরখানার উপর এসে দাঁড়াল, তার পর চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে সোজা করে তুলল—জলের ভিতর দিয়ে টানতে টানতে তীরের ঢালু পাথরের উপর নিয়ে গিয়ে আছাড় দিয়ে ফেলল। মেয়েটা উপুড় হয়ে পড়ে প্রাণপণে সেই মসৃণ পাথর আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল, আর লোকটা ঠিক তেমনি ভাবেই চুলের মুঠি ধরে তাকে হিড় হিড় করে টেনে উপরে তুলতে লাগল। অভিনেতা অভিনেত্রী কারও মুখে কোন কথা নেই। আমরা তো প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছি। মনে হতে লাগল, সুদূর-সঞ্চারী আলোকরশ্মি যেন কোন্ গ্রহান্তরের দৃশ্য বয়ে এনে আমাদের অক্ষিপটে প্রতিফলিত করছে, বায়ু-বিসর্পী ধ্বনিতরঙ্গের সাধ্য নেই সেই দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করে আসে।

আমরা আজ শুধু দ্রষ্টা—শুধু দেখতেই পারি, করবার কিছু নেই।

কিছুদূর উঠে লোকটা মেয়েটার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার পর তার হাতের লাঠি ঊর্ধ্বে উদ্যত হয়ে উঠল।

সবাই আমরা চোখ ফিরিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই নজরে পড়ল আর একখানা কালো মুখ—ওপারের একটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে অতি সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখছে। অত্যন্ত কাঁচা মুখ—কচিই বোধ হয় বলা চলে—সে মুখে সকরুণ সন্ত্রাসের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

উঃ, সে কি প্রচণ্ড আঘাত! সমস্ত বনভূমির হৃৎপিণ্ড যেন ধ্বক্ করে একবার লাফিয়ে উঠেই আড়ষ্ট নিস্পন্দ হয়ে গেল। খুন করবার অভিপ্রায় না নিয়ে যে কেউ রক্তমাংসের দেহের উপর এতটা জোরে লাঠি চালাতে পারে, চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, যে আঘাতে অন্য লোকের পিঠ ভেঙে যাবার কথা তাতেও মেয়েটা কেঁদে উঠল না—একটা অস্ফুট কাতরোক্তিও তার মুখ থেকে বেরুল না, শুধু দেখতে পেলাম চাপা বেদনার তাড়সে তার কালো কালো পা দু-খানা একবার থর্ থর্ করে একটু কেঁপে উঠল।

তার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে পরনের ভিজে খাটো শাড়িখানা উদ্ভিন্নযৌবন দেহের চারদিকে ভাল করে জড়িয়ে নিল। মাথা হেঁট করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে—চোখের কোলে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে কিনা তাও বোঝবার উপায় নেই।—উদ্ধত আস্ফালনের ভঙ্গিতে লাঠি নেড়ে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে বৃদ্ধ আগু বাড়িয়ে চলতে শুরু করে দিল, মেয়েটা নির্বাক নিরীহ পদক্ষেপে তার পিছু পিছু চলল। আবার শুকনো পাতার মচ মচ শব্দ শুনতে পেলাম।

ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সেই গোপনচারী তৃতীয় ব্যক্তিটি—যার হৃদয়ে প্রেম আছে, কিন্তু বুকে সাহস নেই; ওদের গতিপথের দিকে চেয়ে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এখন আর ওর মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, আগাছার জঙ্গলের উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু সরল ঋজু একখানা পিঠ, সুঠাম সুপ্রশস্ত দুটি কাঁধ আর তাদের উপর লুটিয়ে-পড়া অবিন্যস্ত কোঁকড়া চুলের ঢেউ। ওর হাতেও কি ওটা—লাঠি নাকি? না—লাঠি নয়, বাঁশি—সাঁওতালী বাঁশি। কষ্টিপাথরের গোপাল-মূর্ত—

হাতে তার বাঁশি—যে বাঁশি শুধু মন মজাতেই জানে, প্রাণ বাঁচাতে পারে না।

চলতে চলতে মেয়েটার কি মনে হল কে জানে, হঠাৎ থমকে থেমে গেল—মাত্র এক মুহূর্তের জন্য, আর সেই এক মুহূর্তের মধ্যেই চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার চেয়ে নিল। দূর থেকে দেখতে পেলাম, মেয়েটার চোখ দুটো যেন ভিতর থেকে জ্বলে-ওঠা আলোর দীপ্তিতে ঝকমক করে উঠল—কালো মুখের উপর দন্তরুচিকৌমুদীর সাদা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

মেয়েটা হাসছে।

বড়দা সহসা একটু অস্থির ভাবে নড়ে চড়ে বসলেন, তাঁর পায়ের ধাক্কা লেগে মাঝারি সাইজের একখানা পাথর গড়িয়ে গিয়ে ঝপ করে জলে পড়ল। আমরা যেন চটকা ভেঙে জেগে উঠলাম। ঈষৎ অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলাম, তার পর আবার ওপারে চেয়ে দেখলাম গোপাল-মূর্তি যেমন নিঃশব্দে আবির্ভূত হয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

চিনিবাবু আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'একটা কড়া দেখে বিড়ি ছাড়ুন দেখি দাদা—একটু বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই। মাথার মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে।'

পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে হালকা সুরে মন্তব্য করলাম, 'সেই অতি পুরাতন ত্রিভুজের কাহিনী—নতুনত্ব কিছুই নেই। বৃদ্ধস্য তরুণী বোধ হয়।'

সমর যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'না না সার, এ কমেডি নয়—এ কমেডি কিছুতেই হতে পারে না। এ ট্রাজেডি—এ নিয়ে আপনারা হাসিঠাট্টা করবেন না—'

—'কিন্তু মেয়েটা যে নিজেই হাসল, দেখতে পেলে না?'

আটাশ বৎসরের অবিবাহিত অভিজ্ঞতা এক কথায় আমাকে চুপ করিয়ে দিল—'ট্রাজেডি যখন সবচেয়ে নির্মম হয়ে ওঠে সার, মেয়েরা তখন অমনি করেই হেসে থাকে।'

দুই

গিরিডি যাবার প্ল্যান পরিত্যাগ করতে হল। আবার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ফিরে এলাম। আশ্রয়ের জন্য বেশি ঘোরাঘুরি করতে হল না—পূজোর ভিড় কেটে গেছে, হাজারিবাগ রোডের মোড়ে বগোদরের ডাকবাংলো একদম ফাঁকা পাওয়া গেছে।

এক সময় ছাড়া রাত্রে আর কারও বিশেষ খিদে ছিল না। মাখন ও ডিমভাজা সহযোগে হালকা খিচুড়ি-ভোগ সমাপন করে সকাল সকাল শুয়ে পড়া গেল—স্থির হল পরদিন বড়দা আবার নতুন করে সিডিউল তৈরি করবেন, তদনুযায়ী যাত্রাপথ নির্ধারণ করা হবে। ছুটিটা বেশ বড় আছে—হাতে সময়ের অভাব নেই।

সারারাত ধরে স্বপ্ন দেখলাম, কারা যেন আমাকে দড়ি দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে হাণ্টার দিয়ে পিটছে, আর সেই সাঁওতাল মেয়েটা আমার সামনে বসে কখনও হি-হি করে হাসছে, কখনও হু-হু করে কাঁদছে।—উদরস্থ খিচুড়ি সে রাত্রে আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না।

অনেক রাত্রে মোটরগাড়ির আওয়াজে একবার ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম, এমন অসময়ে পান্থশালায় আবার নতুন কোন্ অতিথির আবির্ভাব হল?

কয়েক ঘণ্টা পরেই আমার এই তন্দ্রাতুর কৌতূহলের নিরসন হয়ে গেল।

আমার যখন ঘুম ভাঙল তখনই বেশ বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু ঘড়ি দেখে বুঝলাম আমার সঙ্গীদের শয্যাত্যাগ করতে তখনও অন্ততপক্ষে আরও ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে। ডাকবাংলো থেকে কিছুদূরে পথের ধারে জনৈক দেহাতি ভাইএর ঝাঁপে-ঘেরা চায়ের দোকান নজরে পড়ল। সেখানে গিয়ে খুঁটির উপর তক্তাবসানো বেঞ্চে বসে পর পর দু ভাঁড় সেই অপরূপ তপ্ত পানীয় নিঃশেষ করে ফেললাম, যার সম্বন্ধে কোম্পানির দেওয়া রঙিন বিজ্ঞাপনের চাকতি উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোষণা করছে—"রঙ্গ মে গাঢ়ী পিনেমে খুব"। তার পর ফিরে এসে স্যুটকেস থেকে 'সঞ্চয়িতা'-খানা বের করে নিয়ে বারান্দায়

চেয়ার চেপে বসে পড়লাম।—এই একখানা মাত্র বইই আমরা সঙ্গে নিয়ে বেরুই, অবসর মত ভাগাভাগি করে পড়ি।

আগের দিন দেখা সেই বুনো মেয়েটার বুকের কান্না আর মুখের হাসির স্মৃতি তখনও আমার মগজ ও মন আচ্ছন্ন করে ছিল, তাই পাতা উল্‌টে পড়তে শুরু করলাম—

"চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি যে কালো-আঁখি-জলে ভিজে
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণ-ঝংকার সুরে মাখা—
কদম্ব-কেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা॥

তুমি সুদূরের দূতী নূতন এসেছ নীলমণি ;
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে—
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব…"

—'রাম রাম বাবুজি, নোমোস্‌কার!'

মদ্দা পাতিহাঁসের ডাকের মত ভাঙা গলার ফ্যাঁসফেসে আওয়াজে নীলমণি লতার পত্র-পল্লব যেন শিউরে উঠল। চেয়ে দেখলাম, দুটি মরোয়াড়ী ভদ্রলোক আমাদের পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বুঝলাম, এঁরাই সেই মধ্যরাত্রির আগন্তুক যাঁদের আগমনেব ধ্বনি আমার নৈশ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল।

আমাকে যিনি সাদর-সম্ভাষণ জানালেন তিনি খর্বদেহ শীর্ণকায়—পরনে আধময়লা ঢিলে পায়জামা, পাতলা মলমলের চুড়িদার পাঞ্জাবি ও তার উপর একটা সুতী ওয়েস্টকোট, মাথায় টুপি—আধা-বয়সী মারোয়াড়ীর পক্ষে খুবই আপ-টু-ডেট সাজ-সজ্জা। মেটে মেটে ফর্সা রঙের শুঁটকো তোবড়ানো মুখে একটা ধূর্ত অথচ আত্মসন্তুষ্ট ভাব। দেখলেই খুব ঝানু লোক বলে মনে হয়।

অপর ভদ্রলোকটির চেহারা দশাসই, গায়ের রঙ সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় 'কিছু তামা কিছু তামাক-পাতা', পরনে ধুতি ও গলাবন্ধ লম্বা কোট, মাথায় হলদে রঙের পাগড়ি। প্রকাণ্ড চৌকো মুখখানায় অসংখ্য বসন্তের দাগ। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে—ভাবলেশসংস্পর্শহীন।

ঠিক এই ধরনের সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরি ছিলাম না, মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। বাধ্য হয়েই প্রত্যভিবাদন জানালাম।

ব্যস, আর যায় কোথায়! চট্ করে নিজেদের ঘর থেকে একখানা চেয়ার বের করে এনে ঠিক আমার পাশেই বসে পড়লেন, তার পর সেই ফ্যাসফেসে গলায় অনর্গল বকতে শুরু করে দিলেন।

মদ্দা পাতিহাঁসটির নাম সুরজমল জেঠিয়া; দশাসই ভদ্রলোকটি তাঁর আপন সাড়ুভাই (ভায়রা-ভাই)—নাম কি একটা যেন বলেছিলেন, আজ আর তা মনে নেই—দুজনে মিলে কয়লা ও মাইকার চালানী কারবার করেন কোদার্মায়। বড় একটা অর্ডার পেয়ে মাল খরিদের জন্য চলেছেন ধানবাদে। রওনা হয়েছিলেন কাল বেলা বারোটায়, কিন্তু পথে ঝুমরি-তিলাইয়ায় একটু কাজ ছিল, পাকেচক্রে সেখানে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। বেলা চারটের সময় সেখান থেকে গাড়ি ছাড়েন। বাইশ অশ্বশক্তির দামী গাড়ির সওয়ার তাঁরা—এখান থেকে এখানে ধানবাদ, পৌঁছুতে আর কতটুকু সময়ই বা লাগবে।

—'কিন্তু বুঝলেন দাদা, রামজি যখন হুজ্জুতে ফেলিয়ে দেন তখন কিছুতে কিছু হোয় না। এমন জোরদার গাড়ি আমাদের, কিন্তু সেই গাড়ি বিগড়িয়ে গেল—ষ্টিয়ারিং বে-এক্তার, ব্রেক সামহাল মানে না। তখন অনেকটা পথ চলিয়ে এসেছি, তিলাইয়ার নৌতুন তালাও-এর বিরিজ পার হয়ে বাঢ়ীর পথে আসিয়ে পড়েছি—ফিরতি যাওয়াও মুশকিল—কি আর কোরা যায়, আগু বাঢ়িয়েই চলতে লাগলাম। ওদিকে ডেরাইবার বেচারা তো একদম ঘাবড়িয়ে গেছে—গাড়ি চালাতে হাঁথ কাঁপছে, দো মিনিট অন্তর থামছে, টর্চবাতি জ্বালিয়ে বোনিট তুলে কলকব্জা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখছে—লেকিন সুরাহা কিছুই কোরতে পারছে না। বয়েল-গাড়িকা মাফিক

ডিগ-ডিগ ডিগ-ডিগ কোরতে কোরতে এখানে আসিয়ে যখন পঁহুছলাম তখন রাত সাড়ে একটা বাজিয়ে গিয়েছে।—হায় রামজি!'

মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম, কিন্তু এত কথার পর একেবারে কিছু না বললে ভাল দেখায় না, তাই প্রশ্ন করলাম, 'তা আপনাদের গাড়ি তো সঙ্গে দেখছি নে—কোথায় গেল?'

'ঐ মোড়ের কাছে একটা মোটর-মিস্তিরির দুকান আছে, সেইখানেই ফেলিয়ে রেখেছি—ডেরাইবার ভি ঐখানেই বসিয়ে আছে। থাক্‌ পড়িয়ে, যো হোয় সো হোবে—আমরা সাড়ে আটটায় বাস্‌গাড়িমে রওনা হইয়ে যাব। দেখুন তো কি হুজ্জুত দাদা! সাত রোজসে তেজী বাজার চলছে—ঘণ্টা ঘণ্টা মালের দর চড়ছে, আর আমরা এখানে পথের মাঝে ফাঁসিয়ে গেলাম! নাফা তো বহুৎ কমিয়ে যাবেই—এখন নুক্‌সানের গাড্ডায় না পড়তে হোয়।—সবই রামজির হিচ্ছা!'

জেঠিয়াজির ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠল।

হায় আমার নীলমণি লতা! হায় রে সাঁওতালী মেয়ে—আর তার প্রাগৈতিহাসিক প্রেমের সেই বেদনার্ত স্বপ্নকাহিনী!···

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, 'অত রাত্রে এসে পৌঁছুলেন, তা খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হল?'

'সে কোন অসুবিস্তা ছিল না দাদা। সাথে ছিল সোকালবেলার ঘরে তৈরি চাপাটি, আর দো তিন কিসিম্‌কা আচার—ব্যস্‌! মজেসে খাইয়ে লিলাম। এ তো আপনাদের বংগালি বাবুর খানা নেই আছে—মছলি গোস্‌ আণ্ডা, দহি সোন্‌দেস্‌ রস্‌গুল্লা, সুক্‌তুনি ঘোণ্টো চোড়চোড়ি, ফলানা টিকানা! আপনারা দুনিয়ামে তো খালি খাইতেই আসিয়েছেন, দাদা! আমাদের কথা ছাড়ান দেন—রুখা শুখা খা লে, ঠাণ্ডা পানি পী লে! পাঁচ মিনিটমে কাম খতম।'

জেঠিয়াজি নিজের রসিকতায় নিজেই মোহিত হয়ে ভাঙা গলার সপ্তস্বরায় ঝঙ্কার তুলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

তাঁর সঙ্গীটি কিন্তু তখনও ঠিক একভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছেন—নির্বিকার মুখ আর ঘোলাটে চোখ নিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

জোর করে ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম; মন থেকে তেজী-মন্দী, নাফা-নুকসান, আচার-চাপাটি সব মুছে ফেলে আবার নীলমণি লতায় মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলাম।

"...আমি আজ কোথা আছি প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে।
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।..."

—'বাবুজি!'—মন্দা পাতিহাঁসের গলা আবার ফ্যাঁসফেসিয়ে উঠল।

মুখ তুলে তাকাতেই প্রশ্ন হল, 'এত্তো দিল লাগাইয়ে কৌন্ কেতাব পড়ছেন বাবুজি?'

বললাম, 'সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।'

—'রবীন্দর্‌নাথ—রবীন্দর্‌নাথ—চিনিপট্টিকা রবীন্দর্‌নাথ?—না না, উ তো পাল আছে। রবীন্দর্‌নাথ ঠাকুর—হাঁ হাঁ, ইয়াদ হোয়েছে, বহুত ইল্‌মদার আদমী ছিলেন, বিলায়েৎমে কারবার ছিল—মরিয়ে গিয়েছেন।—তা বাবুজি, উ কেতাবমে কৌন্ চিজ লিখা আছে?'

বিষম বিপদে পড়ে গেলাম। নগদ নারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক এই মারোয়াড়ী-পুঙ্গবকে কবিতা কি বস্তু তা কি করে বোঝাই? তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম; মীরাবাঈ, কবীর, তুলসীদাস; গীত, গজল, ভজন, দোহা—নানা উপমা ও তুলনার সাহায্যে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে কি আছে।

কি বুঝলেন তা জানি নে, বারকয়েক কথাটা নিজের মনে আউড়ে নিলেন, 'কোবিতা—কোবিতা—কোবিতা।'—তার পর আবার প্রশ্ন: 'উ কেতাব পড়নেসে ফায়দা কি হোয় বাবুজি?'

অদৃষ্টে এতও ছিল! রুখা-শুখা-বিলাসী মারোয়াড়ের মরুভূ-নন্দনকে কিনা রবীন্দ্রকাব্যের নন্দনতত্ত্ব বোঝাতে হবে!

কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিলাম, তার পর বললাম, 'এ বই পড়লে মন ভাল হয়—দিলমে আনন্দ্ হয়।'

—'উ কেতাবের দাম কত্তো আছে?'

—'দশ টাকা।'

—'দশ রুপেয়া!'—বিস্ময়ে জেঠিয়াজির দুই চোখ কপালে উঠে গেল, 'দশ রুপেয়া দিয়ে কেতাব খরিদ করিয়েছেন বাবুজি,—আর সেই কেতাব পঢ়িয়ে দিল্‌মে আনন্দ্ হোবে? বড়ি তাজ্জবকি বাত শুনালেন দাদা,—আপনাদের বংগালি বাবুদের সোবই তাজ্জব আছে! হাঁথমে দশ দশঠো রুপেয়া আছে—তো কি শাট্টা (speculation) করুন, বাজারমে লাগাইয়ে দিন, নাফা হোবে, ঘরমে মুনাফা আসবে, তব্ তো সাচ্চা আনন্দ্ মিলবে।—দশ রুপেয়া নিক্‌লে গেলো পাকিট্‌সে, মিললো সির্‌ফ্ এক কেতাব! সেই কেতাবসে বাবুজির দিল্‌মে আনন্দ্ হোবে!'

জেঠিয়াজি অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন।

হঠাৎ মনে হল তাঁর হাস্যধ্বনির ধাতব ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কাছেই কোথায় একটা ভাঙা ঢোলও বাজছে। চেয়ে দেখি সাড়ুভাই হাসছেন। বংগালি বাবুর এই অপরিসীম মূর্খতা ও পাগলামির পরিচয় পেয়ে মরা মাছের চোখের মত তাঁর সেই ঘোলাটে চোখ দুটোও কৌতুকের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর অর্ধ-ব্যাবৃত মুখগহ্বর থেকে অনাবিল আনন্দের ঘণ্ড ঘণ্ড আওয়াজ উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে আসছে।

হাতের রবীন্দ্রনাথ ততক্ষণে বিষ হয়ে উঠেছেন। ঈষৎ উষ্মা প্রকাশের ভঙ্গিতে ঝপ করে বইখানা বন্ধ করে ফেললাম।

অদূরে নজরে পড়ল আমাদের শোবার ঘরের দরজা থেকে তিনটি মাথা উদ্‌গ্রীব হয়ে বাইরে উঁকি মেরে চেয়ে দেখছে; মারোয়াড়ী হাসির ধমকই বোধ হয় এই অসাময়িক নিদ্রাভঙ্গের হেতু। চোখে চোখ মিলতেই আবার সাঁ করে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম সঙ্গীদের কাছ থেকে এ বিপদে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না। তাঁরা মজা দেখছেন।

জেঠিয়াজি দমবার পাত্র নন। হাসির বেগ সামলে নেবার পর আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা বাবুজির নামটি কি—মেহেরবানি করিয়ে যদি বোলেন ?'

যাঁরা আগেভাগেই নিজেদের নাম জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা এ প্রশ্ন করতে পারেন বৈকি। উত্তর না দিলে অভদ্রতা হয়—সুতরাং নাম বলতে হল।

—'আপনেরা কোথা থেকে আসতেছেন ? কতো দূর যাবেন ?'

বললাম, 'কলকাতা থেকে আসছি। কোথায় যাব এখনও কিছু ঠিক নেই—রাঁচি হয়ে নেতারহাট কিংবা চক্রধরপুর যেদিকে হ'ক যেতে পারি, আবার আওরঙ্গাবাদ হয়ে ডালটনগঞ্জেও যেতে পারি।'

আবার বিস্ময়ঃ 'কিছু ঠিক নেই আছে ?—নেতারহাট, চক্রধরপুর, ডালটনগঞ্জ—আপনেদের কিসের কারবার আছে বাবুজি ? টিম্বার সাপ্লাই না বিল্ডিং কনট্রাক্ট ?'

বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এ অঞ্চলে আমাদের ও রকম কোন কারবারই নেই—আমাদের সকলেরই কর্মস্থল কলকাতা। ছুটিছাটা পেলে আমরা এমনিভাবে গাড়ি করে পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

—'কিন্তু, কেনো বাবুজি ? কোই মতলব তো জরুর আপনেদের আছে—বিনা মতলবসে পেটরোল জ্বালিয়ে কেনো পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন ? বেফায়দা তকলিফ—উ তো এক বাউরা লোকেই করিয়ে থাকে।'

কি উত্তর দেব ? কেমন করে জেঠিয়াজি ও তাঁর সাড়ুভাইকে বোঝাব যে আমরা পাগল নই ?—'আনন্দ' কথাটা আর উচ্চারণ করতে সাহস হয় না। কিন্তু 'বাতিক'এর হিন্দী প্রতিশব্দ তো আমার জানা নেই—আর থাকলেও এই বিচিত্র বাতিকের মর্মগ্রহণ করা কি এঁদের পক্ষে সম্ভব হবে ?

বাতিক—হ্যাঁ, শুধুই একটা বাতিক, তার বেশি কিছুই নয়।

তিন

সেই বাতিকের কথাই লিখতে বসেছি—ভ্রমণ-কাহিনী এ নয়।

বহুদিনকার পুরনো বাতিক, প্রায় পনের বছর আগে এর সূত্রপাত হয়।

এই বাতিক-চক্রের কেন্দ্রে আছি আমরা চারজন—হিতেনবাবু, বড়দা, চিনিবাবু ও আমি। হিতেনবাবু ও বড়দা দুজনেই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ—বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, সংসারে প্রাচুর্য আছে—ওকালতির সিংহদ্বারে মুক্তহস্ত মক্কেলদের আনাগোনার অন্ত নেই। কিন্তু তবু প্রাণে শখ আছে, জীবনের সব বাতিক বাতিল করে দিয়ে বেহিসাবী বাতুলতার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবার মত মারাত্মক সুবুদ্ধি এঁদের কোনদিনই হয় নি।

চিনিবাবু গাড়িপাগল মানুষ। সবজাতের মোটরগাড়ির নাড়ীনক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে, এঞ্জিনের হৃৎপিণ্ডের সামান্যতম ধুকধুক আওয়াজ শুনেই তার রোগ-নিদান নির্ণয় করতে পারেন, রোগের প্রতিষেধের উপায়ও বাতলে দিতে পারেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে স্টিয়ারিং ধরে চেনা-অচেনা পথের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলতে পেলে তিনি আর কিছু চান না। একা একাদিক্রমে বত্রিশ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এসেছেন—পথে কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খান নি, এও আমরা দেখেছি। বিচিত্র চরিত্রের লোক! ড্রাইভিং সীটে বসে স্টিয়ারিং হাতে ধরলে তিনি এক মানুষ—ডয়ডর কিছুই নেই, কিছুই অসাধ্য বা অসম্ভব বলে মানেন না, ঝড়-বৃষ্টি অরণ্য-পর্বত কোন বাধাই গ্রাহ্য করেন না—কিন্তু গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই তাঁর রূপ পাল্টে যায়, তখন তিনি একান্ত অসহায়, শিশুর মত পরনির্ভর; বাঘের ভয়, সাপের ভয়, ডাকাতের ভয়, ভূতের ভয়, জুজুর ভয়—নানাবিধ ভয়ের তাড়নায় সর্বদা অস্থির।

দক্ষিণ কলকাতায় চিনিবাবুর মোটর গ্যারাজের বেশ নামডাক আছে, কাজেই আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর নেই। বাড়ি নেই বটে, তবে গাড়ি আছে—আর আছে গাড়ি চালাবার দুর্দান্ত নেশা ও অসাধারণ নৈপুণ্য।

তার পর আমি। আমার পেশা মাস্টারি, কাজেই একথা বলাই বাহুল্য যে

আমার বাড়িও নেই গাড়িও নেই, সংসারে অনটনের টানাটানি লেগেই আছে। কিন্তু বাতিকের বায়ু বোধ করি আমারই সবচেয়ে প্রবল। ছুটির সম্ভাবনা দেখা দিলেই আমি ছুটোছুটি শুরু করে দিই, একবার হিতেনবাবু একবার বড়দার কাছে ধর্না দিতে থাকি, চিনিবাবুকে তাতিয়ে তোলবার চেষ্টা করি।

এ নিয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও কম সহ্য করতে হয় না। দিবারাত্র ছেলে পড়িয়ে নোট লিখে রোজগার করা পয়সা—রক্ত জল করা পয়সা—তার এমন অপব্যবহার গৃহিণী সহ্য করতে পারেন না, প্রায়ই কটুকাটব্য করেন। বন্ধু-বান্ধবেরা মুখ মুচকে হাসেন—আমার মত বিত্তহীন লোকের এ রকম বিদঘুটে শৌখিন বাতিক তাঁদের কাছে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ঠেকে। নিজের নৈতিক অধঃপতনও মাঝে মাঝে এজন্য ঘটেছে। গৃহিণীকে সাংসারিক বাজেট বুঝিয়ে দেবার সময় নানারকম গোঁজামিল দিয়ে, গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে কিছু কিছু টাকা সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছি, হঠাৎ বাইরে থেকে ফালতু কিছু অর্থাগম হয়ে গেলে বাড়িতে সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করি নি—নিজের টাকা নিজেই চুরি করে আত্মগ্লানির দংশন অনুভব করেছি। আর সবচেয়ে অসহনীয় মনে হয়েছে তখন, যখন ছেলেমেয়েদের চোখের নীরব দৃষ্টির মধ্যে আমার বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার অভিযোগ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখেছি।

তবু আজ পনের বৎসর ধরে নেশাখোর বা ভূতগ্রস্তের মত এই একই বাতিকের পিছন পিছন ছুটে বেড়াচ্ছি।

•

পুজোর ছুটি সামনে। দিল্লী থেকে অধ্যাপক বন্ধু চিঠি লিখলেন: 'বুড়ো হয়ে মরতে চললে এখনও দিল্লী আগ্রা ফতেপুর-সিক্রি দেখলে না। তোমার কথা ভাবলে আমাদেরই লজ্জা করে। দিল্লী এখন ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র, এখানে না এলে জন্মই বৃথা। শীগগির চলে এসো, ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই। যানবাহনের সুব্যবস্থা করে রেখেছি, নিখরচায় যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখিয়ে দেব। তা ছাড়া ইচ্ছা আছে ছোট একটা দল গড়ে রাজস্থানটাও দেখে

আসব। তোমার বৌদি আজকাল তোফা শিক-কাবাব বানাতে শিখেছে, সার্টিফিকেট দেবার জন্য তোমার আসা বিশেষ প্রয়োজন।'

এত বড় প্রলোভন সংবরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দিল্লী আগ্রা ফতেপুর-সিক্রির প্রত্নতাত্ত্বিক রসের সঙ্গে শিক-কাবাবের রসাল সংমিশ্রণ— মুনিরও মন টলে যায়। মন স্থির করে ফেললাম। মহালয়ার পরদিনই বেরিয়ে পড়ব—নয়া ভারতের নতুন কালচারের সঙ্গমতীর্থে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে আসব।

দু দিন পরেই চিনিবাবু এসে হাজির। কোন রকম ভূমিকা না করেই ঘোষণা করলেন, 'সব ঠিক হয়ে গেল—পঞ্চমীর দিন শেষরাত্রে রওনা হব। চক্রধরপুর-চাঁইবাসা হয়ে সারান্দার জঙ্গলটা এবার ভাল করে ঘুরে আসতে হবে। একটা জীপ যোগাড় করেছি, জঙ্গলের পথে ভাল গাড়ি চলবে না। তৈরি থাকবেন।'

ব্যস্! বাতিকের টনক নড়ে উঠল। দূরের দিল্লী দূরেই পড়ে রইল, বেরিয়ে পড়লাম সেই পুরাতন পথ পাহাড় আর জঙ্গলের টানে। স্নানাহারের স্থিরতা নেই, আশ্রয়ের নিশ্চয়তা নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন প্রত্যাশা নেই; শুধুই পথে পথে শ্রান্তিহীন পর্যটন আর মাঝে মাঝে পথের প্রান্তে বিরতির নিস্তব্ধ নিশ্চলতা।

এমনি বার বার হয়ে আসছে এবং মনে হয় ভবিষ্যতেও বার বার হবে—এতদিনেও নেশার ঘোর আমার কাটল না।

সুতরাং দেশভ্রমণ আমার অদৃষ্টে আর ঘটল কই? মহাভারতের শত শত মহা-জনপদ প্রত্নকীর্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বহুবিচিত্র পশরা সাজিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে, সারা পৃথিবী থেকে কৌতূহলী পর্যটকের দলকে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসছে—কিন্তু হতভাগ্য আমি তাদের আনন্দ বা বিস্ময়ের অংশীদার হতে পারলাম না। ভাগ্যিস ছাত্রাবস্থায় টুইশনের টাকা জমিয়ে শিলং দার্জিলিং পুরী ভুবনেশ্বর কাশী বিন্ধ্যাচল চুনার প্রভৃতি জায়গাগুলো এক পাক করে ঘুরে এসেছিলাম তাই কূপমণ্ডুক দুর্নামটা এড়িয়ে যেতে

পেয়েছি। কিন্তু সে ঐ পর্যন্তই। তার পর এই উদ্ভট উদ্দেশ্যহীন ঘুরপাকের নেশার আস্বাদ প্রথম যেদিন পেলাম সেইদিন থেকেই আমার দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম দুই-ই খতম হয়ে গেছে। নতুন হ'ক পুরনো হ'ক, ভাঙাচোরা যা-হ'ক একখানা চলমান মোটরগাড়ি আর তার নীচে দ্রুত অপস্রিয়মাণ কালো পিচঢালা পথ—এর কাছে সবই যেন তুচ্ছ বলে মনে হয়। এর ডাক যখন কানে এসে পৌঁছয় তখন সাড়া না দিয়ে থাকতে পারি নে কিছুতেই।

হিতেনবাবু ও চিনিবাবু মোটরে করে কুলু কাংড়া কাশ্মীর ঘুরে এসেছেন। জম্মু থেকে শ্রীনগরে যাবার নতুন সুড়ঙ্গপথ তখনও হয় নি, বানিহালের পুরনো গিরিবর্ত্ম ধরে তাঁদের যেতে হয়েছিল—রোমাঞ্চকর সে অভিজ্ঞতার কাহিনী বহুবার শুনেছি। বড়দা সমগ্র দক্ষিণাপথ চষে বেড়িয়েছেন—তাঁর ছবি-ঠাসা অ্যালবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনে মনে ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে মরেছি।

ভ্রমণ-কাহিনী যদি লিখতে হয় তাঁরাই লিখবেন।

আমার পর্যটন একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ—মোটরে করে ঘুরেছি শুধু পশ্চিমবঙ্গে আর বিহারের কয়েকটি জেলায়। তবে বার বার গিয়েছি, নূতন পুরাতন নানা পথে যাতায়াত করেছি, সাময়িকভাবে বহু মানুষের সঙ্গ লাভ করেছি, পথিকে পথিকে পথের আলাপনের মধ্য দিয়ে অনেক হাসি ও অশ্রু অনেক বিস্ময় ও রোমাঞ্চের সংস্পর্শে এসেছি, জীবন ও প্রকৃতির অনেক খুঁটি-নাটি জিনিস চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবার অবকাশ পেয়েছি।—

দেখিতে যাই নি পর্বতমালা
দেখিতে যাই নি সিন্ধু;
দেখিয়াছি শুধু চক্ষু মেলিয়া
দুয়ার হইতে দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

আমি লিখতে বসেছি আমাদের সেই অকারণ আনাগোনার ইতিহাস- সেই ধানের শিষটি ও তার উপরকার শিশিরবিন্দুটির কাহিনী।

একদিনের কথা মনে পড়ছে।

নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের ক্লান্তিকর সমতলের উপর দিয়ে সারাদিন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমরা যখন ধুলিয়ানের গঙ্গাতীরে এসে পৌছুলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বহরমপুরের এক বন্ধু খবর দিয়েছিলেন, ঠিক সন্ধ্যাবেলায় ধুলিয়ান থেকে একবার পাওয়ার ফেরি ছাড়ে, মোটর পার করার কোন অসুবিধা হবে না। শুনে খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম, কারণ রাতারাতি মালদহে পৌছুতে পারলে পেট ভরে আহার জুটবে, আরাম করে ঘুমনোর মত আশ্রয়ও মিলবে। কিন্তু এখানে এসে শুনলাম, কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। সন্ধ্যায় ফেরি কোনদিনই ছাড়ে না, সকালের আগে গাড়ি পার করবার কোন উপায় নেই। তা ছাড়া ঘাটেরও যে অবস্থা দেখলাম—সন্ধ্যার অন্ধকারে সেখান দিয়ে গাড়ি ওঠাতে বা নামাতে গেলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর চিনিবাবু বললেন, 'চলুন হিতেনদা, বাজারে গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া যাক—যা-হ'ক একটা রাত কাটানোর ঠাঁই ঠিক মিলে যাবে।'

হিতেনবাবু অল্পকথার মানুষ, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, 'না। বড় নোংরা জায়গা। তার চেয়ে এখানেই ভাল।'

তা কথাটা তিনি মন্দ বলেন নি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি, শীত তখনও পড়ে নি ; হু-হু করে গঙ্গার হাওয়া বইছে, গরমে বা মশার কামড়ে কষ্ট পাবার কোন সম্ভাবনা নেই ; কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি, সারারাত ফুটফুটে জ্যোৎস্না থাকবে। এমন জায়গায় রাত্রিবাসের সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন তা ছেড়ে কোথায় যাব কোন্ গলিঘুঁজির ঘুপসি ঘরে গুমোট গরমে পচে মরতে ?

সঙ্গে পাঁউরুটি মাখন কলা ও রসগোল্লা রয়েছে—পাঁচজনের পক্ষে পর্যাপ্ত

না হলেও, উপবাসের কষ্ট পেতে হবে না। চিনিবাবু বালির উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে পকেট থেকে ছুরি বার করে রুটি কাটতে শুরু করে দিলেন।

এমন সময় নজরে পড়ল কিছুদূরে একটা পাঞ্জাবীর চায়ের দোকান। শ্রীমান লাবু ও মানুভাই 'এখুনি আসছি' বলে সেইদিকে রওনা হয়ে গেল। ফিরে এল যখন, তখন সঙ্গে নিয়ে এল দোকানের একটা ছোকরা চাকরকে—তার মাথায় একখানা কাঠের ট্রে, তাতে এক বাণ্ডিল মোটা মোটা রুটি, বড় এক ভাঁড় গরম গরম রান্নাকরা মাংস, পাঁচখানা প্লেট ও পাঁচজোড়া কাপ-ডিশ; হাতে এক কেটলি গরম চা। বুঝলাম আমাদের এই দুটি তরুণতর সহযাত্রীর জঠরাগ্নি 'সামিষ সোপকরণ' পূর্ণাহুতির দ্বারা পরিতৃপ্ত না হলে তাদের পক্ষে নিশ্চিন্ত নিদ্রা অসম্ভব। অবশ্য অতিরিক্ত খাদ্যে আমাদেরও যে বিশেষ অরুচি ছিল তা নয়।

হিতেনবাবু ইতিমধ্যে এক টুকরো মাংস তুলে গালে ফেলে দিয়েছিলেন; দুই একবার মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করেই তিনি হঠাৎ 'বাপ রে!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, তার পর একটু দূরে সরে গিয়ে থু-থু করে মুখের মাংস ফেলে দিলেন, জল নিয়ে কুলকুচো করতে আরম্ভ করলেন।

ব্যাপার কি? আমরা সকলে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলাম, লাবু ও মানুভাই তো দস্তুরমত শঙ্কিত হয়ে উঠল। তার পর আমি চামচে-খানেক মাংসের ঝোল নিয়ে ভয়ে ভয়ে মুখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঝাল! উঃ, সে কি মারাত্মক মর্মভেদী ঝাল! মনে হল যেন কণ্ঠনালী থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত একসঙ্গে দাউ দাউ করে বিষাক্ত বহ্নিজ্বালায় জ্বলে উঠল।

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে পূর্ববঙ্গবাসীরা রান্নাবান্নায় খুব বেশি পরিমাণে লঙ্কা ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কথাটা যে কতখানি মিথ্যা তা বুঝতে হলে মাদ্রাজী মারাঠী সৌরাষ্ট্রী পাঞ্জাবী পাক-প্রণালীর সঙ্গে কিছু সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন—ভোজ্যগ্রহণের নামে মানুষ যে নিজের

জিহ্বা ও তালুকে কতখানি উৎপীড়ন করতে পারে এই সব দেশের রান্না খাদ্য না খেলে তা কেউ কোনদিন বুঝতে পারবে না। পূর্ববঙ্গীয়েরা বেশির ভাগ কাঁচা লঙ্কাই ব্যবহার করে থাকেন—কাঁচা লঙ্কা যতই ঝাল হ'ক না কেন, তাতে একটা সুগন্ধ থাকে এবং তার আস্বাদেও খানিকটা স্নিগ্ধতা থাকে। কিন্তু এঁরা ব্যবহার করেন শুধু শুকনো লঙ্কার রক্তবর্ণ গুড়িকা—একমাত্র জ্বলুনি ছাড়া যার স্বাদগন্ধে আর কোন বৈশিষ্ট্যই নেই।

আমি ও হিতেনবাবু আমিষ বর্জন করেই ভোজনপর্ব সমাধা করলাম। চিনিবাবু তাঁর ভাগের মাংসখণ্ডগুলিকে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তার পর মুখে ফেলতে লাগলেন। লাবু ও মানুভাই দুজনে মিলে ভাঁড়ের সবটুকু মাংস ও ঝোল চেটেপুটে শেষ করে ফেলল, তার পর রুমাল দিয়ে নাক-চোখের ঝরন্ত জলধারা মুছতে লাগল। লঙ্কার কামড়ে লাল হয়ে ফুলে ওঠা ওষ্ঠাধরে একটা করুণ হাসি ফুটিয়ে লাবু বলল, 'মাংসটা খেতে কিন্তু বেড়ে হয়েছিল।'

বেশ রাত হয়েছে। মানুভাইকে সঙ্গে নিয়ে চিনিবাবু গাড়ির মধ্যে শুয়েছেন — আর কোথাও তিনি নিজেকে নিরাপদ মনে করেন না। আমাদের জন্য খাড়া উঁচু বালির পাড়ের উপর কম্বল-বালিশের বিছানা বিছানো হয়েছে। সারাগায়ে চাদর জড়িয়ে লাবু গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য, আমি আর হিতেনবাবু চুপ করে গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে বসে সিগারেট টানছি।

খরস্রোতা গঙ্গার গায়ে রাতের বাতাস লেগে ছোট ছোট লহরীর শিহরণ জাগছে, আকাশের এক-চাঁদ তার উপর হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে দীর্ঘায়িত চাঁদমালা রচনা করছে। অনেক দূরে একটা ঝাপসা কালো কুয়াশার আঁচড়ের মত ওপারের ছবি দেখা যাচ্ছে।—মনে হল যেন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি।...

মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা হিতেনবাবু, বলতে পারেন কেন আমরা এমন করে পাগলের মত পথে পথে ছুটে বেড়াই? কি আছে এর মধ্যে?

আপনি বা বড়দা—আপনাদের পয়সার অভাব নেই, ইচ্ছে করলেই দার্জিলিং সিমলে গোপালপুর উটি যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন, বৌদিদের, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিতে পারেন, ভাল ভাল হোটেলে আরাম করে থাকতে পারেন। চিনিবাবু যদি নিজের ব্যবসায় আরও মন দেন, আরও কত পয়সা রোজগার করতে পারেন। আমিও যদি ছুটির সময় কলকাতায় থাকি, তাহলে টুইশনের কাজে এত কামাই হয় না, আরও বেশি করে নোট লিখতে পারি—গরিবের সংসারে দু-পয়সা সাশ্রয় হয়, দু-বেলা গিন্নীর মুখ-ঝামটা খেতে হয় না।—তবে কেন এই সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপল? কেন আমরা দিনের পর দিন এমন করে ঘুরে মরি?'

—'ভাল লাগে, তাই।' মুখের সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হিতেনবাবু চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু—ভালই বা লাগে কেন? সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত একা বসে বসে সমস্যাটা সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলাম।

সঙ্গীদের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু আমি পথে বেরিয়ে পড়ি প্রধানত জীবনের সন্ধানে—পথে ও পথের প্রান্তে নিত্য প্রবহমাণ জীবনধারায় অবগাহন করে বুড়িয়ে-যাওয়া মনটাকে বার বার তাজা করে নেবার জন্য।

কথাটা একটু হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে—আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।

কলকাতায় ও কলকাতার মত বড় বড় শহরে জনতা আছে কিন্তু জীবন নেই, বহুলত্ব আছে কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। শহরের মানুষ আমরা কয়েকটা মাত্র বাঁধা পথের পথিক—জীবিকার পথ, আত্মীয়তার পথ, বন্ধুত্বের পথ। ইঞ্চি-মাপা পদক্ষেপে মিনিট-মাপা মন নিয়ে আমরা প্রত্যহ এই বাঁধা পথ কটি ধরেই গতায়াত করি, একই গণ্ডির মধ্যে ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে কাল কাটাই। বিরাট শহর আমাদের চারপাশে শ্বাপদ-সঙ্কুল মহারণ্যের মত পড়ে আছে, সেদিকে চাইতেও আমাদের ভয় করে—তাই চারিদিকে অভ্যাসের শক্ত খোঁটা পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া বানিয়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের জন্য

একটা করে সংকীর্ণ চেনা মহল আমরা গড়ে নিয়েছি। প্রাণোচ্ছল বাহুল্যকে আমরা প্রাণপণে বর্জন করে চলি, অপরিচিতকে ভয় করি। ঠিক মৃত্যু হয়তো একে বলা চলে না, কিন্তু জীবন এ কিছুতেই নয়।

এই জীবন্মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যই পথে পথে ঘুরে বেড়াই। মনে হয় যেন অতিপরিচয়ের জেলখানা থেকে পলাতক আসামী আমি—জানি ধরা আবার পড়তেই হবে, তবু যে কটা দিন সেপাই-সান্ত্রীর চোখ এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারি সেই কটা দিনই লাভ। কত নদী-নির্ঝরের ধারাস্নানে মন আমার স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, কত পাহাড়ের শ্যামশীতল ছায়া পড়ে তার উপর, কত অরণ্যের আতঙ্ক তাকে চমকে দিয়ে যায়—পথের ধারে কত ফুল ফোটে, কত পাখী গান গায়। আর চোখের সামনে চলতে থাকে অপরিচিত নরনারীর অন্তহীন মিছিল।

অপরিচয়ের প্লাবনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দুদিন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

জীবনের স্বাভাবিক গতি অনেকটা ঢিমে তেতালা ধরনের—সেইজন্য তার সবটাই বড় সাধারণ বলে মনে হয়; 'কবিদৃষ্টি না থাকলে তার মধ্যে রস বা রোমাঞ্চ কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। মোটরগাড়ির তীব্রবেগ তার 'টেম্পো' অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়, জীবনের খণ্ডগুলিকে আকস্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। তখন বড়কে আরও বড় বলে মনে হয়, ছোটকেও তুচ্ছ বলে হেলা করবার উপায় থাকে না।—মোটরগাড়ি দ্রুত চলে, হঠাৎ থামে। এই বৈপরীত্যের সংঘাতে চোখ কান মন সবই প্রখর হয়ে ওঠে—জীবনকে খুঁটিয়ে দেখবার ক্ষমতা ও রসিয়ে উপভোগ করবার ক্ষমতা দুইই অনেক বেড়ে যায়।

ক্রমে ক্রমে আমাদের পর্যটক-গোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। আমার দুই প্রাক্তন ছাত্র—সমরেন্দ্র ও রাধিকারঞ্জন—বোধ হয় আমার সংস্পর্শ-দোষে প্রায় আমাদেরই মত বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। হিতেনবাবুর পুত্র শ্রীমান লাবু ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মান্থ সহযাত্রী হবার সুযোগ পেলে ছাড়তে চায় না।

স্কুল-কলেজের ছুটি থাকলে আমার দুটি ও বড়দার দুটি পুত্রও আজকাল সঙ্গে যাবার জন্য আবদার ধরে, মাঝে মাঝে, গিয়েও থাকে। বন্ধুবর নীতীশবাবু উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে—নিতান্ত অনবসর মানুষ; তাঁর মনেও রঙ ধরেছে, তিনিও দুই-একবার সঙ্গী হয়েছেন।

কিছুদিনের জন্য আরও একটি তরুণ একরকম জোর করেই এসে আমাদের দলে ভিড়েছিল। কিন্তু তার কথা এখন থাক—পরে বলব।

চার

এবার আমরা মাত্র তিনজন বেরুচ্ছি, হিতেনবাবু হঠাৎ একটা কাজে আটকা পড়ে গেছেন, গাড়িতে অনেক জায়গা আছে। আপনিও আসুন না আমাদের সঙ্গে? আপনি তো শুনেছি সাহিত্যিক, কারও বাঁধা মাইনের চাকর নন—দিন পাঁচেকের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে আপনার আর কি আপত্তি থাকতে পারে? বরং ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য কিছু মাল-মশলাও জুটে যেতে পারে।

না—খরচ এমন বেশি কিছু পড়বে না। অস্টিন গাড়ি আছে—গ্যালনে পঁচিশ মাইল তো যাবেই। গাড়িতে ওঠবার আগে প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশটি করে টাকা নিয়ে একটা লম্বা কাপড়ের থলিতে রাখা হবে। থলিটা বড়দার কাছে থাকবে, যখন যা প্রয়োজন হবে তিনিই তা থেকে খরচ করবেন। এ যাত্রায় তিনিই হবেন আমাদের কোষাধ্যক্ষ।

পথে যদি টাকা ফুরিয়ে যায়, আরও কিছু কিছু করে চাঁদা দিতে হবে—ফিরে আসার পর থলির অবশিষ্ট টাকা সমান চার ভাগ করে প্রত্যেককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হিসেব রাখার হাঙ্গামা কে পোহাবে বলুন? আর তার সময়ই বা কোথায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ—কাল ভোরেই রওনা হচ্ছি। আপনি শেষরাত্রে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যা হয় একটু চা-টা খেয়ে তৈরি হয়ে থাকবেন, ঠিক সাড়ে

চারটের সময় আপনার ওখানে গাড়ি নিয়ে হাজির হব। যত সকাল সকাল রওনা হওয়া যায় ততই ভাল।

সবে মার্চ মাস পড়েছে—ওদিকে এখন অতি চমৎকার আবহাওয়া। খুব হালকা বিছানা সঙ্গে নেবেন, রাতে গায়ে দিয়ে শোবার জন্য একটা সুতি চাদর আর মশারি। হ্যাঁ, মশারি নেবেন, দরকার হতে পারে।

ভাল কথা, পথ চলবার সময় আমরা সামান্য গোটাকয়েক বিধিনিষেধ মেনে চলি, সেগুলো আগে থাকতেই আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল।—

ক) কোথাও কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া চলবে না (তবে নিমন্ত্রণ খাওয়ার কোন বাধা নেই);

খ) পথে খবরের কাগজ কেনা বা পড়া নিষেধ (পুরনো কাগজ সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে—পথের ধারে পেতে বসা বা খাওয়ার জন্য, জুতো ও ভিজে কাপড়-গামছা জড়িয়ে নেবার জন্য);

গ) ঘরেরই হ'ক বা পরেরই হ'ক, গাড়িতে কোন স্ত্রীলোক তোলা চলবে না;

ঘ) রাজনীতি, সিনেমা-থিয়েটার, ক্রিকেট-ফুটবল, আপিস-আদালত ও বাজারদর সংক্রান্ত সর্বপ্রকার আলোচনা নিষিদ্ধ;

ঙ) পুরনো ভ্রমণ নিয়ে গল্প করা চলবে না (তবে ভবিষ্যৎ ভ্রমণের পরিকল্পনা করা চলবে);

চ) খাদ্য-সংগ্রহে ও খাদ্য-সংক্রান্ত গবেষণায় কোন প্রকার ঔদাসীন্য বরদাস্ত করা হবে না।

কেমন, আইন কটা মেনে চলতে রাজি আছেন তো?

আচ্ছা বেশ, তাহলে ঐ কথাই রইল।

দুর্গা! দুর্গা! কটা বাজল দেখুন তো। পাঁচটা বাজতে বিশ মিনিট? যাক, বড়দার সিডিউলের বিশেষ নড়চড় হয় নি এবার। ভোর পাঁচটায় রওনা হবে

স্থির করে বেরুতে বেরুতে বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেল—এমনও আমাদের অদৃষ্টে কয়েকবার ঘটেছে কিনা।

না, হাওড়া হয়ে যাব না—বেরুবার মুখে ঐ নোংরা জায়গাটা আমরা বরাবরই এড়িয়ে গিয়ে থাকি। আমরা বি-টি রোড হয়ে বালি ব্রিজ পার হয়ে যাব—আট আনা 'টোল' দিয়ে।

ব্রিজের ঠিক মাঝখানে এসে আমরা মিনিট পাঁচেকের জন্য একটু থামব। আসুন, নেমে এসে রেলিঙের ধারে দাঁড়ান। ভোর হয়ে এল—একবার ঘুমন্ত গঙ্গার বুকের উপর দিকে যতদূর পারেন দৃষ্টিকে ছেড়ে দিন, একবার পিছন ফিরে গাছপালায় ঘেরা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়াগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিন। বারকতক জোরে জোরে নিশ্বাস নিন। তার পর আবার চলুন।

ওতরপাড়ার গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড যেন সার্পেনটাইন লেনেরই রাজ-সংস্করণ—যেমন সরু তেমনি আঁকাবাঁকা। তবু তো এখনও বাস্ রিকশ পদাতিকের হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয় নি। এখানে গাড়ি খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে চালাতে হবে, নইলে মোড়ে মোড়ে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা। তবে আমাদের কোন দুশ্চিন্তার হেতু নেই—চিনিবাবু স্টিয়ারিঙে আছেন।

ভাল লাগছে না? কিন্তু এই দেখুন—এইখানেই কোথায় সূর্যমুখীর পিত্রালয় ছিল। এ সব অতি প্রাচীন জনপদ—জব চার্নকের কুঠিবাড়ি প্রতিষ্ঠা হবার ঢের আগে থেকেই এখানে বাঙালী ভদ্রসমাজের বসতির পত্তন হয়েছে, ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। বাঁ দিকে চেয়ে দেখুন, নতুন বাড়ি অবশ্য অনেক আছে, কিন্তু আমাদের ভাল লাগে পাতলা পাতলা ঢালাই ইটে গড়া ঐ পুরনো চুনবালিখসা দালান-কোঠাগুলোকে। এগুলো যখন গড়া হয়েছিল তখনও কাঠের ফর্মায় মাটি বেঁধে ইট তৈরির পদ্ধতির প্রচলন হয় নি—খোলা মাঠে বালি ছড়িয়ে তার উপর নরম কাদা ঢেলে দেওয়া হত, তার পর রোদে শুকিয়ে খুরপি দিয়ে সাইজ মত কেটে নেওয়া হত।

এইবার ডান দিকে তাকান। মোড়ের মুখে রক্তাভ সোনালি রঙের ঝিলিক। গঙ্গার জলের উপর তরুণ সূর্যের রক্তরশ্মি পড়েছে এসে। মা

গঙ্গা এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, বাঁকে বাঁকে ভাঙা-চোরা ঘরবাড়ি ঘাট-মন্দিরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাচ্ছেন।

ঐ দেখুন মাহেশের রথতলা। মনে আছে? এইখানেই রাধারাণী এসেছিল মেলায় ফুলের মালা বেচতে। তার পর বড়লোকের ছেলের ভাঁওতায় ভুলে তার সে কি দুর্ভোগ! ভাগ্যিস বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, তাই কোনরকমে শেষরক্ষা হয়েছিল—আজকালকার তরুণ সাহিত্যিকদের কারও হাতে পড়লে কেলেঙ্কারির চরম হত।

এইবার শ্রীরামপুরের রেলওয়ে ক্রসিং পার হচ্ছি—তার পর শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু—তার পর চন্দননগর।

চন্দননগর ছেড়ে এলাম। এতক্ষণে আমরা নাগরিক পরিবেশের নাগপাশ থেকে সত্য সত্য মুক্তি পেলাম। কলকাতা শহরটা যেন একটা বিশালকায় দানব, নেশার ঘোরে আলুথালু হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে ঘুমুচ্ছে—তার পরনের নোংরা কাপড়খানার একটা খুঁট এদিকে এই চন্দননগর পর্যন্ত এসে পড়েছে।

এইবার পথের দু পাশে মাঠ আর বন, দূরে দূরে দুই-একখানা ঝোপঝাড়ের ঘোমটা-ঢাকা কুঁড়ে ঘরের আভাস, মাঝে মাঝে মজা পুকুর বা ডোবা—তাতে লাল-শাদা শালুকের বাহার, হাওয়ায় সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। চিনিবাবু গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছেন।

হুগলি-চুঁচড়ো যাবার পথ ডাইনে পড়ে রইল। হু-হু করে এগিয়ে চলেছি, আদি সপ্তগ্রাম এসে পড়ল। দুটো সরু সরু মরা নদীর উপর দিয়ে পুল পার হয়ে এলাম, লক্ষ্য করেন নি বোধ হয়—তার একটার গায়ে নাম লেখা আছে কুন্তী, আর একটার গায়ে সরস্বতী। এই কুন্তী সরস্বতী আর ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলেই ছিল প্রাচীন ত্রিবেণী নগরী—এই যে, আমরা ত্রিবেণীর হাটখোলা পার হয়েই যাচ্ছি। নামগুলোর মধ্যে পুরাতন ইতিহাসের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন না কি? এবার ফিরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে'

উপন্যাসখানা পড়ে ফেলবেন। সাহিত্যিকেরা সব চেয়ে কম পড়েন সাহিত্য, তাই এই পরামর্শটুকু দিতে ভরসা পাচ্ছি।

ভাগীরথী আজ এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে—রেখে গেছে পলিমাটির আস্তরণের তলায় অফুরন্ত বালির ভাণ্ডার। এই তো মগরায় এসে পড়েছি। ঐ দেখুন, দু-ধারে বালির পাহাড় পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে—মগরার বালি, মাটি খুঁড়ে তোলা হয়েছে, কলকাতায় চালান দেওয়া হবে।

পেঁড়োর বাজার পার হয়ে এলাম—পেঁড়ো অর্থাৎ পাণ্ডুয়া, বাংলার পাঠান শাসনকর্তাদের অন্যতম লীলাভূমি। নেমে দেখবার কিছু কিছু জিনিস আছে বৈকি—মিনার মসজিদ সমাধিমন্দির। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানী তো আমরা নই, ইতিহাসের বাতাবরণই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। প্রাচীন পাণ্ডুয়ার বুক চিরে আমাদের আধুনিক যান ছুটে চলেছে—এর বেশি কিছুই আপাতত আমরা জানতে চাই না। সুতরাং এগিয়ে চলুন।···

কিন্তু একটু চা খেতে পেলে ভাল হত না? কি বললেন? অল্প অল্প খিদেও পেয়েছে? তা তো পাবেই। এ ধরনের ভ্রমণে বেশ ঘন ঘনই খিদে পেয়ে থাকে।

আসুন, এইখানে থামা যাক—এই গাছতলাটায় শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে পড়া যাক। এখনও সাতটা বাজে নি। তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই, সময় আমাদের হাতে প্রচুর আছে—আমরা আজ সময়ের সম্রাট!

ঐ ঝুড়িটার মধ্যে সিদ্ধ ডিম আছে, শিশিতে নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো আছে, দু-চারটে কড়াপাকের সন্দেশ আছে, একছড়া মর্তমান কলা আছে—আর ফ্ল্যাস্কে গরম চা আছে। তাছাড়া, দামী সস্তা সব রকম সিগারেটের টিন আছে, মিঠেকড়া বিড়ি আছে, মাদ্রাজী ও বর্মী দু রকমের চুরুট আছে। কি চান, বলুন।

দু পাশে ধূ ধূ করছে মাঠ, দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে। এখন খালি, কিন্তু আশ্বিন কার্তিকে এলে শস্য-সমুদ্রের সমারোহ দেখতে পেতেন এখানে। মা লক্ষ্মীর পাটন এখন শূন্য পড়ে আছে, মাঠ এখন বৈরাগী। তারই মাঝখান

দিয়ে সোজা চলে গেছে ঐতিহাসিক রাজপথ, দু পাশে বড় বড় গাছের সারি, কালো মসৃণ পিচের উপর আলোছায়ার জালিকাজের নকসা ফুটে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন বিরাট একটা চিত্রদেহ অজগর মাটির মধ্যে অর্ধাঙ্গ ডুবিয়ে সটান সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে আছে।

মাঠের উপর এখানে ওখানে দু-চারটে গরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। পথের পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে—দুটো ফিঙে পাশাপাশি তার উপর বসে অলস উদাসীন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। দূরে ডি-ভি-সি-র নতুন-কাটা বড় খালের উঁচু সাদা পাড় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

ভেবে দেখুন তো, অন্যদিন এ সময়ে আপনি কোথায়!—সারারাত্রি শান্তিহীন নিদ্রার পর দক্ষিণ কলকাতার একটা কোটরে শয্যায় পড়ে গড়িমসি করছেন, একান্ত অনাগ্রহের সঙ্গে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আজকের চা-টা কেমন লাগছে?

আর নয়—সাড়ে সাতটা বাজল—এইবার ওঠা যাক।

গাড়ির স্পীড আরও একটু বেড়েছে। এইবার আমরা হুগলি জেলার সীমান্ত ছাড়িয়ে বর্ধমানে প্রবেশ করলাম। দেখতে দেখতে মেমারি এসে পড়ল। এই সেই নতুন ব্রিজ, এইখানেই ডি-ভি-সি-র বড় খাল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়েছে।

যদিও শক্তিগড়ের ল্যাংচার খ্যাতি এখনও যথেষ্ট তবু আমরা শক্তিগড়ে থামব না। দালদার কলঙ্কস্পর্শে যে মিষ্টান্ন নিজের মর্যাদা খুইয়েছে তার প্রলোভনে সিডিউল ভাঙতে আমরা রাজি নই।

ঠিক সাড়ে আটটায় বর্ধমান। মা গঙ্গার আওতা ছাড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ, এইবার দামোদরের অববাহিকায় এসে পড়লাম।

শহর বাঁ-দিকে পড়ে থাকল, আমরা ডানদিকে মোড় ঘুরে একেবারে স্টেশন-রেস্তরাঁর খিড়কির দরজায় এসে গাড়ি থামালাম। আরও এক কাপ করে চা খেতে হবে, প্রাতঃকৃত্যাদির প্রয়োজন থাকলে তা সারতে হবে, ভাল করে

হাত-মুখ ধুয়ে নিতে হবে, ফ্ল্যাস্কটায় নতুন করে চা ভরে নিতে হবে, কুঁজোয় জল নিতে হবে। গাড়িতে কিছু তেল নেবারও বোধ হয় দরকার হবে।

তার পর লম্বা দৌড়—বর্ধমান থেকে আসানসোল। যতটা এসেছি আরও প্রায় ততখানি পথ—প্রকাণ্ড চওড়া—তীরের মত সোজা উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে এগিয়ে গেছে। পথের লেভেলিং-ও অতি চমৎকার, মনে হচ্ছে যেন গাড়ি হাওয়ার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। গাড়ি ও ট্রাকের ভিড় বেড়েছে,—গ্রাম-গঞ্জের কাছাকাছি স্থানে বহু মানুষের জটলা দেখা যাচ্ছে, পথের পাশে পাশে পথিকশ্রেণীও অবিরল হয়ে উঠেছে।

গাড়ির এঞ্জিনের মধ্যে মৌমাছির গুঞ্জনের মত একটা চাপা গুন গুন আওয়াজ হচ্ছে, পাহাড়ী নদীর জলস্রোতের মত হাওয়ার তোড় এসে মাকে-মুখে-চোখে ভেঙে পড়ছে, মগজের মধ্যে কেমন যেন একটা নেশার ঘোর ঝিমঝিম করছে।

গাড়িটা খুব বেশি জোরে চলছে বলে মনে হচ্ছে আপনার? বেশ তো, চিনিবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন না। কি বললেন উনি? ঘণ্টায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইলের বেশি নয়? একবার স্পীডোমিটারটা দেখুন তো। কাঁটা নড়ছে না? কল বিগড়ে গেছে? এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। বর্ধমান আর আসানসোলের মধ্যে চিনিবাবুর স্পীডোমিটার প্রত্যেক বার বিকল হয়ে যায়—কাঁটা কিছুতেই নড়ে না।

আমি একটা আন্দাজ করতে পারি—পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন, মাঝে মাঝে ষাট। অষ্টিন গাড়ির পক্ষে স্পীড নেহাৎ কম নয়, তবে ভয়ের কোন কারণ নেই।

খানা পার হয়ে এলাম—গল্‌সি পরাজ বুদবুদ চটি, তার পর পানাগড়। এইবার ঐ দেখুন, রাস্তার বাঁ দিকে বাগানে-পুকুরে সাজানো ছবিটির মত রাজবাঁধ ডাকবাংলো। এর পরই প্রকাণ্ড বড় একটা ঢেউএর মত পথ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠেছে—পর পর তিনটে ঢেউ। দুর্গাপুরের জঙ্গল। এক সময়ে এখানে ঠ্যাঙাড়ের বড় উপদ্রব ছিল। পথের দুধারে গাছে কাছি বেঁধে গাড়ি উল্‌টে দিত—রাহাজানি করত, খুন করত।

আর এখন ? দ্বিতীয় ঢেউটার ঠিক মাথার উপর দিয়ে জঙ্গল কেটে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই রাস্তা ধরে মাইল চার পাঁচ গেলেই দামোদরের ধারে গিয়ে পড়বেন ; সেখানে ব্যারাজ হয়েছে, লৌহনগরীর পত্তন হয়েছে, শিল্প-সমৃদ্ধ নববঙ্গের হৃৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ পূরোদমে চলছে। ব্যারাজের ব্রিজের উপর দিয়ে দামোদর অতিক্রম করে বাঁকুড়া মেদিনীপুর হয়ে সমুদ্রতীরে দীঘা পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়।

আসবেন আর একবার আমাদের সঙ্গে, ওদিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

এখন আমরা কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ঐ দেখুন, এঞ্জিনঘরে এঞ্জিন চলছে, বড় বড় হেড-গিয়ারের চাকা ঘুরছে, কেজ ওঠানামা করছে—কয়লা-ভর্তি টব উপরে উঠছে, খালি টব ভিতরে নামছে। মাটির নীচে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে কালো কালো পোকার মত মানুষের আনাগোনা চলছে—অনেক দুঃখে জলে-পুড়ে মাতা বসুন্ধরার বুকের যেসব পাঁজর আংরা হয়ে গেছে গাঁইতি-শাবল দিয়ে সেইগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে তারা বাইরে টেনে আনছে ; তাই দিয়ে আরও অনেক এঞ্জিন চালানো হবে, আরও অনেক চাকা ঘোরানো হবে।

আসানসোল এসে পড়ল। এ শহরের যেটুকু আমাদের যাতায়াতের পথে নজরে পড়ে তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল জনতা আর জঞ্জাল। এখানে আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। কোন দোকান থেকে কিছু রুটিমাংস কিনে নিয়েই চম্পট দেব।

আসানসোলের বারো-চৌদ্দ মাইল পরেই বরাকর নদী, বাংলা ও বিহারের সীমানা। বড় নদী, অনেক দূর থেকে ধোয়াট নেমেছে, পথও অনেক দূর ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে নদীর ধারে এসে পৌঁছেছে।

এইবার আমরা ব্রিজে উঠব, কিন্তু তার আগে ডাইনে ঐ অনেক নীচে চেয়ে দেখুন, কি সুন্দর দুটি ছোট্ট ছোট মন্দির! পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে তৈরি, কিন্তু ছোট বলে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। নেমে ভাল করে দেখতে চান?—আচ্ছা, এখন থাক, ফেরবার সময় দেখা যাবে।

বিহারের পথ চওড়া কম, কিন্তু আর কোন খুঁত নেই—বরং চড়াই-উৎরাই-এর তরঙ্গোৎক্ষেপের দরুন আরও যেন সুন্দর বলে মনে হয়।

ডানদিকে এই পথ ধরে অল্প কিছুটা গেলেই মাইথনের নতুন তৈরি বাঁধ ও জলাশয়ে গিয়ে পৌঁছনো যায়; পাঞ্চেত রইল বাঁদিকে, দূরের ঐ পাহাড়গুলোর কাছে; সেখানে এখনও কাজ শেষ হয় নি, বিশ্বকর্মার কর্মশালে মহানসের আগুন এখনও জ্বলছে।

কুমারধুবি ও মগমার ঊষর বৃক্ষলতাহীন অঞ্চল ছেড়ে আমরা শ্যামলতর ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

এই যে ডানদিকে বাড়োয়ার ডাকবাংলো। আসুন, এইখানে চৌকিদারকে দিয়ে জল তুলিয়ে স্নান সেরে নেওয়া যাক, তার পর ঐ গাছতলায় আরাম করে বসে সঙ্গের খাদ্যদ্রব্যগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। বেলা বারোটা বেজে গেছে।

চারিদিকে খোলা মাঠ, পাথুরে ডাঙা আর কাঁকুরে জমি, তারই মাঝখানে রাস্তার দিকে একটু চেপে ছোট্ট নিঃসঙ্গ ডাকবাংলোটি দাঁড়িয়ে আছে, পাশে এই কটি শিশু ও সেগুন গাছের প্রহরী নিয়ে। সামনে চেয়ে দেখুন, জমিটা ক্রমশ ঢালু হয়ে ওদিকে নেমে গেছে। ওখানে একটা ছোট নদী আছে। অনেকটা দূর হলেও যদি চুপ করে কান পেতে শোনেন তো জলের কল কল আওয়াজ শুনতে পাবেন।

লোকে বলে এখানে ভূত আছে। তা থাকতেও পারে—এ তো কলকাতা নয়, ভূতের চেয়েও অদ্ভুত মানুষের দল এখানকার সবকিছু এখনও জবর-দখল করে নিতে পারে নি।

মোটা মানুষ, একটু ক্লান্তি অনুভব করছেন? বেশ তো, আধ-ঘণ্টাটাক গড়িয়ে নিন না। বেলা দুপুর হলেও হাওয়ায় তাত নেই, ভালই লাগবে।

এই হল গোবিন্দপুর। এখান থেকে বাঁয়ে কেটে আমরা ধানবাদ যেতে পারি, তার পর দামোদরের ব্রিজ পার হয়ে চাস-রোড ধরে ইচ্ছা হলে পুরুলিয়া

চাণ্ডিল হয়ে টাটানগরে চলে যেতে পারি, নইলে মুরী হয়ে রাঁচিও যেতে পারি। কিন্তু আমরা এবার সোজাই যাব।

কলকাতা থেকে এক শ নব্বুই মাইলের মাথায় তোপচাঁচি। ঐ ডাক-বাংলো দেখা যাচ্ছে। বড়দা একটু নড়ে-চড়ে বসলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা আজকের মত এখানেই থাকব, একদিন বিশ্রাম নেব। এদিকে এলেই আমরা তোপচাঁচিতে একদিন থেকে যাই। জায়গাটা আমাদের বড় ভাল লাগে—গ্রামের অনেক লোকের সঙ্গে বেশ চেনাশোনাও হয়ে গেছে। বিশেষ করে বড়দার এখানে বেজায় খাতির।

ঐ দেখুন, ডাকবাংলোর চৌকিদার হাসিমুখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে, পানিওয়ালা আসছে, মেথর আসছে—সবাই আমাদের দেখে খুশি হয়েছে। একটু পরেই শেখ বক্সু-র জড়বুদ্ধি ভাইপোটা তালপাতার ঠোঙায় করে মুরগির ডিম নিয়ে 'সেলাম বাবুজি' বলে এসে দাঁড়াবে; সুধারাম জেলে টাটকা ধরা মাছ নিয়ে আসবে; ধরমা ধোবী এসে জানিয়ে দিয়ে যাবে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে জামা-কাপড় কেচে ইস্ত্রি করে দিতে পারে; বিশুয়া এসে তার দোকানে চা-খাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে যাবে। রাস্তার ওপারে ঐ হল বোসবাবুদের বাড়ি। বোসবাবু আমাদের বিশেষ বন্ধুমানুষ ছিলেন—বছর তিনেক হল মারা গেছেন। তাঁর ছেলেরাও আসবে, কাকা-জ্যেঠা বলে ডাকবে, সাংসারিক সুখ-দুঃখের নানা কাহিনী শুনিয়ে যাবে।

আসুন, বারান্দায় কখানা চেয়ার নিয়ে আরাম করে বসা যাক। সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের উপর অনেকগুলো বড় বড় গাছ আর গাছের ছায়া, ডাইনে চোখ ফেরালে দেখতে পাবেন পথের ওপাশে পরেশনাথের পাদশৈলমালার শোভা—আসল পরেশনাথকে এখান থেকে দেখা যায় না, তার জন্য আরও একটু এগিয়ে যেতে হয়। আশেপাশে জনবসতি নেই, কর্মব্যস্ত গ্রামগুঞ্জন এতদূরে কানে এসে পৌঁছয় না।

ভাষাটা একটু বেশি কাব্যিঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে—মনে মনে হাসছেন তো? তা হাসুন, কিন্তু জায়গাটা সত্যিই বড় নিরিবিলি, বড় ঠাণ্ডা। এখানে

এসে বসলে দেহের মনের সব প্রদাহ জুড়িয়ে যায়—কলকাতাকে ভুলে থাকা যায়।

এখান থেকে কোথায় যাব? সে কাল সকালে ঠিক করা যাবে—বড়দা সিডিউল তৈরি করবেন।

আজ রাত্রে পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

বরং আসুন, রাত্রে কি কি খাওয়া যাবে তার একটা 'মেনু' গড়ে ফেলা যাক।

পাঁচ

তোপচাঁচি।

অনেকদিন হয়ে গেল, কিন্তু এখনও সেই নামাবলীওয়ালা ভদ্রলোকটির কথা ভুলতে পারলাম না। তোপচাঁচিতে এলেই তাঁর কথা মনে পড়ে।

সেবার বড়দা গিয়েছিলেন পুনা-বোম্বাই অঞ্চলে কোন্ এক মক্কেলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, সাথী হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন চিনিবাবুকে। কাজেই আমাদের গাড়ি চালানোর ভার পড়েছিল শ্রীমান রমেশের হাতে। ভ্রাম্যমাণ আমরা তিনজন—আমি, হিতেনবাবু ও রাধিকা। রাধিকা সেই প্রথম আমাদের সঙ্গে পথে বেরিয়েছে।

সারাদিন গুমোটের পর সন্ধ্যাবেলা চেপে বৃষ্টি নেমেছিল। ঘি-ভাত ও কচি পাঁঠার ঝোল সহযোগে নৈশ ভোজন সমাধা করে আমরা যখন ডাক-বাংলোর বারান্দায় খাটিয়া চেপে বসলাম তখন রাত প্রায় নটা।

বৃষ্টিটা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হেডলাইটের তীব্রোজ্জ্বল আলোকে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে একখানা গাড়ি মোড় ঘুরে ডাক-বাংলোর প্রাঙ্গণে এসে ঢুকল।

মস্তবড় দামী গাড়ি—লালরঙের প্যাকার্ড টুরার। গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তাঁরও পরনে দামী সাদা স্যুট, হাতে কুমীরের চামড়ার তৈরি একটা

ছোট ব্রিফ-কেস। শ্যামবর্ণ ছোটখাটো চেহারা, বয়স আমাদেরই মত হবে।—পিছন পিছন উর্দিপরা চাপরাশী নামল গাড়ির ভিতর থেকে।

বড়লোক—খুবই বড়লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বভাবটি বেশ অমায়িক বলেই মনে হল, কথাবার্তাও ভাল।

আমাদের দেখে একটু হেসে বললেন, 'বাঃ! বেশ জমিয়ে বসেছেন তো দেখছি! খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে বুঝি?'

আমন্ত্রণ জানাতেই, আমার খাটিয়ার একপ্রান্তে বসে পড়লেন, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট-এর টিন থেকে সিগারেট অফার করলেন।—চাপরাশী গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে লাগল।

—'আপনারা কি রাত্রে বারান্দাতেই শোবেন? তা ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। বৃষ্টি হয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, বাইরে শুতে ভালই লাগবে।'—চাপরাশীকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

হিতেনবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া?'

—'সেসব হাঙ্গামা আসানসোল থেকেই চুকিয়ে এসেছি। শোবার আগে এক কাপ হরলিক্স করে দেবে, আর কিছুই লাগবে না।'

খাট বাইরে এল, তার উপর ধবধবে-চাদর-মোড়া বিছানা পাতা হল। নরম ডবল বালিশের উপর ধোপভাঙা তোয়ালে বিছিয়ে দেওয়া হল।—ভদ্রলোক উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

বেরিয়ে এলেন যখন, তখন তাঁর পরনে ঢিলা স্লীপিং স্যুট, আর কাঁধের উপর—ওটা কি?

পাশেই টেবিলের উপর হারিকেন জ্বলছে, ভুল দেখবার কোনই সম্ভাবনা নেই। আমরা যেন কেমন হতভম্ব হয়ে বোকার মত একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

শেষ পর্যন্ত তিনিই কথা বললেন: 'কি দেখছেন অত অবাক হয়ে? এখানা নামাবলীই বটে, আপনাদের দেখতে ভুল হয়নি। নামাবলী গায়ে দিয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।'

এবার সন্দেহ হল, কানে ঠিক শুনছি তো? ভদ্রলোককে তো পাগল বলে মনে হয় না। তবে—?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর তিনি আবার বললেন, 'একটা গল্প শুনবেন?—এই নামাবলী নিয়েই গল্পটা। কি থাক্—আপনারা বোধ হয় খুব ক্লান্ত আছেন—'

রাধিকা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'না,না, ক্লান্ত আমরা মোটেই নই, আজ সারাদিন এখানেই আছি। আপনি গল্প বলুন।'

ভদ্রলোক বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর গল্প শুরু করলেন:

ললিতার ছিল অপরূপ রূপ, অপর্যাপ্ত যৌবন; আমার ছিল অঢেল অর্থ—বাড়ি, গাড়ি, মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। সবই নিজের রোজগারে। যুদ্ধের বাজারে মাত্র দু শ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যাবসা শুরু করেছিলাম—আজ আমি ক লক্ষ টাকার মালিক চট করে জানতে চাইলে নিজেও তা বলতে পারব না।

যুদ্ধের বাজারে সাদা-কালো নানা গলিতে ঘোরাফেরার ফলে এই শিক্ষা হয়েছিল যে উপযুক্ত দাম দিতে পারলে সব জিনিসই কেনা যায়। সুতরাং রূপযৌবনই বা কেনা যাবে না কেন? ললিতার জন্য আমি উপযুক্ত দাম দিতে প্রস্তুত। তবে কেন তাকে আমি পাব না?

কিন্তু ললিতাকে পাবার পথে একটা বাধা আছে—সে বিবাহিতা। তার স্বামী গৌরগোপাল এক সময়ে আমার সহপাঠী ছিল। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করে কলকাতার কোন্ একটা ইস্কুলে মাস্টারি করে। হতদরিদ্র, ফড়িঙের মত রোগা টিঙটিঙে চেহারা, ফ্যাকাশে ফরসা রঙ। শুনেছি নাকি মাসিকে সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে কবিতা লিখে থাকে।

মোদ্দা কথা আমার মত জাঁদরেল ব্যাবসাদারের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার মত কোন যোগ্যতাই তার নেই। দু বেলা দাদা দাদা করে আত্মীয়তা কাড়াতে আসে, বিনি পয়সার চা-সিগারেটের শ্রাদ্ধ করে যায়। দেখা হলেই স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে নির্লজ্জ খোশামোদ জুড়ে দেয়, নিমন্ত্রণের অছিলায়

গোবিন্দ বসাক লেনের সেই অন্ধকার নোংরা ঘর দুখানার মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য আমার চোখের সামনে তুলে ধরে, ঋণের ছদ্মবেশে দেওয়া দান স্বচ্ছন্দে হাত পেতে গ্রহণ করে।—গৌরগোপালকে দেখলে আমার দয়া হয় না, ঘৃণা হয়।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা, এই গৌরগোপালই সেদিন আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে নিদারুণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। মন্তর-পড়া বিয়ের স্বামীরা স্ত্রীকে কখনও নিজস্ব একটা সম্পত্তি মাত্র বলে ভাবতে পারে না। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, রক্তমাংস অস্থিমজ্জায় গড়া নারী নামধেয় বস্তুটি বুঝি মন্ত্রের ম্যাজিকে রাতারাতি একটা আইডিয়ায় পরিণত হয়ে গেছে। আইডিয়া কেনাবেচার কোন বাজার নেই। তাই অভাব-অনটনের হাত থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য নিজের স্ত্রীকে বাঁধা দিতে বা বিক্রী করতে রাজি আছে এমন স্বামী খুব অল্পই দেখা যায়। স্ত্রীর গায়ের গয়না সে স্বচ্ছন্দে বেচবে, কিন্তু স্ত্রীর দেহের রূপযৌবন বেচবার কল্পনাতেও তার মন আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

আমার চিন্তাধারা ছিল অন্য ধরনের। বস্তুমাত্রই পণ্যবস্তু। নারীও একটা বস্তু, সুতরাং নারীও পণ্য। ললিতাকে আমার প্রয়োজন, তাকে আমি উচিত মূল্যে কিনতে চাই—ব্যবসায়ীর পক্ষে এ রকম একটা অভিলাষ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কাল্পনিক দেহাতীত অধিকারের দাবী নিয়ে গৌরগোপাল আমার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রতিবন্ধক আমাকে সরিয়ে ফেলতেই হবে, নইলে ব্যবসায়ী হিসাবে আমাকে হার মানতে হবে—সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

কারবারে কয়েকটা শক্ত রকমের জট পাকিয়ে উঠেছিল, মাস দুই তা নিয়ে খুব ছুটোছুটি করতে হল, খুব খাটতে হল। তাছাড়া ইনকম ট্যাক্স আপিসে দাখিল করবার জন্য জাল খাতা তৈরি করাতে হল—সেও হাঙ্গামা কম নয়।

অবিশ্রান্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পর ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি একটু

অবসর মিলতে না মিলতেই ইনসম্‌নিয়ার প্রবল আক্রমণ শুরু হল। অবশ্য ইনসম্‌নিয়া এই আমার নতুন নয়। যেদিন থেকে ব্যাবসার নেশায় তাস করে মেতে উঠেছি, অর্থাভাবের পীড়ন থেকে মুক্তিলাভ করে অর্থস্রোতের খরস্রোতে গা ঢেলে দিয়েছি, সেদিন থেকেই আরাম করে ঘুমনোর আনন্দ আমি হারিয়েছিলাম। সুনিদ্রা আমার কোনদিনই হত না। প্রতি রাত্রেই কতকগুলো অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি গিলে শয্যা গ্রহণ করতে হত। তবে মাঝে মাঝে আক্রমণ বড় তীব্র, বড় দুঃসহ হয়ে উঠত। এবারকার আক্রমণটা সেই ধরনের।

লুমিনল খেয়েও যখন কোন ফল পেলাম না, তখন ঠিক করলাম, কদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাব। শহর থেকে দূরে পল্লী অঞ্চলের শান্ত পরিবেশের মধ্যে কদিন বিশ্রাম করতে পেলে হয়তো শীগগির সুস্থ হয়ে উঠতে পারব।

হঠাৎ গৌরগোপালের কথা মনে পড়ল। ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না? জীবনেও একটা শক্ত রকমের জট পাকিয়ে উঠেছে। এই উপলক্ষে হয়তো তারও একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে।

পরদিন সকালেই গাড়ি নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। হাঁক দিয়ে বললাম, 'কি হে কবি, পচা গলির এঁদো কুঠরির মধ্যে বসে বসে বসন্তের আবাহন রচনা করছ নাকি? চল তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি সত্যি-কার বসন্ত কাকে বলে। কালই ইস্কুলে গিয়ে সাত দিনের ছুটি নাও। শরীর তো তোমার খারাপ আছেই, অজুহাতের অভাব হবে না—পরশু ভোরবেলা আমি গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে; একাই যাব, নিজে ড্রাইভ করব। চল তুমি আমার সঙ্গে!'

এখানে এই ডাকবাংলোয় যখন এসে পৌছুলাম তখন বেলা প্রায় একটা। সারাটা পথ গৌরগোপাল আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। সে আজীবন কলকাতায় মানুষ হয়েছে, আসল শহুরে ককনি। বরযাত্রী হয়ে একবার দত্তপুকুর ও

একবার চুঁচড়োয় গিয়েছিল। সংসার চালাতেই প্রাণান্ত, দেশভ্রমণের স্বপ্ন দেখবারও সাহস কোনদিন হয় নি। তার উপর আবার সে কবি। পথের সৌন্দর্যে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। সর্বক্ষণ তার ন্যাকা ন্যাকা কাব্যিক বুকনিতে বোঝাই উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। অধৈর্য হয়ে শেষটায় তাকে পিছনের সিটে বসিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতেও তার বকুনি বন্ধ হয় নি।

স্নানাহার ও বিশ্রামের পর বিকেলবেলা তোপচাঁচি লেক দেখতে গেলাম। লেকের একেবারে উত্তর প্রান্তে গিয়ে গাড়ি রাখলাম। গাড়ি থেকে নেমে গৌর-গোপাল সামনের বিশাল জলাশয় ও চারপাশের নিবিড় অরণ্যময় গিরি-প্রাচীরের দিকে বিমুগ্ধনেত্রে একবার চেয়ে দেখেই যেন আনন্দে ক্ষেপে উঠল। ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল, তার পর পাহাড়ের গায়ে বনের মধ্যে কয়েকটা ফুলন্ত পলাশ ও শিমুল গাছের দিকে নজর পড়তেই তারস্বরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল।

নাঃ! আর পারা যায় না। উৎকট শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও এই লোকটার হ্যাংলামি আর নাটুকেপনা বেশি অসহ্য হয়ে উঠেছে। একে যদি আমি হাজারিবাগ-রামগড়ের ফুলের-আগুন-লাগা দিগন্তব্যাপী পলাশবনের মধ্যে নিয়ে যাই, চুটুপালুর চূড়ায় তুলে নীচের ছড়িয়ে-পড়া নদী-প্রান্তর-লোকালয়ের কুয়াশার রঙে আঁকা রেখাচিত্র দেখাই, গৌতমধারার গিরিখাতের মধ্যে নামিয়ে ঝর্ঝরিত জলধারার গুরুগর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শোনাই, কিংবা নেতারহাটের উঁচু অধিত্যকার উপর নিয়ে গিয়ে ঢেউখেলানো পাইন-বন ও ঘাঘরি জলপ্রপাতের পরীরাজ্যের মধ্যে ছেড়ে দিই—তাহলে ও কি করবে? বোধ হয় পরনের কাপড় মাথায় বেঁধে ধেই ধেই করে নাচতে থাকবে। তখন ওকে গুলি করে মারা ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর থাকবে না।

কিন্তু গৌরগোপালকে আমি গুলি করে মারতে চাই নে। জি-টি রোডের আশেপাশে আকছার মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে। ভেবেছিলাম ফেরবার পথে আমাদেরও কোনরকম একটা সুবিধাজনক অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যাবে।

কিন্তু পরিকল্পনা পালটাতে হল। অ্যাকসিডেণ্ট যা ঘটবার তা এখুনি ঘটা প্রয়োজন—যা করবার এখুনি করে ফেলতে হবে। গৌরগোপালের সঙ্গ আমার পক্ষে বেশিদিন সহ্য করা সম্ভব নয়।

সেদিন রাত্রেও ঘুম হল না।

পরদিন সকালে উঠে গৌরগোপালকে বললাম, 'শরীরটা বড়ই খারাপ মনে হচ্ছে, আজ আর হাজারিবাগ রওনা হব না। তুমি বরং এদিক ওদিক ঘুরে-ফিরে বেড়াও—জায়গাটা দেখ, আমি একটা দিন বিশ্রাম নিই।'

শরীর সত্যিই খুব খারাপ হয়েছিল। জ্বর নেই, অথচ সর্বাঙ্গে একটা প্রচণ্ড প্রদাহের ভাব; দুই চোখের মধ্যে কে যেন লঙ্কা বেটে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ঘন ঘন মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, মাথার মধ্যে থেকে থেকে চিড়িক মেরে উঠছে। পরপর চার কাপ চা ও প্রায় এক কুঁজো জল শেষ করে ফেলবার পর স্যুটকেস থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে নিয়ে বসলাম।—মদ আমি খাই নে, মাতালকে বরং একটু ঘৃণার চোখেই দেখে থাকি। কিন্তু একটানা ইনসম্নিয়ার আক্রমণ চলতে থাকলে আমাকে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে হুইস্কির শরণাপন্ন হতে হয়।—দুপুরে কিছুই খেতে পারলাম না।

বেলা যখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লাম। সময় হয়েছে। গৌরগোপালকে ডেকে বললাম, 'এমনভাবে হাত-পা কোলে করে বসে থাকলে শরীর ভাল হবে না। চল, গাড়ি নিয়ে একটা লম্বা দৌড় দিয়ে আসি—খোলা হাওয়ায় হয়তো দেহের গ্লানি কেটে যেতে পারে।'...

তোপচাঁচির পর নিমিয়াঘাট, তার পর ইস্রি, তার পর ডুমরি। ডানদিকে পরেশনাথ—তার সবচেয়ে উঁচু শিখরের উপর জৈন মন্দিরের ছুঁচলো চূড়াটি একটুখানি হেলে পড়ে যেন আকাশের গায়ে খোঁচা মারছে। একটু নীচে পরেশনাথ ডাক-বাংলোর নতুন চুনকাম করা সাদা দেয়াল দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন একটুকরো মেঘ পাহাড়ের গায়ে গাছপালার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। তার পর পরেশনাথ পিছনে পড়ে রইল, আমরা বগোদরের

এসে পৌঁছুলাম।—গৌরগোপাল আবার অনর্গল বকতে শুরু করেছে। বোধ হয় তার বকুনির ধাক্কাতেই মাথার যন্ত্রণাটা হঠাৎ খুব বেড়ে উঠেছে বলে মনে হল।

বগোদরে চা খেয়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম। কয়েক মাইল পার হবার পরই পথের চেহারা একদম বদলে গেল। বাঁ দিক থেকে একসারি সবুজ পাহাড় প্রায় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, আর তারই হাঁটুর কাছে ধাক্কা খেয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হঠাৎ-বাধা-পাওয়া নদীস্রোতের মত এঁকে-বেঁকে ঢেউ খেলিয়ে পাক খেয়ে একটা বিপর্যয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। কলকাতা থেকে শোন নদী পর্যন্ত পথের এমন বিচিত্র দৃশ্য আর কোথাও নেই।

গৌরগোপাল আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'দাদা, গাড়িটা একটু থামাবেন? নেমে জায়গাটা একটু ভাল করে দেখি।'

পথের ধারে কাঁচায় নেমে গাড়ি থামিয়ে ফেললাম। গৌরগোপাল নেমে গেল, আমি গাড়িতেই বসে রইলাম। মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে! দুই চোখ বোধ হয় যন্ত্রণায় লাল হয়ে উঠেছে, নইলে পড়ন্ত রোদ্দুরের সোনালি আলোয় মাখা পাহাড়ী জঙ্গলের গাঢ় সবুজ রঙ এমন লালচে বলে মনে হচ্ছে কেন?—হাত দিয়ে দুই রগ শক্ত করে টিপে ধরে চোখ বুজে সিটের উপর মাথাটা হেলিয়ে দিলাম।

খুট্ খুট্! খস্ খস্!—একটা অস্পষ্ট শব্দে চট্কা ভেঙে চোখ মেলে দেখতে পেলাম, দুজন দেহাতি লোক একপাল ভেড়া নিয়ে বাড়ীর দিক থেকে আসছে। হাতছানি দিয়ে ডাকতেই তারা কাছে এগিয়ে এল। গাড়ি যেখানে থামিয়েছিলাম ঠিক তার সামনে দিয়ে একটা চওড়া কিন্তু অপরিচ্ছন্ন কাঁকরের রাস্তা বেঁকে বাঁ দিকে বনের মধ্যে ঢুকে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ পথ কোথায় কতদূর গেছে?'

উত্তর পেলাম, 'বংগালি বাবাজীকা আশ্রম তক।'

বাবাজীর নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে ভক্তিভরে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। উত্তরে জানতে পারলাম, প্রায় পনের-ষোল বছর আগে এক বাঙালী বৈষ্ণব সাধু এই নির্জন বনের মধ্যে এসে বাসা বাঁধেন। সরল সুমিষ্ট স্বভাবের মানুষ, ভণ্ডামি নেই অভিমান নেই আস্ফালন নেই—স্থানীয় দরিদ্র দেহাতিরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। ক্রমে একটু একটু করে নাম ছড়িয়ে পড়ল, তাঁকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি আশ্রম গড়ে উঠল। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন বহু বাঙালী-অবাঙালী ভক্ত তাঁকে প্রণাম করতে আসত। চার-পাঁচ বছর হল তিনি দেহরক্ষা করেছেন। আশ্রমের প্রাঙ্গণেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়।—এখন আর আশ্রমে কেউ বাস করে না। ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে সব জঙ্গল হয়ে গেছে। কিন্তু জায়গাটি নাকি 'বহুৎ বঢ়িয়া'—তা ছাড়া 'ধরম থান'ও বটে। গাড়ি যেতে কোন অসুবিধা হবে না, জঙ্গল থেকে কাঠ আনবার জন্য বহু লরি এখনও ঐ পথেই যাতায়াত করে। মাত্র আধ মাইল পথ—হয়তো সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে।

গৌরগোপালকে ডেকে এনে গাড়িতে তুললাম। বললাম, 'চল বংগালি বাবাজীর আশ্রম দেখে আসি।'

সে বলল, 'কাজ নেই দাদা, ফিরতে হয়তো রাত হয়ে যাবে।'

ধমক দিয়ে বললাম, 'ধ্যাৎ, আধ মাইল মাত্র পথ, যাব আর আসব।—তা ছাড়া, ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাত, সঙ্গে বন্দুক রয়েছে, এত ভয়ই বা কিসের?'

পথটা বিশেষ ভাল নয়, খুব সতর্ক ভাবে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। হঠাৎ ডানদিকে একটা মোড় ঘুরতেই গৌরগোপাল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'বাঃ! কি সুন্দর!'

পলকের জন্য চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম। আশ্রমে এসে পড়েছি। পথ এখানে ডানদিকে মোড় ঘুরে তার পর প্রায় এক শ গজ খাড়া চড়াই বেয়ে উপরে উঠে একটা ভাঙাচোরা কাঠের গেটের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। ইট-খসে-পড়া পাঁচিলে ঘেরা আশ্রমের মধ্যে অনেকগুলো কুর্চি সিতামালতী আর পলাশের গাছে অজস্র সাদা ও লাল ফুল ফুটে রয়েছে। তাদের মধ্যে

দেখা যাচ্ছে দুখানা খোলায় ছাওয়া কুঁড়েঘর। একখানার চাল ভেঙে পড়েছে, কিন্তু আরেকখানার দরজার সামনে চালের বাতায় দুই খুঁট বেঁধে একখানা নামাবলী লম্বালম্বি ভাবে টাঙানো রয়েছে। বোধ হয় কেচে শুকোতে দেওয়া হয়েছে—বনের হাওয়ায় পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে।

নামাবলী!—তাহলে তো আশ্রম জনহীন নয়! নিশ্চয় আবার কোন বিটলে বাবাজী এসে আস্তানা গেড়ে বসেছে। মনটা দমে গেল। পরিকল্পনার প্রথম ধাপেই বাধা!

বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলাম না। এই পথটুকু একে খাড়াই তার উপর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অতি সাবধানে গাড়ি উপরে তুলতে হল। উপরে উঠে গেটের সামনের ছোট্ট একটুখানি সমতল জায়গায় সন্তর্পণে গাড়ি ঘুরিয়ে ঢালুর দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে এঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। শক্ত করে হ্যাণ্ডব্রেক টেনে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম, তার পর পথের ধার থেকে দুখানা মাঝারি সাইজের পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সামনের দুই চাকার টায়ারের নীচে গুঁজে দিলাম, যাতে হঠাৎ ব্রেক স্লিপ্‌ করে গাড়ি নীচে গড়িয়ে পড়তে না পারে।

এইবার ফিরে দাঁড়িয়ে আশ্রমের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেই চমকে উঠলাম:

—'এ কি! নামাবলী কোথায় গেল?'

গৌরগোপাল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'নামাবলী? নামাবলী আবার কোথায় দেখলেন দাদা?'

—'ঐ যে, ঐ ঘরের সামনে টাঙানো ছিল, হাওয়ায় পত্‌ পত্‌ করে উড়ছিল।'

—'কই না তো। গাড়ি বাঁক ঘোরবার পর থেকেই আমি এইদিকে চেয়ে আছি। কোথাও কোন নামাবলী তো দেখতে পাই নি।'

—'কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলাম!'

গৌরগোপালের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে আমি তাড়াতাড়ি গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে কোন পথ নেই, বুনো আগাছার জঙ্গলে সমস্ত উঠানটা ছেয়ে গেছে। সেই জঙ্গল ঠেলে একে একে দুখানি কুঁড়ে ঘরই দেখে এলাম—দুখানাই সমান জীর্ণ, মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। জানলা-দরজা ভেঙে খসে পড়েছে, চালের প্রায় অর্ধেক খোলাই নেই। নামাবলীর নামগন্ধও কোথাও খুঁজে পেলাম না।

নাঃ! নামাবলী নয়, দৃষ্টিবিভ্রম। রাত জেগে জেগে টাটিয়ে-ওঠা চোখ দুটোকে গাড়ি চালিয়ে আরও ক্লান্ত করে ফেলেছি। তাই, কি দেখতে কি দেখেছি। সম্পূর্ণ জনমানবহীন স্থান—আমার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন কেউ বা কিচ্ছু কোথাও নেই।

ফিরে এসে গাড়িতে বসলাম। গৌরগোপাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সন্ধানে আশ্রমের পিছন দিকে চলে গেছে। মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি নে, তবে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে—মনে হচ্ছে যেন মাঝে মাঝে ভিতর থেকে মাথার পিছন দিকে সজোরে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। মাথার বেদনা এখন শুধু মাথার মধ্যেই আটক নেই, মেরুদণ্ডের স্নায়ুগুচ্ছ বেয়ে সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।···

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ঘন ঘন হর্ন বাজিয়ে গৌরগোপালকে ডাকতে লাগলাম। একটু পরেই সে ফিরে এল, এসেই আবার উচ্ছ্বাস শুরু করল :

—'আপনি গেলেন না দাদা, কিন্তু ওদিকটার দৃশ্য বাস্তবিকই ভারি সুন্দর। গভীর খদ, তার মধ্যে চমৎকার একটা নদী, ওপারে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সার—সে যে কি অপূর্ব শোভা! দেখে দেখে আর আশ মেটে না, চোখ ফেরানো যায় না—'

আমার মুখের দিকে চেয়ে সে হঠাৎ থেমে গেল, উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে দাদা? শরীরটা কি খুব খারাপ মনে হচ্ছে?'

কোন জবাব দিলাম না। হ্যাণ্ড-ব্রেক খুলে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে এঞ্জিনে

স্টার্ট দিলাম, সুইচ টিপে হেড-লাইট জ্বাললাম, তার পর গৌরগোপালকে বললাম, 'যাও, সামনে গিয়ে চাকার নীচের পাথর দুখানা সরিয়ে ফেল। রাত হয়ে এল, আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

হেড-লাইটের উজ্জ্বল আলোয় গৌরগোপালকে একটা মস্তবড় সাদা পতঙ্গের মত দেখাচ্ছে। পতঙ্গটাকে পিষে মারতে হবে।

পাথর দুখানা সরিয়ে ফেলে গৌরগোপাল ঢালুর মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইবার গিয়ার-স্টিকটা ঠেলে দিয়ে অ্যাক্সিলারেটরের উপর পায়ের মৃদু একটু চাপ—ব্যস্‌! তাহলেই জীবনের একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।···এইবার!···ললিতা···

হঠাৎ ঠুন ঠুন করে খঞ্জনী বেজে উঠল—একেবার কানের পাশে। চেয়ে দেখি, গৌরগোপালকে আর দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির হেড-লাইটের ঠিক সামনে আমার চোখের দৃষ্টি আড়াল করে পর্দার মত টাঙানো রয়েছে একখানা নামাবলী, সন্ধ্যার হাওয়ায় ঢেউএর মত দুলে দুলে উঠছে। গেরুয়া রঙের কাপড়ের উপর ঝকঝকে সাদা আলো পড়ে কালো কালো হরপগুলোকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে—হরেকৃষ্ণ হরেরাম! হরেকৃষ্ণ হরেরাম! মনে হচ্ছে যেন নামাবলী থেকে বেরিয়ে এসে সারি সারি কালো পোকার মত আলোর স্রোতে সাঁতার দিয়ে ধীরে ধীরে তারা আমার দুই চোখের দিকে এগিয়ে আসছে।—দুই কানের পাশে সমানে খঞ্জনী বেজে চলেছে।

অসহায় আতঙ্কে অধীর হয়ে তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দিলাম। ডাইনের জানলার দিকে চেয়ে দেখি, সেখানেও নামাবলীর পর্দা ঝুলছে—বাঁয়েও তাই। আমাকে নামাবলীর ফাঁদে ফেলেছে—নামাবলীর কয়েদখানার মধ্যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। পালিয়ে বাঁচবার কোন পথ নেই।···

গৌরগোপাল কই? গৌরগোপাল কোথায় গেল? সে কেন আমাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসছে না?···

কানের কাছে হাজার হাজার খঞ্জনী বাজতে শুরু করেছে, খঞ্জনীর ঝঞ্চনা

ক্রমশ সমুদ্রগর্জনের মত উদ্দাম হয়ে উঠেছে।—যেদিকে চাই, আমাকে ঘিরে শুধু নামাবলীর তরঙ্গ দুলছে, ফুলছে—হরেকৃষ্ণ হরেরাম! হরেকৃষ্ণ হরেরাম!

খঞ্জনীর আওয়াজ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল—আর শোনা যাচ্ছে না।—বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? না, ফ্ল্যাস্ক থেকে জল নিয়ে গৌর-গোপাল আমার মুখের উপর ছিটিয়ে দিচ্ছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল:

—'কি হল দাদা? হঠাৎ অমন হয়ে গেলেন কেন? মাথাটা ঘুরে গেল কি? এখন শরীর কেমন বোধ হচ্ছে? গাড়ি চালাতে পারবেন তো?—না হয় তো গাড়ি এখানেই থাক্‌, চলুন আমরা দুজনে জ্যোৎস্নার আলোয় আস্তে আস্তে হেঁটে বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে যাই। সেখানে লোকজনের দেখা পাওয়া যাবে, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

নাঃ, শরীরে আর গ্লানি নেই, বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে। মাথার যন্ত্রণাটাও ছেড়ে গেছে। গৌরগোপালকে আশ্বস্ত করে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিলাম।

ঢালু বেয়ে নীচে নেমে বাঁদিকে মোড় ঘুরেই আশ্রমের দিকে একবার ফিরে চেয়ে দেখলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ভাঙা গেটের সামনে সেই নামাবলীর পর্দা—বিজয়ীর পতাকার মত পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে।...

ভেবেছিলাম সেদিন রাত্রে বোধ হয় ঘুমুতে পারব। শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরগোপালের নাক ডাকতে শুরু করল, কিন্তু আমার চোখে নিদ্রা নেই। শরীর অপরিসীম ক্লান্তিতে অবসন্ন, মগজের মধ্যে কেমন খালি খালি ঠেকছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন যেন সর্বপ্রকার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। খাটিয়ার উপর সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছি—কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না।

একবার ভাবলাম উঠে কয়েকটা অ্যাস্‌পিরিন খাই, কিন্তু বিছানা ছেড়ে

ওঠা তো দূরের কথা, হাত-পা নাড়তেও ইচ্ছা করল না। যেমন ভাবে পড়ে ছিলাম তেমনিই পড়ে রইলাম।

ডাকবাংলোর ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।—অকস্মাৎ মনে হল বুকের উপর কিসের লঘু স্পর্শ। অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, কে যেন আমার গায়ের উপর একখানা নামাবলী বিছিয়ে দিয়েছে।

আরামে চোখ বুজে এল—পর-মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনিদ্রারোগের মহৌষধ আবিষ্কার করেছি—আর আমাকে জেগে রাত কাটাতে হয় না, অ্যাস্‌পিরিনও খেতে হয় না। কলকাতায় ফিরেই এই নামাবলীখানা কিনে ফেললাম—দিনের বেলা দেরাজ বা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখি, রাত্রে বের করে গায়ে দিয়ে শুই। প্রতিরাত্রেই বেশ সুনিদ্রা হয়।

গল্প শেষ হল। তোপচাঁচি গ্রাম ঘুমিয়ে পড়েছে। হালকা একটা হাওয়া উঠেছে, সামনের গাছগুলোর পত্র-পল্লবের মধ্যে মৃদু মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গাড়ির যাতায়াত বিরল হয়ে এসেছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাধিকা প্রশ্ন করল, 'আর—ললিতা? তার কথা কিছু বললেন না তো?'

—'বহুদিন ওদের কোন খবর রাখি নে। মাঝে গৌরগোপাল কয়েকবার খোঁজ নিতে এসেছিল, আমি দেখা করি নি। হঠাৎ সেদিন রাত্রে স্বপ্নে ললিতাকে আবার দেখলাম—পলিতকেশ লোলচর্ম বৃদ্ধা; নামাবলী গায়ে দিয়ে বসে বসে মালা জপছে।

...হরেকৃষ্ণ হরেরাম! হরেকৃষ্ণ হরেরাম!'

আপাদমস্তক নামাবলী মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।—মিনিট-খানেকের মধ্যেই মৃদু নাকডাকার শব্দ শুনতে পেলাম।

তোপচাঁচি।

জায়গাটা এত কাছে আর এত ছোট্ট যে ভ্রমণকাহিনীর বইএ এর নাম উল্লেখ করাই চলত না।

কিন্তু এতবার এখানে এসেছি, ডাকবাংলোর এই বারান্দায় চেয়ার চেপে বসে বসে এত সময় নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটিয়ে দিয়েছি যে অবসর বা বিশ্রামের কথা ভাবতে গেলেই এই ছোট্ট গ্রামখানির ছবি মনের পটে ভেসে ওঠে।

অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—অম্ল তিক্ত মধুর নানাজাতীয় অভিজ্ঞতা।

এই তো সেদিনের কথা। বড়-র মধ্যে এসেছি তিনজন—বড়দা, আমি ও রমেশ; কিন্তু সঙ্গে আছে তিনটি বালক—বড়দার ছোট ছেলে পতু ও আমার দুটি, শৈল আর বিমু।

নিশ্চয় বাড়ি থেকেই মতলব ফেঁদে এসেছিল, এখানে এসেই তিনজনে মিলে আবদার শুরু করে দিল—পরেশনাথে চড়বে। বাধ্য হয়ে রাজি হতে হল। স্থির হল কাল সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে এবং ঝুলিতে আরও কিছু খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে ওরা রমেশের সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে—নিমিয়াঘাট পর্যন্ত বাসেই যাবে, আবার বাসেই ফিরবে—কারণ আমি বা বড়দা কেউই গাড়ি চালাতে জানি নে, ওরা পাহাড়ে উঠে গেলে গাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারব না।

কিন্তু রাত্রে বারান্দার সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে রমেশের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা জখম হয়ে গেল। সে আঙুল নিয়ে গাড়ি চালানো যায়, কিন্তু পাহাড়ে চড়া যায় না।

সকালবেলা তার পায়ের অবস্থা দেখে ছেলেরা একেবারে মুষড়ে পড়ল। তাদের এত সাধের প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল—ঘাটে এসে তরী ডুবল। ক্ষুব্ধ আক্রোশে আত্মহারা হয়ে পতু রমেশের পিঠে গুম গুম করে কিল মারতে

লাগল আর চেঁচাতে লাগল, 'কেন তুই হোঁচট খেতে গেলি ?'—বিমু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল।

গোলমাল শুনে পাশের ঘর থেকে দত্তগুপ্ত ব্রাদার্স বেরিয়ে এলেন। দুই ভাই ধানবাদে সরকারী চাকরি করেন—দুজনেই উচ্চশিক্ষিত, স্মার্ট, আমুদে মিশুক স্বভাবের মানুষ। একদিনেই আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

ব্যাপার শুনে দুজনেই হেসে আকুল ; একজন বললেন, 'তাতে আর হয়েছে কি ? আমরাও তো যাচ্ছি পরেশনাথে চড়তে—আমাদের সঙ্গেই চলুক না।'

অকূলে কূল পেল যেন ছেলেরা। তাদের উচ্ছ্বসিত আগ্রহের স্রোতে বড়দার অস্ফুট আপত্তি কুটোর মত ভেসে গেল। নতুন ব্যবস্থাতে আমাদের সবাইকেই সম্মতি দিতে হল, নইলে সমূহ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা।—যথাসময়ে বড়দা ও রমেশ গাড়িতে করে পর্বতারোহীদের নিমিয়াঘাটের পাদমূলে নামিয়ে রওনা করে দিয়ে এলেন।

বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা তিনজন গাড়ি নিয়ে আবার নিমিয়াঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম—ওদের নামবার সময় হয়েছে।

নিমিয়াঘাটের যে স্থানটি থেকে পাহাড়ে চড়ার পথ শুরু হয়েছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে তার দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ। এই শাখা পথটুকুর খাড়া চড়াই পার হয়ে গাড়ি এসে থামে ছোট্ট একটু গোল পার্কিং প্লেসের মত জায়গায়। জায়গাটা ভারি নির্জন। দু পাশে ঝোপঝাড়ে ভরা প'ড়ো ডাঙা জমি, মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো চষা ক্ষেত, সামনে পাহাড় ;—পাহাড়ের গায়ের একটা অদৃশ্য নালা বেয়ে জলের ধারা নামছে, তার অস্পষ্ট কুলকুল শব্দ ঘুঘুর ডাকের সঙ্গে মিশে কানে এসে লাগছে—যেন কার করুণ কান্নার মত। দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপর গরু ও ভেড়ার পাল চরছে।

দত্তগুপ্তেরা নেমে এলেন প্রায় আধ ঘণ্টা পরে—সঙ্গে আর কেউ নেই ! বিস্মিত ও ঈষৎ সন্ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি ! একা এলেন যে ? ছেলেরা কোথায় ?'

কনিষ্ঠ দত্তগুপ্ত অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, 'কি জানি। হালকা শরীর তো, ওঠবার সময় তড়বড় করে আগে আগে চলে গেল, তার পর আর কোথাও তাদের দেখা পেলাম না।'

এরা বলে কি! মানুষ কি সত্যিই এতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে? আমরা হাঁ করে তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—কি বলব খুঁজে পেলাম না।

তাঁদের আচরণে কিন্তু লজ্জা বা সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নেই। নির্বিকার ভাবে গাড়ির দরজা খুলে ঠেসাঠেসি করে ভিতরে বসে পড়লেন, তার পর আরামের নিশ্বাস ফেলে একজন বললেন, 'উঃ! গা-গতর একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে! শখ করে মানুষ পাহাড়ে চড়তে আসে কেন বলতে পারেন? আমার তো মশাই এই শেষ। পাহাড়ের খুরে নমস্কার—তেনজিং হবার শখ আমার এই একদিনেই ঘুচে গেছে।'

অপর ভ্রাতাটি দিব্য অমায়িক স্বরে মন্তব্য করলেন, 'আমাদের আবার একটু তাড়াতাড়ি আছে কিনা! আজ সন্ধ্যার বাসেই ধানবাদ ফিরতে হবে।'

অর্থাৎ—ছেলেরা থাকুক পড়ে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে, আমরা ওঁদের গাড়ি করে তোপচাঁচি পৌঁছে দিয়ে আসি!

মাইনে-করা ড্রাইভার রমেশ যেন হঠাৎ ফেটে পড়ল। চীৎকার করে উঠল, 'নামুন আপনারা গাড়ি থেকে। নামুন বলছি! তিনটে বাচ্ছা ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলে এলেন তার ঠিকানা নেই, এখন ওঁদের গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে! একটু চক্ষুলজ্জাও নেই! যান, রাস্তায় গিয়ে বাস ধরুন গে যান, আর বাস যদি না জোটে তো হেঁটে চলে যান!'

দত্তগুপ্ত ব্রাদার্স বিরস মুখে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন।

ততক্ষণে মনের উপর দুশ্চিন্তার ভার জমে উঠেছে, রমেশকে তার অভব্যতার জন্য তিরস্কার করার কথাও কারও মনে পড়ল না।

সময় কাটতে লাগল, দিনের আলো নিভে এল, পাহাড়তলির শেষ রাখাল তার গরু-ভেড়ার পাল নিয়ে ঘরে ফিরে গেল—তখনও ছেলেদের দেখা নেই। অদৃশ্য সেই নালাটাতে জলস্রোত খরতর হয়ে উঠেছে—জলের ঝম ঝম আওয়াজ সেই ভয়ঙ্কর নির্জনতাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। আমরা তিনটি প্রাণী হুড-ফেলা গাড়ির মধ্যে পাথরের পুতুলের মত ঊর্ধ্বমুখে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি।—কি হল! কি হবে!

মনে পড়ছে, কালই সন্ধ্যার পর ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে শেখ বক্সু আমাদের বলছিল, পরেশনাথের জঙ্গলে 'শতৎরঞ্জ-ডোরা' বড় শিয়ালের উপদ্রব খুব বেড়েছে—প্রায়ই গরু-মহিষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কাঠুরেরা আর একা জঙ্গলে ঢুকতে সাহস করে না।

সময় যেন আর কাটতে চায় না! হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ক্রমশ দ্রুততর হয়ে উঠছে—দুশ্চিন্তা থেকে উৎকণ্ঠা, উৎকণ্ঠা থেকে শঙ্কা, শঙ্কা থেকে আতঙ্ক।

অবশেষে ঠিক যখন গোধূলির আবছা আলোর উপর রাতের কালো অন্ধকার নেমে আসছে তখন আমাদের তিন মূর্তিমান ঊর্ধ্বলোক থেকে ধরাতলে এসে অবতীর্ণ হলেন! তিনজনেরই মুখে নিশ্চিন্ত আনন্দের হাসি। দুশ্চিন্তার আকস্মিক অবসানের ফলে এতই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যে খুব খানিকটা কড়া ধরনের বকুনি দেবার কথাও ভুলে গেলাম।

—'হ্যাঁ রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কি করছিলি?'

শুনলাম জলমন্দির থেকে ঘুরে এসে ওরা ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ডাক-বাংলোয় ফিরে জলযোগ সেরে নেয়, তার পর সেইখানেই একখানা খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করতে করতে পতু ও বিমু ঘুমিয়ে পড়ে। শৈল ওদের মধ্যে একটু বড়—সে জেগেই ছিল, কিন্তু করুণাপরবশ হয়ে ওদের ঘুম ভাঙায় নি। তাই এত দেরি হয়ে গেল।

গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হচ্ছি এমন সময় পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে ফেউ ডাকতে শুরু করল। শৈল জিজ্ঞাসা করল, 'ও কিসের ডাক, বাবা?'

—'শেয়ালের ডাক।'

—'কিন্তু শেয়ালের ডাক তো আমি মধুপুরে শুনেছি, সে তো এ রকম নয় ?'

—'এ পাহাড়ী শেয়াল, এর ডাক অন্য রকম।'……

ডাকবাংলোয় এসে যখন পৌঁছুলাম তখন দত্তগুপ্ত-ভ্রাতৃদ্বয় মালপত্র নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা হচ্ছেন। বিদায়-সম্ভাষণ আদান-প্রদানের মত মানসিক অবস্থা ওঁদের বা আমাদের কারও তখন নয়—এমনভাবে পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম যেন আমরা কেউ কাউকে কোনদিন চিনতাম না।

আর একদিনের কথা বলি।

আমি, সমর, রাধিকা ও চিনিবাবু—অনেক রাত্রে ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছেছি। ঘুম ভেঙে উঠতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেল। চা-পর্ব সমাধা করে লেকের দিকে রওনা হলাম।

গাড়ির টিকিট কিনে বাঁ দিকে মোড় ঘুরে বাঁধের পুল পার হয়ে আমরা যখন প্রথম বিশ্রাম-স্থলটির কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন দেখি, আমাদের আগেই সেখানে আর একখানা গাড়ি এসে হাজির হয়েছে। ছোট গাড়ি—মরিস মাইনর ; গাড়িতে কোন লোক নেই, আশেপাশে জনসমাগমের কলরবও কিছু নেই।

ভাল করে এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে নজরে পড়ল গুমটি-ঘরের ওপাশে একেবারে জলের ধারে চুপ করে বসে আছে একটি যুগল মূর্তি। দুজনেরই কাঁচা বয়স—বাহুবেষ্টনীর ঘনিষ্ঠতার মধ্যে অনেক রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা নিহিত আছে বলে মনে হল।

চিনিবাবু চুপি চুপি বললেন, 'চলুন এখান থেকে সরে পড়া যাক—ঐ ওধারে উত্তরদিকে গিয়ে বসি। এদের ভাবগতিক ভাল বলে মনে হচ্ছে না।'

আমরা যেখানে গিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম, অনেকটা দূর হলেও লেকের একাংশের উপর দিয়ে কোনাকুনি তাকালে সেখান থেকেও ওদের দেখা যাচ্ছিল একটা কালো ফুটকির মত। ঠিক তেমনি নিশ্চলভাবে ওরা বসে আছে।

আমাদের কথাবার্তা কিছুতেই ভাল করে জমছে না—কথার ফাঁকে ফাঁকে সমর ও রাধিকার—এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমাদের এই দুই প্রৌঢ়েরও—দৃষ্টি ঘুরে ফিরে কেবল গিয়ে ঐ কৃষ্ণবিন্দুটির উপর নিবদ্ধ হচ্ছে। বেজায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করলাম :

—'মধুচাঁদের চকোর-চকোরী—চেয়ে চেয়ে চোখ ভোঁতা হয়ে গেলেও ওদের নেশার ছিটেফোঁটারও অংশীদার হতে পারব না আমরা।'

কেউ হাসল না।

অবশেষে চিনিবাবু বিরক্ত ভাবে মুখের সিগারেটটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'চলুন ফিরে যাই। হতভাগারা আজকের সকালটাই মাটি করে দিল। যত্তো সব ইয়ে!'

আমরা ডাকবাংলোয় ফিরে আসবার ঘণ্টাখানেক পরে দেখি চকোর-চকোরীর মরিস মাইনরও গুটি গুটি সেখানে এসে উপস্থিত। আমাদের দিকে ওরা ফিরেও চাইলে না—গাড়ি থেকে নেমে ও-কোণের ঘরটার দরজার তালা খুলে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল।—একই পান্থশালার অতিথি ওরা, এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

তার পর সারাদিন আলস্য-বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ওদের ছবি চোখে পড়তে লাগল—জোড় বেঁধে সকলের সংসর্গ এড়িয়ে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। কখনও বাংলোর পিছনের পুরনো কবর দুটোর কাছে গিয়ে সমাধি-লিপি পড়বার চেষ্টা করছে, কখনও ডাঙা থেকে নেমে নীচে ধানক্ষেতের পাশে কুয়োর কাছে গিয়ে গ্রামের মেয়েদের জল-তোলা দেখছে, কখনও বা পথের ধারে একটা গাছতলায় পাশাপাশি বসে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে।

ওদের কাছে আজ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হয়ে ছোট্ট একটা আনন্দবৃত্তে পরিণত হয়েছে—তার কেন্দ্রে শুধু ওরা দুজন, আর কারও ঠাঁই সেখানে নেই। নিজেদের মনের আনন্দ ওরা বাইরে ছড়াচ্ছে না, বরং বাইরের সব আনন্দ যেন

নিজেদের মধ্যে শুষে নিচ্ছে। কাজেই ব্যাপারটা দেখতে বেশ মধুর লাগলেও আমাদের মনের অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুতেই কাটছিল না।

জটিলতার সূত্রপাত হল রাত্রে।

ওরা সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমরা তখনও বাইরে বসে আছি—অন্ধকারে এমনি ভাবে আরও অনেকক্ষণ বসে থাকব, টুকরো-টাকরা কথা বলব, নয়তো চুপ করে বসে বসে গ্রামজীবনের উপর সুষুপ্তির ক্রমাবতরণ প্রত্যক্ষ করব। এও এক ধরনের বিশ্রাম-বিলাস।

হঠাৎ রুদ্ধদ্বার ঘরের ভিতর থেকে চাপা অথচ তীব্র বচসার আওয়াজ শোনা গেল—পুরুষকণ্ঠ, নারীকণ্ঠ, পুরুষ ও নারীর মিলিত কণ্ঠ, ছোট একটু ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ, মুখে হাত-চাপা-দেওয়া মৃদু কান্নার গুঞ্জন—কাচের কি একটা জিনিস ঝন ঝন শব্দে মাটিতে পড়ে ভেঙে যাওয়া—তার পর সব চুপ।

বিস্মিত হলাম, কিন্তু সে বিস্ময়ও অনেকটা নিরুত্তাপ দার্শনিক ধরনের। পথের মোড়ে মোড়ে এমন অনেক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, ও আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

হালকা স্বরে মন্তব্য করলাম, 'দম্পতি-কলহ হলেও ব্যাপারটাকে খুব লঘুক্রিয়া বলে মনে হল না তো!'

পরদিন ভোরে প্রথম আমারই ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে কিন্তু সত্যিই চমকে উঠতে হল।

ঠিক আমাদের দরজার সামনে একখানা চেয়ারের উপর মুখ নীচু করে দুই হাতে মাথা ধরে বসে আছে সেই মেয়েটা, দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে আমার দিকে চাইল।

এই আমি প্রথম ওকে ভাল করে দেখলাম।

ফুটফুটে ফরসা রঙ, লম্বা সিড়িঙ্গে মত চেহারা—তবে শীর্ণ মুখখানার উপর এমন একটা সকরুণ লাবণ্যের ছাপ আছে যে দেখলে সহসা চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কপাল ও দুই গণ্ডের ডৌলটি বড় চমৎকার, নীচের ঠোঁটটা

একটু মোটা, চোখ দুটি বেশ টানা-টানা, কিন্তু একটু লাল আর ফোলা ফোলা ঠেকছে—মনে হয় যেন সারারাত কেঁদেছে।

একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি! আপনি এখানে—এমন সময়? আপনার স্বামী কোথায়?'

আমার মুখের দিকে চেয়েই ছেলেমানুষের মত হু-হু করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। তার পর হাতের রুমালে চোখ মুছতে মুছতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'ও আমাকে ফেলে শেষরাত্রে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা এখানকার চৌকিদারের সব পাওনা চুকিয়ে দিয়েছে, কথা ছিল আজ ভোরবেলা দুজনে রাঁচি রওনা হব। রাত্তিরে ঝগড়া হল, আমি রাগ করে মাটিতে শুয়ে ছিলাম—ভোর বেলা ঘুম ভেঙে দেখি ঘরে আর কেউ নেই, কিছু নেই, আমি একা পড়ে আছি। আমার কাছে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। এখন আমি কি করি, কোথায় যাই—'

কথায় সামান্য একটু পূর্ববঙ্গীয় টান। ছেলেমানুষ—কতই বা আর বয়স হবে, বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। বিষম ভয় পেয়ে গেছে।

আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনি কি ক্ষেপেছেন? আপনাকে একা ফেলে তিনি কোথায় যাবেন? কোন স্বামী কি তার স্ত্রীকে এমন ভাবে ফেলে পালাতে পারে? ঝগড়া হয়েছে—তাই আপনাকে একটু ভয় দেখিয়ে মজা করবার জন্য গাড়ি নিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন। এখুনি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবেন।'

মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার চোখের সামনে তার মুখখানা আস্তে আস্তে মড়ার মুখের মত সাদা হয়ে গেল, তার পর হঠাৎ আবার সিঁদুরের মত টকটকে লাল হয়ে উঠল।

মাথা হেঁট করে অত্যন্ত অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'ও তো আমার স্বামী নয়।'

বিস্ময়ের আতিশয্যে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলাম, 'স্বামী নয়! তবে ও কে? আর আপনিই বা কে?'

—'ও হল ভবানীপুরের মিত্তিরদের বাড়ির ছেলে। আর আমি—'

এমন জোরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল যে মনে হল বুঝি কেটে রক্ত বেরুবে, তার পর বলল, 'আমি যেই হই না কেন—আপনি আমার বাপের বয়সী, দয়া করে আপনাদের গাড়িতে আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। এস্‌প্লানেডে ছেড়ে দেবেন, সেখান থেকে আমি নিজেই বাড়ি যেতে পারব।'

চট করে পিছন ফিরে একবার দেখে নিলাম—না, ওদের কারও এখনও ঘুম ভাঙে নি। ওরা জেগে ওঠবার আগেই যা হয় একটা ফয়সালা করে ফেলতে হবে।

বললাম, 'তা হয় না মা। আমরা অনেক দূরে যাব বলে বেরিয়েছি, এখন কলকাতায় ফেরা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আর তা না হলেও তোমাকে আমাদের গাড়িতে আমরা নিতে পারতাম না—বাধা আছে।'

—'তবে আমার কি হবে?'—হতাশায় ভেঙে পড়ে মেয়েটা হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

স্বৈরিণী! হ্যাঁ, স্বৈরিণী ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে? তবু কেমন একটা সমবেদনার ব্যথা বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি মনিব্যাগ থেকে পঁচিশটি টাকা ও একখানা ঠিকানা-লেখা কার্ড নিয়ে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'কেঁদো না, চুপ কর—এই টাকা কটা ধর, তার পর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাক। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে যাব, তার পর বেরিয়ে একটা বাস ধরে গোমো কি পরেশনাথ স্টেশনে চলে যেও—সেখান থেকে কলকাতার ট্রেন পাবে। আর বাড়ি ফিরে মনে করে ঐ ঠিকানায় টাকাটা আমাকে পাঠিয়ে দিও।'......

দিন পাঁচেক পরে আবার আমরা ফিরে এলাম। সাথীদের অনুপস্থিতিতে চৌকিদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁ রে, আমরা সেদিন চলে যাবার পর সেই দিদিমণি কি করল রে? গোমো গেল না পরেশনাথ গেল?'

—'কোথাও গেল না বাবু, চুপ করে ঐ বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে রইল—খেল না দেল না, কিছু না। বেলা বারোটার সময় আর একটা ছোকরা মত সায়েবী পোশাক-পরা বাবু কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল। আগে থেকেই ওদের আলাপ ছিল কিনা জানি নে, কিন্তু বিকেলবেলা দেখি দুজনে বেশ ভাব হয়ে গেছে, হাসছে খেলছে, একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরদিন সকালবেলা ওরা একসঙ্গেই রওনা হয়ে গেল, শুনলাম দিল্লী না কোথায় যেন যাবে।'

রাত্রে কে কোথায় শুয়েছিল সে কথা জিজ্ঞাসা করতে আর ভরসা হল না।

সে পঁচিশটা টাকা কিন্তু এখনও আমি ফেরৎ পাই নি।

আর একবার।

মালপত্র-বোঝাই গাড়ি নিয়ে বিশুয়ার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চিনিবাবু হাঁক ছাড়লেন, 'কই বাবা বিশ্বনাথ, চটপট এক গেলাস করে গরম চা খাইয়ে দাও তো বাবা, শীতে হাত-পা একেবারে কালিয়ে গেছে! এখনও কতটা পথ যেতে হবে তা কে জানে।'

বিশুয়া গাড়ি দেখেই চিনতে পেরেছিল, এক লাফে দোকান ছেড়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে বড়দাকে প্রশ্ন করল, 'এ কি বড়বাবু, এমন অসময়ে আপনারা কোথায় চলেছেন? তোপচাঁচিতে একদিন থাকবেন না?'

বড়দা উত্তর দিলেন, 'থাকবারই তো ইচ্ছে ছিল কিন্তু ডাকবাংলোয় জায়গা পেলাম কই? তিনটে ঘরেই লোক রয়েছে। এখানে এসে এমন মুশকিলে আর কখনও পড়ি নি। সন্ধ্যা উতরে গেছে, সামনে হাড়ভাঙা শীতের রাত। ডুমরিতে যদি ঠাঁই পাই তো রক্ষে, নইলে সেই বগোদর পর্যন্ত ঠেলতে হবে।'

ব্যাকুল কণ্ঠে বিশুয়া বলে উঠল, 'তা কখনও হতে পারে না। আপনারা তোপচাঁচিতে এসে থাকবার জায়গা না পেয়ে চলে যাবেন—তা কি কখনও হয়। সমস্ত গ্রামের মুখে চুনকালি পড়বে না!—আপনারা বসুন, আরাম করে চা খান, আমি এখুনি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

দোকানের চাকরকে ভাল করে চা বানাবার হুকুম দিয়ে সে প্রায় ছুটতে ছুটতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল—ফিরে এল বোসবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। বোসবাবু তখনও বেঁচে আছেন।

বোসবাবু এসে মহা-অপরাধীর মত সামনে দাঁড়ালেন, দশবার গলা খাঁকারি দিয়ে মাথা চুলকে মুখ কাঁচুমাচু করে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই : তাঁর কুঁড়ে ঘরে আমরা রাত্রিবাস করব এ তাঁর পরম ভাগ্য, কিন্তু আজ দু দিন হল নওয়াগড় থেকে তাঁর দুই ভাই সস্ত্রীক এসে তাঁর ওখানে উঠেছে—সঙ্গে তাদের তেরটা এঁড়ি গেঁড়ি আণ্ডা বাচ্চা, ঘরে তাঁর পা ফেলবার জায়গা নেই।—লজ্জায় দুঃখে ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি!

আমরা তো অবাক! প্রাণপণে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—আমরা তাঁর বাড়িতে অতিথি হতে আসি নি, ডাকবাংলোয় স্থান না পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন দোষ বা দায়িত্ব নেই, তাঁর ভাইরাও তাঁর বাড়িতে এসে এমন কোন গুরুতর অন্যায় করে নি—পথে প্রতি দশ মাইল অন্তর ডাকবাংলো আছে, রাত্রে মাথা গোঁজবার একটা স্থান আমরা ঠিক পেয়ে যাব।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বোসবাবু তখন বিশুয়ার সঙ্গে গভীর গোপন পরামর্শে মগ্ন। তার পর বিশুয়া এসে আমাদের চা পরিবেশনের কাজে লাগল, বোসবাবু কোথায় চলে গেলেন।

বিশ পঁচিশ মিনিট বাদে তিনি ফিরলেন—ব্যর্থমনস্কাম হয়ে। গিয়েছিলেন মৌলবী সাহেবের কাছে। স্থানীয় ইস্কুলের এখন ছুটি চলছে, ইস্কুল-বাড়ির চাবি থাকে মৌলবী সাহেবের কাছে—চাবিটা পাওয়া গেলে আমাদের থাকবার একটা সুবন্দোবস্ত হতে পারে, সেই সন্ধানেই গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্দৈব কখনও একা আসে না—মৌলবী সাহেবও আজ অনুপস্থিত, গোমোর ওধারে চৌরাপট্টি না কোন্ গ্রামে তাঁর মেয়ের বাড়ি, সেইখানে গেছেন, ফিরতে দু দিন দেরি হবে।

অতঃপর বিশুয়ার সঙ্গে তাঁর আরও খানিকটা গোপন পরামর্শ হল, তার পর বিশুয়া আমাদের কাছে ফিরে এল—হাসতে হাসতে।

বলল, 'সব ঠিক হয়ে গেছে—কোন চিন্তা করবেন না, একটু বসুন, আমি বন্দোবস্ত পাকা করে এখুনি আবার আসছি।'

ছোট্ট একটি খোলার বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি থামল। সদর দরজা খোলাই ছিল, ভিতরের উঠনে পা দিয়ে দেখলাম আধ-ঘোমটা দেওয়া একটি কিশোরী বধূ হাতে লণ্ঠন নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। হাতের উঁচু করে ধরা লণ্ঠনের আলো তার মুখের উপর পড়েছে—নজরে পড়ল দিব্যি ঢলঢলে একখানা শ্যামবর্ণ হাসিখুশি মুখ, দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা কাঁচপোকার টিপ, তার উপর ছোট্ট একটি সিঁদুরের ফোঁটা। গোলগাল গড়ন। ফরসা একখানা ডুরে শাড়ি বাঙালী ঢঙে ফেরতা দিয়ে পরা।

—'এ কোথায় নিয়ে এলি রে, বিশুয়া? আর এ মেয়েটিই বা কে?'

কাঁধে বিছানা আর হাতে স্যুটকেস নিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বিশুয়া জবাব দিল, 'আমারই বাড়ি বাবু—আর ওটা আমার বৌ। বছর দেড়েক হল বিয়ে করেছি যে!'

ঘরের ভিতর তিনখানা খাটিয়া পাশাপাশি পাতা হয়েছে, জানালার উপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। দেখতে দেখতে গাড়ির জিনিসপত্র সব ভিতরে চলে এল, খাটিয়ার উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা হয়ে গেল—আমরা আরাম করে বসে পড়লাম।

বারান্দায় স্বামী-স্ত্রীতে কিছুক্ষণ কি সব আলোচনা চলল চাপা স্বরে—তার পর বিশুয়া লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে গেল। তার বৌ ঘরে ঢুকে পায়ের ধুলো নিয়ে একে একে আমাদের প্রণাম করল, তার পর ঘরের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে চৌকাঠের কাছে দরজার কপাট চেপে বসে পড়ল। চমৎকার সপ্রতিভ মেয়ে, লজ্জা-সঙ্কোচের কোন বাড়াবাড়ি নেই, অথচ সব মিলিয়ে বেশ মিষ্টি লাজুক ভাবভঙ্গি।—বাঃ! বেশ বৌ হয়েছে বিশুয়ার।

নরম গলায় কথা বলল, 'ও আবার গেল দোকানে আপনাদের জন্যে চা আনতে,—ঐ সঙ্গে যা হয় দুটো তরিতরকারিও নিয়ে আসবে। ফিরে এলেই

আটায় জল দেব। উনুনে আগুন দেওয়াই আছে—বেশি দেরি হবে না আপনাদের।'

এ অঞ্চলটা দ্বিভাষী—বাংলা হিন্দী দুটো ভাষাই এখানে সমান চলে, স্থানীয় লোকেরা দুই ভাষাতেই কথা বলতে পারে। কিন্তু সে হল মানভূমী বাংলা—আমাদের মুখের ভাষার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এ মেয়েটা কথা বলছে খাস কলকাতার বাংলায়!

বললাম, 'আচ্ছা খাওয়া-দাওয়ার কথা এখন থাক—সে যখন হয় হবে'খন। কিন্তু তুমি এমন বাংলা বলতে শিখলে কোথায়? বিশুয়া কি বাঙালীর মেয়ে বিয়ে করে এনেছে নাকি?'

চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল: 'এনেছেই তো! আমার বাপের বাড়ি কলকাতায়। মনোহরপুকুরে আমার বাবার কাঠ-কয়লার দোকান আছে—ত্রিশ বছরের পুরনো দোকান। আমার মামার বাড়ি বৌবাজার। তোপচাঁচিতে বিয়ে হয়েছে বলেই কি আমি হিন্দুস্থানী হয়ে গেছি না কি?'

একটু থেমে আবার বললে, 'আপনারা হলেন আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক—এমন হুট করে এসে পড়লেন যে মনের আশ মিটিয়ে একটু সেবাযত্ন করব তারও সময়ও পেলাম না।'

চা এল, তার সঙ্গে এল মুচমুচে নিমকি বিস্কুট।...তার পর বড়দার চোখের ইঙ্গিত পেয়ে তিনজনেই বেরিয়ে পড়লাম—'একটু ঘুরে আসি' বলে। বাজার থেকে ষোল টাকা দিয়ে একখানা ছাপা-শাড়ি কিনে মোড়ক করে নিয়ে এলাম। এই অপ্রত্যাশিত আতিথ্যের কিছু প্রতিদান তো দিতেই হবে।

রাত্রের আহারটিও বেশ পরিপাটি হল—গরম গরম রুটি, আলু-পেঁয়াজের তরকারি, ডিমের ঝোল, আর টম্যাটোর চাটনি। রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম। লজ্জায় আনন্দে বিশুয়ার বৌএর চোখ জলে ভরে উঠল। সে নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছে, তার বাপের বাড়ির দেশের লোক—বড়লোক আত্মীয়েরা খেয়ে খুশি হয়েছে; সে যেন একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেছে।

বাইরে গেলে বরাবরই আমার একটু বেশি ভোরে ঘুম ভাঙে এবং তার ফলে অনেক সময় এমন নানা দৃশ্য চোখে পড়েছে যা হয়তো আমার দেখা উচিত হয় নি, যা হয়তো না দেখলেই আমার পক্ষে ভাল হত। কিন্তু সেদিন সেই খোলার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রথম উষার অস্পষ্ট আলোয় যে দৃশ্য আমি দেখেছিলাম তা না দেখলে, তার তাৎপর্য না বুঝলে আমার জীবনের গভীরতম মধুরতম অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত হতাম। সে দৃশ্যের স্মৃতি এখনও আমার মনের মণি-কোঠায় অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে রয়েছে—যতবার মনে পড়ে ততবারই দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, হৃদয় অপরূপ মাধুর্যের রসে পরিপ্লুত হয়ে যায়।

বারান্দার একপাশে একখানা খাটিয়া, তার উপর পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বিশুয়া আর তার বৌ ঘুমুচ্ছে—গায়ের উপর পর পর দুখানা কাঁথা, তার উপর একখানা ছেঁড়া শতরঞ্জি। ওড়গোড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছে—শুধু বৌটির মুখের উপর থেকে আবরণ আংশিকভাবে সরে গেছে। সে মুখে এখনও সেই মিষ্টি লাজুক হাসিটুকু লেগে আছে, যেমন কাল রাত্রে দেখেছিলাম।

ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। বিশুয়ার বাড়িতে ঐ একখানি মাত্র ঘর—রান্না-বান্না পর্যন্ত বারান্দায় করতে হয়। সেই একখানি ঘর আমাদের ছেড়ে দিয়ে পাহাড়তলির এই দুর্দান্ত শীতের রাত ওরা ছেঁড়াকাঁথা মুড়ি দিয়ে বারান্দায় শুয়ে কাটিয়েছে!

কিন্তু কেন? সারা জীবনে বিশুয়ার দোকানে হয়তো পাঁচ-সাত টাকার চা খেয়েছি। পথের পথিক আমরা—চলতি পথের মাঝখানে মাঝে মাঝে পান্থশালায় বিশ্রাম করি, বড়জোর বাপু-বাছা করে দুটো মিষ্টি কথা বলি। তার বদলে—!

কাল রাত তখনও নটা হয় নি—আমরা পথে বেরিয়েছিলাম কাপড় কেনবার জন্যে, তখনই মনে হচ্ছিল যেন শত শত হিমেল ছুঁচ গায়ে বিঁধে হাড় পর্যন্ত অবশ করে তুলছে। তাহলে এই খোলা বারান্দায় সারারাত ওদের কেমন কেটেছে?

ছেঁড়াকাঁথায় আর কতটুকু উত্তাপ যোগাতে পারে ? তবে কি ভালবাসার বাহুবন্ধন থেকেই ওরা উত্তাপ সংগ্রহ করেছে ? না আরও গভীর, আরও বড় কোন প্রেমের উত্তাপ ওদের হিমের হাত থেকে রক্ষা করেছে ?

আমাদের ষোল টাকার শাড়ি তখন প্যাকেটের মধ্যেই বোধ হয় লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে।……

মানুষ বড় ভাল, মানুষ বড় মহান—মানুষকে প্রণাম জানাই !

কিন্তু বসে বসে তোপচাঁচি-পুরাণ বর্ণনা করলে তো চলবে না। আবার পথে বেরুবার সময় হল। গাড়ি তৈরি। এখুনি বড়দা এসে তাগাদা দেবেন :

—'চল যাই !'

আবার চলা শুরু হবে।

সাত

ডালটনগঞ্জের বলরাম পণ্ডিতের নামটা মনে রাখবেন। যদি কোনদিন ঐ জঙ্গুলে শহরটায় গিয়ে আশ্রয়ের অভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েন, বলরাম পণ্ডিতের আস্তানা খুঁজে বের করবেন—আশ্রয় পাবেন, আতিথেয়তা পাবেন, ইচ্ছামত সুখাদ্য খেতে পাবেন ; আর আপনার যদি বোতল-বিলাসের অভ্যাস থাকে পণ্ডিতকে ইশারায় একটু জানিয়ে দেবেন, দুপুর রাতেও সে আপনাকে খাঁটি জিনিস যোগাড় করে দেবে —একথা তার নিজের মুখেই আমি শুনেছি।

বাজারের একটেরে নদীর কাছ ঘেঁষে বলরাম পণ্ডিতের দোতলা মাট-কোঠা—শহরের প্রায় সবাই তাকে চেনে, সন্ধান পেতে বেশি ঘুরতে হবে না। মাটকোঠা বলে নাক সিঁটকোবেন না—উপরের ঘর দুখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম করে সাজানো—খাটিয়া ছাড়া একখানা করে বড় টেবিল ও একটা করে কাচ-বসানো দেয়াল-আলমারিও আছে। বিজলী-বাতি আছে ; যদি গরমের সময় গিয়ে পড়েন একখানা টেবিল-ফ্যানও পাবেন। আর কি চাই ?

সে বার ওখানে আমরা ডাকবাংলোয় জায়গা পেয়েও থাকি নি। তার কারণ ছোট্ট একটা কলহ।

গাড়ি থামিয়ে দেখতে পেলাম ডাকবাংলোর বারান্দায় দুটি সাহেবী-পোশাক-পরা বাঙালী ভদ্রলোক দুখানি ইজি-চেয়ারে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে বসে আছেন। পাশে দুজন মহিলা—তাঁদের মেক-আপের চাকচিক্যে আর জমকালো শাড়ি-ব্লাউসের জৌলুসে চারদিক যেন আলো হয়ে উঠেছে।

ঝকঝকে সিত্রোয়াঁ গাড়ি দেখে প্রথমটা একটু সচকিত হয়েছিলেন সকলে, কিন্তু আমাদের লুঙ্গি-পরা গেঞ্জি-গায়ে মূর্তি দেখে আবার উদাসীন হয়ে উঠলেন। আমি ও হিতেনবাবু বারান্দার কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমরা কিছু বলবার আগেই একটি ভদ্রলোক মুখের পাইপ দাঁতে চেপে উদ্ধতভাবে বলে উঠলেন, 'এখানে আপনাদের থাকবার সুবিধে হবে না। আমরা গভর্নমেন্ট সারভেন্ট—ফ্যামিলি নিয়ে আছি, এর মধ্যে কতকগুলো অচেনা পুরুষমানুষকে আমরা জায়গা দিতে পারব না। আপনারা অন্য কোথাও যান।'

আমি একটু উত্তপ্তভাবে কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, হিতেনবাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে অত্যন্ত শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, 'আমরা ইচ্ছে করলে অনায়াসেই জোর করে এখানে থাকতে পারতাম, কিন্তু আমরা থাকব না—কারণ আপনাকে আমি চিনি। আপনি গভর্মেন্ট সারভেন্ট নন, আপনি হাটখোলার অমুক কাঠগোলার মালিক অমুক মুখুজ্জের ছেলে অমুক। জুয়াচুরির দায়ে একবার তিনমাস জেল খেটেছিলেন। আপনার কেস নেবার জন্য আমাকে অনেক খোশামোদ করেছিলেন, আমি নিই নি। আর আপনার যে এখনও বিয়ে হয় নি সে খবরও আমার জানা আছে। কাজেই আপনার ফ্যামিলির পরিচয়টাও আমি আন্দাজ করে নিতে পারছি। আমরা এখানে থাকলে আমাদের সুবিধে-অসুবিধে কি হবে তা জানি নে, তবে আপনাদের খুবই অসুবিধে হবার সম্ভাবনা।—গাড়ি ঘোরাও, চিনি!'

বলরাম পণ্ডিতের হদিশ ডাকবাংলোর চৌকিদারই আমাদের দিয়েছিল।

পণ্ডিতের কথাবার্তা শুনে মনে হল, এই শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকটির মনের গায়ে কেমন করে যেন একটু দার্শনিকতার ছোপ লেগেছে। মতামতের মধ্যেও বেশ মৌলিকতার আভাস আছে।

আমরা কলকাতার লোক শুনে বলল, 'শুনেছি নাকি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় রেলগাড়ি চলে, সেখানে নাকি বিশ পঁচিশ তলা সব কোঠাবাড়ি তৈরি হয়েছে। একবার দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাবুজি, সেখানে নাকি বড় লোকজন গাড়িঘোড়ার ভিড়—পথে নামলেই ভিড় ঠেলে চলতে হয়, দিনে রাতে কখনও নাকি হট্টগোল থামে না। সত্যি, বাবুজি ?'

স্বীকার করতেই হল যে কথাটা সত্যি।

—'ভাল না। সাধু-সন্তদের কথা ছেড়ে দেন বাবুজি, কিন্তু আমাদের মত মানুষ যদি মানুষের সঙ্গ ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করে সেও যেমন ভাল না, তেমনি দিনরাত সারাজীবন ভিড়ের মধ্যে বাস করাও ভাল না। আমার এই বাড়িটা দেখুন—বাবা এটা তৈরি করিয়েছিলেন—এর এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডান দিকে তাকালে দেখতে পাবেন বাজার, কত মানুষ আসছে-যাচ্ছে, কেনা-বেচা করছে, জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে, ঝগড়া করছে। আবার যদি বাঁ দিকে তাকান দেখতে পাবেন ঠাণ্ডা নদী আর তার ওপারে ঢেউ-খেলানো ঠাণ্ডা জঙ্গল—একেবারে ঐ আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পরমাত্মার হাতে তৈরি জিনিস—যখন একা একা তাকিয়ে থাকি, বাবুজি, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।—এই ভাল। আমার মানুষও আছে বনও আছে, কোনটাই ছাড়তে হয় নি।'

দুই একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলাম।

—'না বাবুজি, বিয়ে করি নি। কারও চাকর হতে মন চায় না, ব্যাবসার কাজেও কোন রস পাই নে। সংসার চালাব কি করে? পড়শীদের দশ-বিশটে ছেলেকে অ আ ক খ পড়াই, যোগ বিয়োগ শেখাই—দু-দশ টাকা পাই। আর মাঝে মাঝে আপনাদের মত দু-চার জন বিদেশী অতিথি আসেন, তাঁদের সেবাযত্ন করি—তাতেও কিছু হয়। একটা পেট, এতেই চলে যায়।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'কলকাতার কথা কি বলছিলাম বাবুজি, আমি কখনও রাঁচি শহরেও যাই নি! এই বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছে, এই বাড়িতেই সারা জনম কাটবে। তা—আমার এই ভাল।'

বলরাম পণ্ডিতের কাছে বিদায় নিয়ে যখন রওনা হলাম তখনও সকাল সাতটা বাজে নি। এসেছি আওরঙ্গাবাদ হয়ে, কাজেই ফেরবার পথে রাঁচি ঘুরে যাব—এই আমাদের সিডিউল।

রাঁচি-ডালটনগঞ্জের পথে হয়তো বাসে চড়ে অনেকেই যাতায়াত করেছেন —তাঁদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন একবার ছোট গাড়ি করে ইচ্ছামত থামতে থামতে এই পথে যান। এ পথের সৌন্দর্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর নির্জনতা। দ্রুত চলতে চলতে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়, চারিদিক চেয়ে দেখতে হয়, চলমান পথের ধারে পাহাড়-জঙ্গলের আদিম নিশ্চলতার স্বরূপটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হয়।

নৈঃশব্দ্য একটা নেতিবাচক ধারণা মাত্র নয়, নৈঃশব্দ্য একটা সদর্থক বস্তু—এই পথে যে নৈঃশব্দ্যের সন্ধান আপনি পাবেন, মনে হবে যেন আইসক্রীমের মত তাকে চামচ দিয়ে কেটে খাওয়া যায়, এমনই স্নিগ্ধশীতল এমনই সর্বসন্তাপ-হারী সেই অপরূপ নৈঃশব্দ্য!

বাসের যাত্রী জনতার জীবনকে সঙ্গে নিয়ে চলে—লোকালয় ছাড়া আর কোথাও বাস থামে না। জনতা যত ছোট হ'ক সে জনতাই—নির্জনতার রসোপভোগে ব্যাঘাত সে জন্মাবেই, তার কোলাহল নৈঃশব্দ্য-নটিনীর নূপুর-ধ্বনিকে আপনার কানে কিছুতেই পৌছুতে দেবে না।

ডালটনগঞ্জ থেকে লাতেহার চল্লিশ মাইল পথ, অরণ্যসঙ্কুল হলেও প্রায়-সমতল। লাতেহার শহর থেকে বেরিয়ে এসেই নজরে পড়ল সামনে তরঙ্গায়িত শ্যামল গিরিশ্রেণী—ওরই ভিতর দিয়ে আমাদের পথ চলে গেছে, এঁকেবেঁকে, উঠে নেমে, মোড়ের পর মোড় ঘুরে, প্যাঁচের পর প্যাঁচ দিয়ে। সে পথের

গোলকধাঁধার কথা ভাবতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়—লোকে বলে জিলিপির ঘাট,—আবার সে পথের মোহিনী মায়ার কথা মনে পড়লে স্মৃতির পাত্র আনন্দের রসে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওকি! আকাশে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এল কেন? পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় অন্ধকার জমে উঠেছে—মেঘ করেছে, এখুনি বোধ হয় বৃষ্টি নামবে।—তাহলেই তো সব মাটি হয়ে যাবে! ঠিক জায়গাটিতে এসেই বাগড়া পড়ল!

নেংটি-পরা একজন আদিবাসী বৃদ্ধ আসছে পথ ধরে—কাঁধে লাঙল, সামনে একজোড়া বলদ। তার পাশে এসে গাড়ি থামিয়ে বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৃষ্টি আসতে আর কত দেরি ভাই? তার আগে কি আমরা পাহাড় পার হয়ে যেতে পারব?'

কালো কোঁচকানো মুখের উপর একগাল সাদা হাসি ঝকঝক করে উঠল: 'বিষ্টি কুথা রে বাবু? উ তো কুহাঁস নাম্যেছে! যা যা! আগু বেড়ে যা, বনে পাহাড়ে কুহাঁস দেখবি—অনেক মজা পাবি।'

বুড়ো সত্য কথাই বলেছিল। সেদিন আমরা সত্যই একটা নতুন অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেয়েছিলাম। বনে পাহাড়ে নেহাৎ কম ঘুরি নি। অরণ্যচারী বিভূতিভূষণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নোয়ামুণ্ডি বড়-জামদা গুয়া থেকে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে সারান্দার জঙ্গলের মধ্যে বার বার অভিযান করেছি—বড়বিলা চিড়িয়া ছোটনাগরা কুমডি থলকোবাদ সব জায়গাতেই এক একবার ঢুঁ মেরে এসেছি। ডুয়ার্সের প্রাণ-চমকানো অরণ্য-সমুদ্রের মধ্যে একখানা খোঁড়া জীপ-গাড়ি মাত্র ভরসা করে ডুব দিয়েছি—দূর থেকে উঁকি মেরে বুনো হাতি ও গণ্ডারের লীলাক্ষেত্র দেখে এসেছি।—কিন্তু সেদিন লাতেহার গিরিশ্রেণীর মধ্যে যা পেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি আর কোথাও পাই নি।

পার্বত্য অরণ্যের নির্জনতা ঘিরে পুরু যবনিকার মত কুয়াশার নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে—হাওয়া নেই, পাখির ডাক নেই, একটা ঝিঁঝিঁর আওয়াজ

পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দু-একটা টুপ টাপ শব্দ—কুয়াশা-গলা জলের ফোঁটা এক পাতা থেকে আর এক পাতায় ঝরে পড়ছে। দুপাশের শাল-বনের ফাঁকে ফাঁকে যেন হালকা পেঁজা-তুলোর রাশি জমে আছে, তার মধ্য দিয়ে দূরের কোন গিরিখাতে প্রবহমাণ জলধারার ক্ষীণ মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে—কম্বলচাপা-পড়া শিশুর দুর্বল কান্নার মত। কেবলই মনে হচ্ছে, আমরা যেন ছোট্ট একটা পাখি, কোন নিরুদ্ধশ্বাস মহাযোগীর শিশিরসিক্ত বিপুল জটা-জালের জটিলতার মধ্যে ঢুকে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

চড়াই উৎরাই পাকদণ্ডির পথ কুয়াশায় পিছল হয়ে গেছে—অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে।

সহসা নিঝুমপুরীর রাজকন্যার গায়ে কে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল। দুমিনিটের মধ্যে কুয়াশার পর্দা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে হঠাৎ-জাগা হাওয়ার মুখে ঘুরপাক খেয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সূর্যের আলোয় সমস্ত বনভূমি ঝকমক করে হেসে উঠল। ভিজে পাতার উপর রোদের তীর বাঁকা হয়ে এসে পড়ল—অবরোধমুক্ত শ্যামলিমার উপর মরকতমণির সমুজ্জ্বল দীপ্তি ঝল্‌সে উঠল। পত্রান্তরালের নেপথ্য থেকে একটা মাত্র অচেনা পাখি হঠাৎ নরম মিষ্টি গলায় ডাকতে শুরু করে দিল—কুট্‌র্‌র্‌—কুট্‌র্‌র্‌—

পনের মাইল পথ আসতে আমরা প্রায় দু ঘণ্টা সময় ব্যয় করে ফেললাম—বিশ মিনিট চলি আর একবার করে থামি; একবার থামলে আর সেখান থেকে চলে আসতে ইচ্ছা করে না।

এ অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বাঘের উপদ্রব—খাঁটি বঙ্গীয় রাজকীয় সংস্করণের বাঘ। থাবার একটি আঘাতে মহিষের মাথা গুঁড়ো করে দেয়, বড় বড় শম্বর হরিণ মেরে মুখে করে ঝুলিয়ে অনায়াসে আট দশ মাইল পথ দৌড়ে চলে যায়। কি একটা বই-এ পড়েছিলাম, শিকারীদের বহু উপদ্রব সত্ত্বেও এই জঙ্গলের প্রতি আটচল্লিশ বর্গমাইলের মধ্যে এখনও অন্ততঃপক্ষে একটা করে বাঘ আছে। কিন্তু পথের ধারে বাঘ চলাফেরা করে না, বাস-ট্রাকের ঘর্ঘর শব্দে ও পোড়া পেট্রোলের গন্ধে ভয় পেয়ে বনের গভীরতর প্রদেশে গিয়ে গা-ঢাকা

দিয়ে থাকে। সুতরাং চিনিবাবু পর্যন্ত মাঝে মাঝে গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে ফিরে নিসর্গশোভা নিরীক্ষণ করছিলেন।...

বন-পাহাড়ের রাজ্য ফুরিয়ে এল, প্যাঁচওয়ালা পথ সরল হয়ে সোজা ঢালু বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল। তার পর পটপরিবর্তন হয়ে গেল—চোখের সামনে থেকে সব আড়াল ঘুচে গেল ; চওড়া নদীর উপর লম্বা ব্রিজ—তার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তর দিগন্তরেখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে রোদ পোহাচ্ছে।

আবার থামতে হল। ব্রিজের গায়ে নাম লেখা রয়েছে—'দোমোহান'। দুদিক থেকে দুটি নদী এসে এক সঙ্গে মিশেছে—সেই সঙ্গমস্থলের উপর দিয়েই ব্রিজ চলে গেছে, তাই এই নাম। নদীর খাতে পিঙ্গলবর্ণ বালুকা-বিস্তার, তার মাঝখানে জলস্রোতের রুপালি চমক ; এক পারে বনভূমির প্রগাঢ় নীলিমা, আর এক পারে পাঁশুটে মাঠের মাঝে মাঝে ক্ষীণজীবী তৃণভূমির মরা সবুজ—মাঝখানে ব্রিজের নতুন-রঙ-করা দুই রেলিঙের সমান্তরাল সংযোগ-রেখা।—বর্ণ-বৈপরীত্যের অপূর্ব সমাবেশ!

দূরে বালির উপর কাঁধে জাল নিয়ে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে—অনেক হাঁকডাকের পর কাছে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ নদী দুটোর নাম কি ভাই?'

—'ওটার নাম লালী, আর এটা করমাহি।'

—'দেখি কি মাছ পেলে!'

খালুইএর মধ্যে ডজনখানেক সাদা চকচকে আঁশওয়ালা মাছ, অনেকটা আমাদের দেশের বাটা মাছের মত দেখতে, তবে মুখের চেহারাটা অন্য ধরনের।

—'মাছ কটার দাম কত হবে?'

—'মাছ বেচি না, খাই।'

বোঝা গেল, এ অঞ্চলের এই সব বুনো লোকগুলো নিতান্তই অনগ্রসর—এরা এখনও পয়সার চেয়ে খাদ্যদ্রব্যকে বেশি মূল্যবান মনে করে। বস্তু ফেলে দিয়ে বস্তু-বিনিময়ের মাধ্যমকে নিয়ে মাতামাতি করবার সভ্যতা এরা এখনও ঠিক আয়ত্ত করে উঠতে পারে নি।

বড়দা প্রশ্ন করলেন, 'এ জঙ্গলে কি জানোয়ার পাওয়া যায়? শিকারের জানোয়ার?'

লোকটা নীরবে আঙুল তুলে আমাদের পিছন দিকে কি একটা দেখিয়ে দিল। বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল, তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে দেখলাম—না, কোন জানোয়ার নয়, একটা বড় গাছ, তার কাঁধের কাছে তে-ফরকা ডালের মধ্যে বেশ বড় করে একটা মাচান বাঁধা রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই কোন শিকারীর দল ওখানে বসে রাত কাটিয়ে গেছে।

দ্রুত প্রশ্নোত্তরের আদান-প্রদান চলতে লাগল।

এ জঙ্গলে বহু জানোয়ার আছে—নদীতে জল খেতে তারা সবাই আসে। সন্ধ্যার অন্ধকার ভাল করে ঘনিয়ে আসবার আগেই দল বেঁধে চিথল হরিণ আসে তাদের চিত্রবিচিত্র দেহ ও সরু সরু ডালপালাওয়ালা শিঙ নিয়ে। তার পর প্রথম রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসে কর্কশকণ্ঠ কোটরার পাল। রাত্রি এক প্রহর পার হবার পর নিঃশব্দসঞ্চারী বাঘ ও চিতা আসতে শুরু করে—প্রত্যেকে একক, নিঃসঙ্গ।' তার পর রাত্রি গভীর হলে আসে জোড়ায় জোড়ায় শম্বর ও ছোট ছোট দল বেঁধে উদ্যতশৃঙ্গ রক্তচক্ষু বিপুলকায় বনকাড়া বা ভারতীয় বাইসন। ভালুক কাউকে ভয় করে না, তার আসবারও কোন বাঁধা সময় নেই—দিনে রাতে যখন খুশি আসে, জল খেয়ে চলে যায়।—শিকারের এ অতি প্রশস্ত স্থান।

হিতেনবাবুর মনের গভীরতম গহনে একটা আদিম রক্তপিপাসু হিংস্রতা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠল। উৎসাহিত হয়ে তিনি আরও প্রশ্ন করতে যাবেন এমন সময় চিনিবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে বাধা দিলেন:

—'কেমন একটা বোট্‌কা বোটকা গন্ধ আসছে না ওদিক থেকে?'

রাঁচি-লোহারডগার উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। সুমসৃণ সমতল পথ। চিনিবাবু গাড়ির স্পীড খুব বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভারী

গাড়ি—ষাট মাইলে চললেও কোন অস্বস্তি বোধ হয় না। পথের ধারে গাছের সারি, হু-হু করে এগিয়ে আসছে, কি গাছ চিনতে পারার আগেই সাঁ করে পিছনে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

গতিবেগের নিজস্ব একটা নেশা আছে—খুব আমেজী নেশা। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে, চোখের সামনে দিয়ে চঞ্চলতার স্রোত বয়ে চলেছে, স্থাবর জঙ্গম একাকার হয়ে গেছে। পিছনে ফেলে আসা লাতেহারের পাহাড় ও অরণ্যের ছবি এর মধ্যেই অতীত-স্মৃতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—আর মাইল ত্রিশেক পরেই রাঁচি।

হঠাৎ চিনিবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে দেখেই গাড়ির স্পীড কমাতে আরম্ভ করলেন। দূরে পথের ধারে একখানা বাস থেমে দাঁড়িয়ে আছে—একটা ছোটখাটো জনতার জটলা। আরও কাছে এগিয়ে আসতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।—অ্যাকসিডেণ্ট!

বীভৎস দৃশ্য। ভাল ভ্যান্‌গার্ড গাড়ি—নিশ্চয় খুব জোরে আসছিল, হঠাৎ কি করে পথচ্যুত হয়ে পাশের একটা গাছের গুঁড়িতে সোজা এসে ধাক্কা মেরেছে। বাম্পার ভেঙে চুরমার হয়ে এঞ্জিনের সামনের দিকটা একেবারে থেঁতলে গেছে, ছাদের অর্ধেকটা দুমড়ে তেউড়ে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে ছট্‌কে পড়েছে, তার পর সমস্ত গাড়িটা টাল খেয়ে পথের পাশে মাঠের উপর উল্‌টে পড়ে গেছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে। পেট্রোল-ট্র্যাঙ্ক তুবড়ে গেছে, মুখের ঢাকনা খুলে সর্বত্র তেল গড়িয়ে পড়েছে—আগুন যে কেন লাগে নি তাই আশ্চর্যের কথা!

পথ থেকে নেমে গাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলাম। গাড়ির একমাত্র আরোহী অত্যন্ত অসহায়ভাবে কাত হয়ে পড়ে আছেন, হাতের স্টিয়ারিং হুইল ভেঙে ডাণ্ডাটা তাঁর বুকের মধ্যে প্রায় তিন ইঞ্চি ঢুকে গেছে, কণ্ঠনালীর একপাশে একখানা ভাঙা কাচের টুকরো বর্শা-ফলকের মত গভীরভাবে বিঁধে আছে, সমস্ত মুখখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে—নীচের মাটি রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে।

কিন্তু ঐ খাকি হাফপ্যাণ্ট ও শার্ট! মাথার ঐ লম্বা ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল! বাঁ হাতের অনামিকায় ঐ মস্তবড় পলা-বসানো সোনার আংটি! আর মুখের ঐ দুটো উঁচু দাঁত!

হিতেনবাবু অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'মিঃ কারমারকার!'

চাপা গলায় জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ—মিঃ কারমারকার সত্যিই এবার পালিয়েছেন। আর কেউ তাঁর নাগাল ধরতে পারবে না।'

পাশেই বাসের ড্রাইভার দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি এই সাহেবকে চেনেন না কি?'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলাম, 'নাঃ—আমাদের চেনা কেউ নয়।'

আট

বাস্তবিকই মিঃ কারমারকার আমাদের পরিচিত কেউ নন। 'পরিচয়' কথাটার মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী অভ্যাসের একটু আভাস আছে—মিঃ কারমারকারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল মাত্র একদিন, ঘণ্টা দুএকের জন্য। তাঁর সঙ্গে এই আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার।……

দামুয়া-ভালুয়া জঙ্গলের ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম—বেলা তখন প্রায় দুটো। ভ্যান্‌গার্ড গাড়িখানা প্রায় পূর্ণবেগেই পথ থেকে মোড় ঘুরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আধময়লা খাকি হাফপ্যাণ্ট ও শার্ট পরা শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলে উঠলেন, 'আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন আপনারা?'

পথ চলতে যাদের সঙ্গে দেখাশোনা হয় তাদের মধ্যে ঠিক এই ধরনের অনুরোধ বড় একটা কেউই করে না। একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে চৌকিদারকে আর এক কাপ চা আনতে বললাম। ভদ্রলোক পকেট থেকে কার্ড-কেস বের করে আমাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা করে কার্ড দিয়ে তার পর আসন গ্রহণ করলেন।

চায়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ জলযোগেরও আয়োজন ছিল। ভদ্রলোক এমন ভাবে খেতে লাগলেন যে দেখে মনে হল যেন বহুক্ষণ অভুক্ত আছেন।

সিগারেট অফার করলাম, নিলেন না, বললেন, 'না দাদা, মদ গাঁজা পান বিড়ি সিগারেট কিছুই খাই নে—নেশার মধ্যে এই এক চা। দিনে প্রায় দশ বারো কাপ খেতে হয়।'

ভদ্রলোকের সমস্ত কথাবার্তা চালচলনের মধ্যে কেমন একটা চাপা স্নায়বিক উত্তেজনার আভাস। মুখে শিষ্টাচারসঙ্গত হাসি, কিন্তু চোখে হাসি নেই—চোখ দুটোর দিকে চাইলে মনে হয় যেন তাদের মধ্যে একটা ঈষদুত্তপ্ত হতাশা বাসা বেঁধে বসে আছে।

হাতের কার্ডখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা মিঃ কর্মকার, এদিকে আপনি কতদূর যাচ্ছেন?'

—'তা তো জানি নে। আমি কোথাও যাচ্ছি নে দাদা—আমি পালাচ্ছি। না, পুলিসের হাত থেকে পালাচ্ছি নে—আপনারা ভয় পাবেন না—চুরি ডাকাতি খুন জখম কিছুই আমি করি নি। আমি পালাচ্ছি—'

মুখের কথা অর্ধসমাপ্তই রয়ে গেল—চোখের দৃষ্টি আরও উত্তপ্ত আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে চুপ করে সামনের পথের দিকে চেয়ে রইলেন। লক্ষ্য করলাম, গম্ভীর হলে ভদ্রলোকের মুখখানাকে বড়ই কুৎসিত দেখায়—বিশেষ করে বিশ্রীরকম উঁচু দুটো দাঁতের জন্য।

তার পর আবার হঠাৎ হেসে ফেললেন; বললেন, 'কিন্তু আপনি একটু ভুল করেছেন, আমার নাম কর্মকার নয়, কারমারকার—আমি বাঙালী নই; মরাঠী। মুখের কথা শুনে ভুল বুঝবেন না—ছেলেবেলা থেকেই কলকাতায় আছি, বাংলা আমি ঠিক বাঙালীর মতই বলতে পারি।'

কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না; অভব্যতার অপবাদগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে জেনেও প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আপনি কোথায় পালাচ্ছেন? আর কেনই বা পালাচ্ছেন?'

মিঃ কারমারকারের মুখখানা আবার গম্ভীর ও কুৎসিত হয়ে উঠল,

অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগলেন, তার পর আস্তে আস্তে বললেন, 'তাহলে তো অনেক কথা বলতে হয় আপনাদের—আমার পুরো জীবন কাহিনীটাই শোনাতে হয়। কাউকে কোনদিন বলি নি এসব কথা— সত্যি বলতে কি, এত কথা বলবার সময়ই জোটে নি জীবনে। কিন্তু আজ আমার অফুরন্ত অবসর—'

হঠাৎ একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা আজ কোথায় রাত কাটাবেন ঠিক করেছেন বলুন তো?'

—'ঠিক কিছু করি নি, তবে হয় শেরঘাটি আর না হয় তো বড়জোর আওরঙ্গাবাদ—তার বেশি আজ আর যাব না।'

—'তবে তো অনেক সময় আছে আপনাদের হাতে, তাড়া বিশেষ কিছু নেই।'...

আমাদের সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষা না করেই মিঃ কারমারকার তাঁর কাহিনী আরম্ভ করলেন।

মরাঠা মুলুকের একেবারে দক্ষিণে ধারোয়ার বলে একটা ছোট্ট শহর আছে—নাম শুনে থাকবেন বোধ হয়। ধারোয়ারের পুরনো পাহাড়ী কেল্লাটা নাকি একটা দেখবার জিনিস—বাবার মুখে ঐ কেল্লার অনেক গল্প শুনেছি ছেলেবেলায়, এখন আর সেসব কিছু মনে নেই। আমি অবশ্য দূর থেকেই যা দেখেছি—কাছে বা ভিতরে কখনও যাই নি। বাবা আসতেন কাঠ বেচতে শহরের বাজারে। একটু বড় হলে আমিও তাঁর সঙ্গে আসতাম, আবার বাজার থেকেই গাঁয়ে ফিরে যেতাম। আমাদের গ্রামের নাম বন্ঠান —ধারোয়ার থেকে চার ক্রোশ উত্তরে, পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরে। বাবা ছিলেন কাঠুরে। মায়ের কাছে গল্প শুনতাম, আমাদের বংশ নাকি খুব খানদানী বংশ। আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা কোন্ রাজার ফৌজের সেনাপতি ছিলেন, ঠাকুরদাদা ছিলেন ডাকাত-সর্দার—টাকাকড়ি লোকলস্কর কিছুরই তাঁদের অভাব ছিল না।

আমার কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, বুনো ফল-মূল শাক-লতা পাতা আর ঘাসের বীজের দানার জাউ খেয়েই আমাদের অধিকাংশ দিন কাটত। যেদিন এক-বেলা দুখানা রুটি জুটত সেদিন তো রীতিমত মহোৎসব। তিনটি প্রাণীর সংসার, তবু অভাব-অনটন কোনদিনই ঘুচত না।

কিন্তু ছেলেবেলায় দুঃখবোধটা তত প্রবল থাকে না। আমার মনেও বন্‌ঠানের জীবনের যে অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু এখনও বজায় আছে তা দুঃখের স্মৃতি নয়।

মাপ করবেন, গল্প আরম্ভ হতে না হতেই বাজে বকুনি শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু গল্প বলা তো অভ্যাস নেই—বিশেষ করে নিজের জীবনের গল্প। মাঝে মাঝে এ রকম বাজে কথা এসে পড়বেই।.......

মা বাবা একদিনেই মারা গেলেন—কলেরায়। আমার বয়স তখন বড়-জোর দশ কি বারো। গাঁয়ের বুড়ো মুখিয়ার বাড়িতে কিছুদিন কাটল, কিন্তু সেও গরিব কাঠুরে—পরের ছেলে পুষবার মত অবস্থা তার নয়। ঠিক হল আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমার এক দূরসম্পর্কের কাকা নাকি কলকাতার কোন্ এক চটকলে কাজ করেন—তাঁরই আশ্রয়ে এসে আমাকে উঠতে হবে। তাঁর ঠিকানা গাঁয়ের কেউই জানে না, কাজেই চিঠি লিখে খবর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়লে কি আর ফেলতে পারবেন ?

মায়ের কয়েকখানা ভারী ভারী রুপোর গয়না ছিল—বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া। সেই ক-খানা বেচে আমার রাহাখরচের সংস্থান হল। তার পর একদিন গাঁয়ের আরও দুতিনজন মাতব্বরকে সঙ্গে নিয়ে মুখিয়া বুড়ো নিজে এসে ধারোয়ারে আমাকে রেলগাড়িতে তুলে দিয়ে গেল। সেই শেষ—আর কখনও দেশে ফিরি নি।

হাওড়া স্টেশনে এসে নামবার পর কি হল তা নিশ্চয় আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন। চটকলের মজুর বন্‌ঠানের গণপৎরাও কারমারকার ইট-পাথরের নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইলেন—

—কিছুতেই তাঁর নাগাল ধরতে পারলাম না। তার পর সেই ছেঁড়া-কাপড়-পরা ছোট মরাঠী ছেলেটা কলকাতার অনেক পথে পথে অনেক চোখের জল ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছে, অনেক দরজায় কড়া নেড়েছে, অনেক লোকের সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু কলকাতা বা কলকাতার ভদ্রাভদ্র মেয়েপুরুষ কেউ তাকে একবিন্দু দয়া করে নি।

দয়া করল কলকাতার পুলিস। দুই এক ঘা রুলের গুঁতো দেবার পর তারা আমাকে একটা অনাথাশ্রমে পঠিয়ে দিল—বেলেঘাটার ওদিকে একটা পচা প'ড়ো বাড়িতে আশ্রয় মিলল।

এই আশ্রয়ে বছরখানেক কাটিয়ে দিলাম। অনাথাশ্রমের পাঠশালাতেই আমার হাতে-খড়ি হল—বাংলা বর্ণপরিচয় শুরু হল। মোটামুটি বাংলা কথা বলতে শিখলাম—বিশেষ করে অশ্লীল গালিগালাজগুলো খুব তাড়াতাড়িই রপ্ত হয়ে গেল। ভিতরে বাইরে একটু আধটু হাত-সাফাইও দলে পড়ে আরম্ভ করে দিলাম।

এমন সময় আমাদের বুড়ো দাদুমশাই—আশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—রিটায়ার করে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন একজন কালো গাঁট্টাগোট্টা আধাবয়সী ভদ্রলোক—সারা গায়ে লোম আর ঘাড়ভর্তি দাদ।

তাঁর জন্যেই আমাকে আশ্রম ছেড়ে পালাতে হল। সে বড় নোংরা ব্যাপার, আপনাদের শুনে দরকার নেই।

এর পর আর কখনও পরের দয়ার দান হাত পেতে নিই নি। পথে পথে ছেঁড়াকাগজ আর ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়িয়েছি, জুতো ব্রুশ করেছি, চায়ের দোকানে চাকরি করেছি, বেশ্যাপাড়ায় ফুলের মালা ফেরি করেছি—অনেক ঘাটের জল খেয়েছি, আর ওরই ফাঁকে ফাঁকে কর্পোরেশনের ফ্রী ইস্কুলে গিয়ে যখন পেরেছি একটু করে লেখাপড়া শিখেছি। বিদেশী বুনো কাঠুরের ছেলে—কিন্তু লেখাপড়ার নেশাটা কেমন করে যেন মাথায় চড়ে গিয়েছিল, অবসর পেলেই চাগিয়ে উঠত।

ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে তালতলার যদু মিস্তিরির লেদের দোকানে এসে

জুটলাম। ঐখানেই মন বসে গেল। আস্তে আস্তে হাতের কাজে বেশ পাকা হয়ে উঠলাম, ভাল মিস্তিরি বলে বাজারে নাম রটে গেল।

বয়স বাড়তে লাগল। নেশা-ভাং ধাতে সয় না, মিস্তিরি-মার্কা ফুর্তিও খুব ভাল লাগে না। ভাল লাগে খাটতে, আর খেটে পয়সা কামাতে। যদু নিজে পাঁড় মাতাল—একদিন দোকানে আসে তো তিনদিন আসে না। ক্রমে দোকানের সব ভার আমার হাতেই এসে পড়ল। এর ফলে যদু যেন অনেকটা নিশ্চিন্তই হল।…

এ গল্প আপনাদের ভাল লাগছে না বুঝতে পারছি। নীরস জীবনকাহিনী —তাও একটা ছোটলোকের জীবন। না না, ও গাড়িই থাক আর বাড়িই থাক, যে ছোটলোক সে চিরকালই ছোটলোক। জন্মের সময় ভগবান আমার কপালে দেগে দিয়েছেন, আমি ছোটলোক। চেহারাটা দেখছেন না!—কিন্তু গল্পটা বলা আজ আমার বিশেষ দরকার। বহুকাল কারও কাছে কিছু ভিক্ষে চাই নি, আজ চাইছি, দয়া করে শেষ পর্যন্ত শুনুন।

যদু প্রায় সাত দিন দোকানে আসে না, হঠাৎ আমাকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠাল। গিয়ে দেখলাম সে মরছে—লিভার পচে ন্যাবা হয়ে মরছে। দু হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, তার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

যদুর বৌ বেঁচে নেই, বাড়িতে ঐ একমাত্র মেয়ে। মেয়েকে সে বড় ভালবাসে—মাষ্টার রেখে নাচগান শিখিয়েছে, ইস্কুলে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছে। সে মরে গেলে মেয়েটার কি গতি হবে?

যদুর মেয়ে এসে চা দিয়ে গেল। মাজা শামলা রঙ, একহাঁটু কালো চুল, টানা-টানা চোখ। বড় ভাল লাগল। সহজেই রাজি হয়ে গেলাম।

বিয়ে হয়ে গেল। ছিলাম বাংলাদেশের পুষ্যিপুত্তুর, হলাম জামাই। ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম একটা ধাক্কা খেলাম। ঝট্‌কা মেরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বৌ বলে উঠল, 'ছাড় ছাড়,—লাগে—উঃ! অসভ্য ছোটলোক—দাঁতু কোথাকার!'—জীবনে বহু অপমান ভোগ করেছি, কিন্তু সেদিন বৌএর মুখের ঐ 'দাঁতু' কথাটা বুকে বড্ড লেগেছিল।

সুখে দুঃখে দিন কাটতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তিনটে ছেলেমেয়ে হল, দুই মেয়ে আর এক ছেলে। লেদের দোকানের আমিই এখন মালিক। আস্তে আস্তে অবস্থা ফিরতে লাগল—মিস্তিরি-পাড়া ছেড়ে ভদ্রপল্লীতে এসে বাসা ভাড়া নিলাম।

এমন সময় যুদ্ধ বাধল। তার পর কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। জাপানী যুদ্ধ শুরু হবার পরই বরাত খুলে গেল। ফৌজী কর্তাদের আমার হাতের কাজ খুব পছন্দ—হু-হু করে অর্ডার আসতে লাগল, যে দাম চাই তাতেই তারা রাজি। ঘরের ছাপ্পর ফুঁড়ে টাকা আসতে আরম্ভ হল।

এইখানেই শেষ হল না। আমেরিকানরা সন্ধান পেল একটু পরে, কিন্তু তারা যখন এসে পড়ল ফোর্ট উইলিয়মের কর্তাদের তখন মানে মানে লেজ গুটিয়ে সরে পড়তে হল। মানুষের যে কত টাকা থাকতে পারে, গতর খাটিয়ে যে এত টাকা রোজগার করা যায়—কোনকালে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

তালতলার দোকানে তালা পড়ল। টালিগঞ্জের ওপাশে বাঁশধানির কাছে টিনের চাল আর দরমার বেড়া দিয়ে বিরাট শেড তৈরি করে তাতে আমার জন্যে নতুন কারখানা গড়ে উঠল—সবই অবশ্য আমেরিকানদের টাকায়। কারখানায় তিন শিফ্‌টে দিনরাত কাজ চলে, প্রায় হাজারখানেক লোক খাটে। আমিই সেখানকার সর্বেসর্বা—ম্যানেজার হিসাবে মোটা মাইনে পাই, কনট্র্যাক্টর হিসাবে মার্জিন মারি, আবার মালিক হিসাবে লাভের টাকাও খাই। ফৌজ সময়মত মাল ডেলিভারি পেলেই খুশি—লাভ-লোকসান খতিয়ে হিসাব কষবার সময় তাদের নেই। যত খাটব যত খাটাব তত পয়সা—পয়সার পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, শুধু কুড়িয়ে নেবার ওয়াস্তা। একা আর পেরে উঠি নে—খুড়তুতো শালা অনন্তকে ফোরম্যান করে নিলাম। পুরোদমে কাজ চলতে লাগল। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ব্যালান্সগুলো ফুলে ফেঁপে অতিকায় হয়ে উঠল।

বাড়ি হল, গাড়ি হল, বৌএর কাঁড়ি কাঁড়ি গয়না হল। ছেলেমেয়েদের

লেখাপড়া নাচ-গান-বাজনা শেখানোর জন্যে মোটা মোটা মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখা হল। ঝি চাকর দারোয়ান খানসামায় বাড়ি ভরে গেল। তালতলার ত্র্যম্বক মিস্তিরি মরে গেল—তার জায়গায় তিন রকম কার্ডে, দশ রকম চিঠির কাগজের মাথায়, সাত রকম পিতল-প্ল্যাস্টিকের নেমপ্লেটে ঝকঝক করে উঠল একটা নতুন নাম—মিঃ টি ভি কারমারকার।……

দেখুন, টাকার নেশার মত নেশা আর নেই—স্রেফ টাকা রোজগারের নেশা। মদ গাঁজা ভাং সবই এর তুলনায় অতি তুচ্ছ জিনিস। আমাকে তখন সেই সব-নেশার-রাজা নেশায় একেবারে পেয়ে বসেছে। হাজারকে কি করে দশ হাজার করা যায়, এক লাখকে পাঁচ লাখ করা যায় সেই চিন্তায় মশগুল হয়ে আছি। এত টাকা দিয়ে কি হবে? ভোগই যদি না করতে পারলাম তবে টাকা রোজগার করে লাভ কি?—এসব প্রশ্ন মগজে সেঁধুবার পথ কোথায়? সময়ই বা কই?

ভোর বেলা উঠে চাকরের হাতে তৈরি চা টোস্ট ডিমপোচ খেয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি তখন কোনদিনই বৌ-ছেলেমেয়ের ঘুম ভাঙার সময় হয় না। রাতে যখন ফিরি তখনও তারা ঘুমে অচৈতন্য—আমার ভাত আমার ঘরেই ঢাকা পড়ে থাকে। দুপুরের খাওয়া কারখানাতেই সারি, চাকর টিফিন ক্যারিয়ারে করে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যায়। রবিবার কারখানা বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু সেদিনও বাড়িতে খুব অল্প সময়ই থাকতে পাই—বড় মেজ ছোট সাহেবদের সেলাম বাজিয়ে আসতে হয়, ঘুষঘাষ ডালি দস্তুরি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হয়। বিলিতি হোটেলে ফৌজী কর্তাদের খানাপিনার ও অন্যবিধ মৌজের ব্যবস্থা করতে হয়। বাড়ির খবর শুধু এইটুকু রাখি যে ওরা সুস্থ আছে, সুখে আছে—বৌ আগের চেয়ে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে, স্নো-ক্রীম-পাউডার-লিপস্টিক আর রকমারি সিল্কের শাড়ির তলায় বয়সকে চমৎকার ভাবে চাপা দিয়ে ফেলেছে—কিন্তু ওদিকে ছেলেমেয়েরাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে।……

নেশার ঘোরে দিনগুলো কাটছিল এক রকম ভালই, কিন্তু হঠাৎ একদিন

ঝপ করে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। টাকার তখন আমার মোটেই অভাব নেই, আর টাকার দরকারও বোধ হয় নেই, কিন্তু টাকা রোজগার না করে চুপ করে বসে থাকা তখন আমার পক্ষে অসম্ভব। পোষা ভূত তখন কাঁধে চেপে বসেছে—সে যেদিকে চালাতে চায় সেইদিকে চলতেই তখন আমি বাধ্য।

কাজেই অন্য লোকে যেখানে এসে হয়তো একটু থামত, একটু আগুপিছু ভাবত, সেইখানে এসেই আমি যেন আরও বেশি করে মেতে উঠলাম। চকির মত দিবারাত্র আহার-নিদ্রা ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, খোশামোদ করে ঘুষ দিয়ে সবচেয়ে বড় বড় অফিসারদের হাত করে ফেললাম; তার পর এম-ই-এস্-এর সঙ্গে একটা বেচাকেনার অভিনয় হল, দলিল-দস্তাবেজে নানা রকম সই পড়ল—ব্যস্, তার পরই আমি একা সমস্ত কারখানাটার মালিক হয়ে বসলাম।

কিন্তু যুদ্ধের মালমশলা তৈরি করা আর খোলা বাজারের খদ্দেরদের খুশি করে কারখানা চালানো ঠিক এক জিনিস নয়। লাভের অঙ্ক কমে গেল, খাটুনি আরও বেড়ে গেল। সারাদিন বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতে হয়, মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়, তাছাড়া ওদিকে কারখানার কাজও চালিয়ে যেতে হয়। একা এত কাজ সম্ভব নয়। অনন্তকে মনে আছে তো—আমার সেই খুড়তুতো শালা? লোকটা কাজকর্ম বোঝে ভাল। তাকেই শূন্য বখরাদার করে নিলাম।

দেশ স্বাধীন হল। আবার সুসময় দেখা দিল। আমার কারখানার উপর সরকারী নেকনজর পড়ল, ঘন ঘন অর্ডার আসতে লাগল—আবার পয়সার পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শালখে অঞ্চলে জমি কিনে বড় বাড়ি তৈরি করে কারখানা সেখানে তুলে নিয়ে গেলাম।...

আর আপনাদের বেশি জালাতন করব না—নেশার কথা বলেছি, নেশা কি করে কাটল সেই কথা বলেই গল্প শেষ করব।

শেষ পর্ব শুরু হল অনন্তকে নিয়ে। একদিন হঠাৎ আমার কাছে এসে একেবারে হাত জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল, কি না, ভাইদের

ষড়যন্ত্রে তার সর্বনাশ হতে বসেছে—বসতবাড়ি নিলাম হয়ে যায়, এখুনি হাজার পাঁচেক টাকা না হলে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে তাকে পথে দাঁড়াতে হবে। টাকাটা সে আমার কাছে ধার চায়।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি অনন্ত, এত টাকা কামালে কারখানা থেকে, আর আজ পাঁচ হাজারের জন্যে আমার কাছে হাত পাতছ?'

অম্লান বদনে উত্তর দিল, 'আর দাদা, যুদ্ধের বাজারের কাঁচা টাকা—ও কি কারও থাকে? মদ, মেয়েমানুষ আর জুয়াবাজিতে কবে গলে জল হয়ে বেরিয়ে গেছে। আজ আমার হাতে পাঁচটা পয়সাও নেই।'

বেহায়াটার কথা শুনে মন-মেজাজ খিঁচড়ে গেল, একটু শক্ত হয়ে বললাম, 'তাই নাকি? তা হলে তো তোমাকে টাকা ধার দেওয়া চলে না—শুধবে কোথা থেকে? তার চেয়ে বরং কিছু বেচবার থাকে তো বেচ, ন্যায্য দামে কিনে নিতে রাজি আছি।

সত্যিই অনন্ত তার কারবারের শেয়ার আমার কাছে ন হাজার টাকায় বেচে দিল, তার পর টাকা নিয়ে সেই যে ডুব মারল আর সাত-আট মাসের মধ্যে তার টিকিটিও দেখতে পেলাম না।

ফিরল যেদিন সেদিন একেবারে হাউ-মাউ করে কেঁদে আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ল। এতদিন সে নাকি অসুখ-বিসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ছিল, কোন কাজকর্ম করতে পারে নি; তার উপর পরশু রাত্রে তার বাড়িতে মস্তবড় চুরি হয়ে গেছে—টাকাকড়ি গয়নাপত্র সব গেছে, কাল কি খাবে তার পর্যন্ত সংস্থান নেই। এখন আমি দয়া না করলে তার আর কোন উপায় নেই।

চেহারাটা কিন্তু ঠিক শয্যাশায়ী রুগীর মত ঠেকল না। সন্দেহ হল। গোপনে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম, অনন্ত মিস্তিরি রাতের কলকাতার একজন নামজাদা কাপ্তেন। বিলিতি মদ ছাড়া খায় না, বাঁধা মেয়েমানুষ আছে, ঘোড়-দৌড় থেকে গুটিখেলা পর্যন্ত সব রকম জুয়াতেই তার সমান উৎসাহ। সর্বস্বান্ত সে সত্যিই হতে বসেছে, তবে তার জন্য ভাইদের ষড়যন্ত্র অসুখবিসুখ বা চুরি কিছুই দায়ী নয়।

অনন্ত আবার কারবারের অংশীদার হতে চায়। সাফ বলে দিলাম, তা আর হতে পারে না। তবে সে কুটুম্ব মানুষ, বিপদে পড়েছে—ইচ্ছে হয় তো কারখানায় হেড মিস্তিরির চাকরি নিতে পারে। মাইনে ভালই পাবে।

কথাটা শুনে অনন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে তার কুৎকুতে চোখ দুটো মেলে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে চলে গেল। পরদিন থেকেই হেড মিস্তিরি হিসাবে কাজে লেগে গেল।

তার পর ছ মাসও কাটল না। স্ট্রাইক নোটিস পড়ল। মজুরি ডবল করতে হবে, ওভারটাইমের রেট বাড়াতে হবে, চীপ ক্যান্টীনে সস্তায় খাবার দিতে হবে, বিনি পয়সায় চিকিৎসা আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ইউনিয়নের সম্মতি ছাড়া কাউকে বরখাস্ত করা চলবে না। নীচে ইউনিয়নের নতুন সেক্রেটারির নামসই—অনন্তকুমার শিকদার।

অনেক কচ্‌লাকচ্‌লি অনেক দরকষাকষি করলাম, কিছুতেই কিছু হল না। শেষকালে অনন্ত চুপি চুপি এসে জানিয়ে গেল, ছ হাজার টাকা পেলেই সে সব মিটমাট করিয়ে দিতে পারে। টেবিলের উপর থেকে রুলটা তুলে নিয়ে তাকে তাড়া করলাম, ছুটে পালিয়ে না গেলে হয়তো মাথাই ফাটিয়ে দিতাম।

গত বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় ধর্মঘট আরম্ভ হল।

একটানা আট-দশ বছর ধরে শুধু কাজই করে আসছি—একদিনও বিশ্রাম পাই নি, বিশ্রাম নেবার প্রয়োজনও অনুভব করি নি। হঠাৎ পরিপূর্ণ বিশ্রাম এসে পড়ল—হাতে আর কোন কাজ নেই! মাথার মধ্যে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। ফোরম্যানদের ডেকে তাদের হাতে চাবির তাড়াটা তুলে দিলাম। তার পর গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করতে গেলাম। আর কেন? এইবার বাড়ি ফেরা যাক।

কারখানার সামনের ময়দানে তখন সভা হচ্ছে। অনন্ত বক্তৃতা দিচ্ছে:

'…মালিকের এই শয়তানী শোষণ আর আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। আমাদের ন্যায্য দাবি তাকে মানতেই হবে। এস ভাই সব, সবাই মিলে শপথ

করি—আমাদের হকের পাওনা আমরা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করব, দাঁতুর বিষদাঁত আমরা ভেঙে দেব...'

দাঁতু! আড়ালে আবডালে লোকে নিশ্চয় কথাটা বলে থাকে—এ মুখ দেখবার পর না বলাটাই আশ্চর্য। কিন্তু আমি কথাটা শুনলাম এই দ্বিতীয়বার, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে। খচ করে যেন বুকে এসে বিঁধল।

বাড়িতে ফিরলাম যখন তখন বেলা আন্দাজ তিনটে। অসময়ে মনিবকে দেখে খানসামা ছুটে এল। তাকে বললাম, 'মেমসাহেবকে ডেকে দে।'

—'মেমসাহেব তো বাড়িতে নেই হুজুর। নন্দমামাবাবুর সঙ্গে মেট্রোয় সিনেমা দেখতে গেছেন। সেখান থেকে পালিত সাহেবের বাড়িতে যাবেন—পার্টি আছে। ফিরতে রাত নটা হবে।'

নন্দমামাবাবু! সে আবার কে? ও—মনে হয়েছে, গিন্নীর বাপের বাড়ির দেশের সেই রোগা-পট্‌কা ছোঁড়াটা—তিন কুলে কেউ নেই বলে আমার বাড়িতে এসে উঠেছিল। যখন এত চাকর রাখবার সামর্থ্য ছিল না তখন বাজার-টাজার করত, গিন্নীর ফাই-ফরমাশ খাটত। তা—আজ তার এত উন্নতি হয়েছে যে গিন্নীর সঙ্গে সিনেমায় যায়, পার্টিতে যায়!—আর এই পালিত সাহেব লোকটাই বা কে?

প্রকাশ্যে বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে একবার মাধুকে আসতে বল্।'—মাধু অর্থাৎ মাধবী, আমার বড় মেয়ে।

—'আজ্ঞে, বড়দিদিমণি তো শুটিঙে গেছেন।'

—'কি? কোথায় গেছেন?'—প্রায় আঁতকে উঠলাম। তার পর খানসামাকে জেরা করতে শুরু করলাম।

মাধবী বি এ ফেল করেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। আজকাল সে নাকি সিনেমার অভিনেত্রী হয়েছে। আজ স্টুডিওয় শুটিং আছে—সকাল সাড়ে আটটায় বেরিয়ে গেছে, রাত্রে কখন ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই, বারোটা-একটাও হতে পারে।

ফৌজী সাহেবদের চিত্তবিনোদনের জন্য সিনেমা-অভিনেত্রী মহলে বহুবার

ঘোরাফেরা করতে হয়েছে। সুন্দরী ধনী-কন্যাদের এই সিনেমা-বিলাসের গোপন রহস্যটা যে কি তার কিছু কিছু জানা ছিল। মনে মনে কপালে করাঘাত করলাম।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। খানসামাকে বিদায় করে দিয়ে নিজেই একটু ঘুরে দেখতে লাগলাম।

ছোট মেয়ে মঞ্জরীর ঘর থেকে ঘুঙুর ও তবলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার উঁকি মেরে দেখলাম। ঘরজোড়া ফরাশের উপর মঞ্জরী নাচছে। দাড়িওয়ালা এক খাঁ সাহেব তবলা বাজাচ্ছেন। ডজনখানেক সুবেশধারী তরুণ ও মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—সবাই আমার অচেনা—সতের বছরের সুন্দরী নর্তকীর সুললিত দেহভঙ্গিমা যেন হাঁ করে গিলছে। আমার দিকে কেউ একবার ফিরেও চাইল না।

ছেলের ঘরটা বড্ডই চুপচাপ ঠেকছে—বোধ হয় বাড়িতে নেই। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েই বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। গোল টেবিলের চারদিকে ছ-সাতখানা চেয়ারে ছেলে তার ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বসেছে—মধ্যে বোতলে-গেলাসে স্ফূর্তির তরল উপকরণ সাজানো রয়েছে। কয়েক রাউণ্ড বোধ হয় হয়ে গেছে, গোলাপী নেশার আমেজে সবাই একটু নিঝঝুম মেরে গেছে। আমাকে দেখেই ছেলে লজ্জায় আধহাত জিভ কেটে ফেলল।

সরে আসতে আসতে শুনতে পেলাম কে একজন বলল, 'কিছু মনে করিস নি ভাই বন্ধু, তোর বাবাটা কিন্তু ভাই একের নম্বরের দাঁতু।'—হি-হি করে সবাই হেসে উঠল—মাতালের হাসি। পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রও হেসেছিলেন বোধ হয়।

নিজের ঘরে যখন ফিরে এলাম তখন আমি হাঁপাচ্ছি—মনে হচ্ছে যেন আমার নাক-মুখ-চোখের উপর কে একতাল পাঁক ছুঁড়ে মেরেছে, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দু দিন দু রাত্রি বাড়িতে ছিলাম। নিজের ঘর থেকে আর বেরুই নি। আমার ঘরেও চাকর এসেছে, খানসামা এসেছে, চা এসেছে, খাবার এসেছে—কিন্তু আর কেউ অর্থাৎ ওরা কেউ আসে নি। আমাকে ওরা এড়িয়ে চলতে

শিখেছে—খানিকটা নিশ্চয় ভয়ে, কিন্তু খানিকটা ঘেন্নায়ও বোধ হয়। একলা বসে কেবল ভেবেছি—এ কি হল ? আর—কেনই বা এমন হল ?

হঠাৎ সেদিন দুপুর বেলা একলা ঘরে অনভ্যাসের শয্যায় পড়ে ছটফট করছি এমন সময় খুট করে মগজের মধ্যে যেন একটা ছিটকিনি খুলে গেল, দপ করে চোখের সামনে যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। নিমেষের মধ্যে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

টাকা! বুঝলেন ? বড্ড বেশি টাকা! মার্বেলে মোজেইকে, আয়নায় কার্পেটে, রেডিওয় ফ্রিজিডেয়ারে—সব জায়গায় সব কিছুতে টাকার বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। চীৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করল—আমি বনঠানের গরিব কাঠুরের ছেলে, তালতলার গরিব ত্র্যম্বক মিস্তিরি—এত টাকার মধ্যে আমি কেন ? আমার বৌ, আমার ছেলেমেয়ে—ওরা আসলে আমার টাকার বৌ, আমার টাকার ছেলেমেয়ে। আমার ওরা কেউ নয়। টাকা আমার, তাই ওরা আমার। আমি টাকা চেয়েছিলাম, ওদের কোনদিন চাই নি; আজ তাই ওরাও আমার টাকা চায়, আমাকে চায় না।

মিঃ কারমারকার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। চোখের চাপা আগুন আর চাপা নেই, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠে আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে। কদাকার দাঁত দুটো যেন উঁচু হয়ে আরও ঠেলে বেরিয়েছে। গলার স্বর তীব্র কর্কশ—কানে এসে বিঁধছে।……

—আসলে ওরা আমার শত্রু!

সেদিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। আমার বৈঠকখানায় ওরা সভা করে বসেছে। বৌ আছে, মেয়েরা আছে, ছেলে আছে, আর আছে নন্দ। বক্তৃতা দেবার জন্য ওরা অনন্ত মিস্তিরিকে ডেকে নিয়ে এসেছে। অনন্ত প্রস্তাব করেছে, একটা নোড়া দিয়ে ঠুকে আমার উঁচু দাঁত দুটো ভেঙে দেওয়া হ'ক,

তার পর শিকল দিয়ে আমাকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে দেওয়া হ'ক। শিকলটা রুপোর হলেই ভাল হয়।—সবাই এ প্রস্তাবে রাজি, এক বৌ ছাড়া। বৌ বলে, পাপের শেষ রাখতে নেই, এত হাঙ্গামা করার চাইতে বিষ দিয়ে বখেড়া মিটিয়ে ফেলাই ভাল। ...

আপনারা হাসবেন—তা হাসুন, কিন্তু সত্যি বলছি, স্বপ্ন দেখে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা হিম হয়ে গেছে। এই দুটো দাঁত নিয়ে ওদের কারও সামনে দাঁড়াবার সাহস আর আমার নেই।—তাই আমি পালাচ্ছি। হাজারখানেক টাকা আর এই গাড়িখানা ছাড়া আর ওদের কিছুই আমি নিই নি।—আর ফিরব না। বনজঙ্গলের মধ্যে একটা গরিব লোকের গাঁ বেছে নিয়ে সেখানে একটা কামারশালা খুলব। আমার এই রোগা শরীর দেখেছেন—এ এখনও লোহার মত মজবুত আছে। আবার আমি বিয়ে করব—কোন গরিব চাষীর মেয়েকে। একটা ছেলে হবে—কালো মোটাসোটা শক্ত চেহারা। সে বসে হাপরের দড়ি টানবে আর আমি নেহাইএর উপর হাতুড়ি পিটে পিটে গড়ব শুধু কোদাল আর শাবল আর লাঙলের ফাল।

কিন্তু সে পরের কথা। আগে পালাতে হবে। এমন ভাবে পালাতে হবে যে ওরা কিছুতেই যেন আমাকে খুঁজে না পায়—ওদের হাতের রুপোর শিকল দিয়ে কিছুতেই আবার আমাকে বেঁধে ফেলতে না পারে।

পাগলের মত লাফ দিয়ে নীচে নেমে মিঃ কারমারকার তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তার পর ভোঁ করে স্টার্ট দিয়ে পূর্ণবেগে মোড় ঘুরে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নয়

কোথায় যেন পড়েছি, কোন্ এক ইংরেজ লেখক লিখেছেন যে আমাদের প্রত্যেকের প্রাত্যহিক জীবন অনেকগুলো রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনীর সমষ্টি, তবে আমরা তার মধ্যে রহস্য বা রোমাঞ্চ কিছুরই সন্ধান পাই নে, কারণ আমরা এই সব কাহিনীর শুধু মাঝখানটারই সংস্পর্শে আসি—তাদের ল্যাজামুড়ো দুইই আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর রয়ে যায়।

কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে কলকাতার প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধেও নিশ্চয় সত্য।—কি জানি, আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। কলকাতার প্রাত্যহিক জীবনের কথা ভাবলেই মনে পড়ে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া কিংবা কলুর বলদের কথা। চোখে ঠুলি, পিছনে ঠেলা—অন্তহীন জনতার মধ্যে অপরিসীম নিঃসঙ্গতা—একঘেয়ে কর্মচক্রের একান্ত উদাসীন পৌনঃপুনিক আবর্তন। এর মধ্যেও যে আনন্দ বিস্ময় বা রোমাঞ্চের সম্ভাবনা নিহিত থাকতে পারে, কথাটা কেমন যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

তবে হ্যাঁ, পথে যখন বেরিয়ে পড়ি, গতির মোহ যখন কানে গানের সুরের মত বাজতে থাকে, জীবন যখন বদ্ধজলার ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীব্রধারা গিরিনদীর স্রোতোময় রূপ ধারণ করে,—তখন কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। পথের বাঁকে বাঁকে কত খণ্ড-নাটকের ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য নিমেষের জন্য চোখে পড়ে, আবার নিমেষের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়, কত অসমাপ্ত রহস্যের পাশ কাটিয়ে চলে যাই, হঠাৎ-দেখা কত হাসিকান্নার কারণ জানবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে!

কত কৌতূহল চরিতার্থ করবার সময় পাই নি, কত প্রশ্নের উত্তর জানা হয় নি—এ জীবনে কোনদিনই জানা হবে না!

বেমো স্টেশনের বাইরে রাস্তার গাছতলায় একগলা ঘোমটা দিয়ে লক্ষ্মী বৌটি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে পিছন ফিরে তার বাপের বয়সী সেই বুড়ো লোকটার গালে অত জোরে চড় মারল কেন?

চৌপারান বাজারের ওপাশে নির্জন পথ ধরে সন্ধ্যার সময় একজোড়া দেহাতী তরুণ-তরুণী চলেছে—দেখলেই বোঝা যায় স্বামী-স্ত্রী। গাড়ির হেডলাইট তাদের মুখের উপর পড়ল। স্পষ্ট দেখলাম মেয়েটা খলবল করে কথা বলছে, হাসছে,—কিন্তু ছেলেটা মুখ বুজে কাঁদছে—চোখের জলের ধারা তার দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।—কেন?

ঘরের কাছেই—পরাজ কি গলসি, কোথায় ঠিক মনে নেই—পথের ধারের একখানা চালাঘরের কানাচে দাঁড়িয়ে ঠিক দুপুর বেলা দু জন আধা-বয়সী লোক চুপি চুপি ফিস ফিস করে কথা বলছে। হঠাৎ একজন তার কোঁচড়ের কাপড়ের ভিতর থেকে একফুট লম্বা একখানা ধারালো চকচকে ভোজালি বের করে আর এক জনকে দেখাল। দু জনেরই মুখে একটা চাপা কুটিল ধরনের অর্থপূর্ণ হাসি।—কেন?

কেন? কেন? কেন?—কি হবে এই সব নিষ্ফল প্রশ্ন করে? বহু মানুষের বহু বিচিত্র জীবন নিয়ে এই পৃথিবী। পথ চলতে চলতে তারই কোন কোনটির খিড়কির জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। জীবনের ঢেউ চারিদিকে উত্তাল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে তারই শীকরকণা গায়ে এসে লেগেছে। বিস্মিত হয়েছি, পুলকিত হয়েছি, রোমাঞ্চিত হয়েছি—এই তো যথেষ্ট। নিরর্থক প্রশ্নের ঢিল ফেলে জল ঘুলিয়ে লাভ কি?

ঠিক কথা। কিন্তু তবু মন মানে না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে।

নেতারহাটের পথে চলেছি। তখনও কোয়েল নদীর ধারের সেই অতি নির্জন অতি সুন্দর ডাকবাংলোটিতে এসে পৌঁছুতে পারি নি, কিন্তু ওপারের পাহাড়গুলো এর মধ্যেই চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিনিবাবুর শখ হল, পথের ধারে গাছতলায় থেমে একটু হাত-পা ছেড়ে নিতে হবে, আরাম করে দুটো সিগারেট খেতে হবে।

টুকরো-টাকরা কথা বলছি, এদিক-ওদিক পায়চারি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলাম, আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিক থেকে একটা

বুড়ো লোক আসছে—পরনে একখানা খাটো বহরের কোরা জোলাই ধুতি, কাঁধের উপর একটা নতুন মাটির কলসীতে এক কলসী জল। জাতে মুণ্ডা কি ওঁরাং হবে।

বুড়ো হলেও বেশ শক্ত আছে, হন হন করে এগিয়ে আসছে। কাছে যখন এসে পড়েছে তখন আমার মাথায় কি দুষ্টগ্রহ ভর করল, সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ভেইয়া, ইহাঁসে কোয়েল নদী ঔর কিত্‌নি দূর হোগী?'—এ অঞ্চলের আদিবাসীরা সকলেই হিন্দী ভাষা বোঝে, কেউ কেউ বলতেও পারে।

লোকটা হঠাৎ কেমন পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত নিষ্পলক নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পরই মোটা ভাঙা গলায় চীৎকার করে যেন বোমার মত ফেটে পড়ল। হিন্দী গালগুলো বুঝতে পারছিলাম—অতি কদর্য, অতি অশ্লীল। কাজেই অনার্যতর ভাষার অন্য যে গালগুলোর অর্থবোধ হচ্ছিল না, সেগুলোর স্বরূপ বুঝতে একটুও কষ্ট পেতে হয় নি। লোকটা ক্রোধে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল—গলার শিরাগুলো দড়ির মত মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে, সর্বশরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে, দুই চোখ বুনো মহিষের চোখের মত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। আমি তো একেবারে হকচকিয়ে থতমত খেয়ে গেলাম। এ কি কাণ্ড রে বাবা! একটা অতি সাধারণ নিরীহ প্রশ্ন করে এ কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলাম!

শ্রীমান লাবু এগিয়ে এসে লোকটাকে ধমকে থামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার ফলে উলটো উৎপত্তি হল—লোকটা যেন ক্ষেপে গেল। তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগল, ছড়াকাটার মত সুর করে তারস্বরে গালি পাড়তে লাগল,—তার পর হঠাৎ দু হাতে কাঁধের কলসীটা ধরে পথের উপর দুম করে আছাড় মেরে সেটাকে ভেঙে ফেলল।

এর পরেই এল প্রতিক্রিয়া। যেমন হঠাৎ শুরু করেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। তার পর দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিল। সে কি মর্মান্তিক বুকফাটা কান্না!

চিনিবাবু ততক্ষণে গাড়িতে গিয়ে বসে স্টার্ট দিয়েছেন; হাঁক দিয়ে বললেন, 'উঠে আসুন তো আপনারা সবাই—আর ফ্যাচাং বাড়িয়ে দরকার নেই। হুঁঃ—যত্ত তো সব ইয়ে!'

গাড়ি থেকে পিছন ফিরে দেখলাম, বুড়ো তখনও তার কলসীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনি ভাবেই কাঁদছে।...

সঙ্গীরা সবাই একমত, বুড়োটা পাগল ছিল। হয়তো তাইই সত্যি।—কিন্তু যদি তা না হয়? বুড়ো সেদিন যে আচরণ করেছিল তার পিছনে যদি আমাদের নাগরিক সুসভ্য মনের ধারণাতীত আদিম সংস্কার ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থেকে উদ্ভূত কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থেকে থাকে, তা হলে—?

হয়তো একটা রোমাঞ্চকর রহস্যনাট্যের, হয়তো বা একটা মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির চরম ক্রান্তিমুহূর্তে আমরা তার মধ্যে আকস্মিক অনধিকারপ্রবেশ করে বসেছিলাম। যে বিস্ফোরণের হেতু বা পরিণাম কিছুই আমাদের জানবার উপায় নেই, তারই খানিকটা আঁচ হয়তো সেদিন আমাদের গায়ে এসে লেগেছিল। এও তো সম্ভব!

নিশীথ-রাত্রের সেই লণ্ঠন-রহস্যের কথাও সহজে ভোলবার মত নয়।

শিলিগুড়ির হোটেলে রাত্রিবাসের প্রস্তাবটা কারও তেমন মনঃপূত হয় নি—পরিবেশ অতি অপরিচ্ছন্ন, সহ-আবাসিকদের চালচলন ও কথাবার্তাও তেমন পছন্দসই বলে মনে হল না। একটা সামগ্রিক নোংরামির আবহাওয়ায় মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর হিতেনবাবুই কথাটা তুললেন; বললেন, 'নাঃ, এখানে রাত কাটানো অসম্ভব। তার চেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক—একটা রাত না হয় নাই বা ঘুমোলাম। মালদ'য় পৌঁছে বরং পুরো একদিন বিশ্রাম নেওয়া যাবে।'...

আকাশে ঘোলাটে মেঘের আবরণ, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পঞ্জিকা অনুযায়ী রাত সাড়ে বারোটার সময় চাঁদ ওঠবার কথা, কিন্তু মেঘের ছেঁড়া

কাঁথা চাপা পড়ে সে চাঁদ আঁতুড়ঘরেই দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে। হেডলাইটের উজ্জ্বল যুগলরশ্মি অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথের সন্ধান করছে।—এ অঞ্চলের পথঘাট এক মানুভাই ছাড়া আমাদের আর কারও ভাল করে জানা নেই। চিনিবাবু অত্যন্ত সতর্কভাবে বেশ আস্তে আস্তেই গাড়ি চালাচ্ছেন। মাঝে মাঝে অর্ধসমাপ্ত ব্রিজ ও কালভার্ট আছে—সাময়িক বিকল্প হিসাবে তৈরি কাঁচা রাস্তায় নেমে পাশ কাটিয়ে সেগুলোকে পার হতে হয়। রাত্রে এইসব জায়গাতেই বিপদের সম্ভাবনা বেশি।

পাশে চাইলে দেখা যায় শুধু অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারের ঘূর্ণি—উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি না গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে, তাও বোঝবার উপায় নেই। সামনে চাইলে দেখা যায়, তরল কালো স্রোতের মত অন্তহীন পথ হু-হু করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে—শুধু আসছে, এসে পৌঁছুতে কখনও পারছে না। আলোক-বর্ত্মের মধ্যে নানাজাতীয় পতঙ্গের পক্ষস্পন্দন; কোন কোনটা সোজা উড়ে এসে গাড়ির উইণ্ড-স্ক্রীনের কাচের উপর আছড়ে পড়ছে। দূরে একজোড়া খরদ্যুতি লাল আলো নিমেষের জন্য ঝলক দিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল—শ্বাপদ-চক্ষুর রক্তসংকেত! শেয়াল কি খেঁকশিয়াল বোধ হয়—বাঘ হওয়াও বিচিত্র নয়। তৃণভোজী প্রাণীর চোখের আলো সবুজ রঙের হয়—তার দীপ্তিও খুব শান্ত, স্নিগ্ধ, স্তিমিত ধরনের।

মুখের সিগারেটে জোরে একটা টান দিয়ে সেই আলোয় হাতঘড়িটা একবার দেখে নিলাম। রাত অনেক হয়েছে—আড়াইটে বেজে গেছে।

হঠাৎ সামনে চেয়ে সবাই একসঙ্গে অবাক হয়ে গেলাম। ও কি! অত আলো কিসের? মেলা নাকি? কিন্তু এত রাত্রে এত আলো জালিয়ে খদ্দেরের আশায় মেলায় বসে আছে—এরা কেমন ধরনের দোকানী? আর মেলাই যদি হবে, ঐ অতখানি জায়গা জুড়ে যে মেলা বসেছে তার হৈ-চৈ হট্টগোল কই? শুধু আলোই দেখতে পাচ্ছি, মানুষের আনাগোনার কোন চিহ্ন তো কই চোখে পড়ছে না!

মেলা নয়, একখানা গ্রাম। মস্ত বড় গ্রাম, পথের দু পাশে অনেক দূর

ছড়িয়ে পড়ে আছে—বড় ছোট কোঠাবাড়ি কতকগুলো আছে, তা ছাড়া অধিকাংশই টিনের ঘর ও চালাঘর। চেহারা দেখে খুব দরিদ্র গ্রাম বলেও মনে হয় না।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দায় একটা করে হ্যারিকেন লণ্ঠন দব দব করে জ্বলছে। অধিকাংশ লণ্ঠন সদর দরজার চৌকাঠের বাইরে মেঝের ওপর বসানো আছে, তুই একটা দড়ি দিয়ে উপর থেকে ঝোলানো রয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে দেখলাম, এমন একটা বাড়িও কোথাও নজরে পড়ল না যেখানে আলো জ্বলছে না। আমরা যেখানে পথের উপর এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি ঠিক তার বাঁ ধারে একখানা ছোট দোচালা কুঁড়েঘর। সে ঘরের বাইরে কোন বারান্দাও নেই, ঘরের মালিকের বোধ হয় একটা লণ্ঠন কেনবার সামর্থ্যও নেই। কিন্তু তবু সদর দরজার পাশে খোলা জানালার চৌকাঠে একটা জ্বলন্ত কুপী বসিয়ে রেখে নিয়মরক্ষা ঠিকই করা হয়েছে।

সমস্ত গ্রাম নিষুতি। চারিদিকে অন্ধকার আমবাগানের বেষ্টনী—সেখানেও যেমন গ্রামের মধ্যেও তেমনি পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা থম থম করছে। একটি শিশু কোথাও কাঁদছে না, একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। অথচ সারা গ্রামখানা আলোয় আলোময় হয়ে যেন দাঁত বের করে হাসছে। বোবার মুখের হাসির মত অর্থহীন সেই হাসি।

এত আলো ভাল লাগছে না। মনের মধ্যে কেমন যেন ভয় ভয় করছে। গাড়ি যখন আলোক-চক্রের আওতা ছাড়িয়ে আবার সেই পরিচিত অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ল, সবাই মনে মনে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

চিনিবাবু আপন মনেই মন্তব্য করলেন, 'গাঁয়ে বোধ হয় চোরের উপদ্রব খুব বেড়েছে—তাই।'

হিতেনবাবু আপত্তি তুললেন, 'কিন্তু দেখেশুনে তো মনে হল, চোরের জন্যে সুবিধেই করে রাখা হয়েছে। চোর যদি বুদ্ধিমান হয় তো একরাত্রেই শ-তিনেক লণ্ঠন সরিয়ে ফেলতে পারবে—তাতেও রোজগার মন্দ হবে না।'

লাবুরও দেখলাম সমাধানটা তেমন পছন্দ হয় নি। সে বলল, 'চোরের উপদ্রব বাড়লে গাঁয়ের ছেলেরা রক্ষীদল গড়ে, লাঠি হাতে নিয়ে সারারাত গাঁ পাহারা দেয়—এই তো জানি। বাইরে আলো জেলে রেখে ঘরের মধ্যে পুড়ে ঘুমোনোর কথা কখনও শুনি নি।'

মাহুভাই বলল, 'চোরের ভয় নয়, ভূতের ভয়।'

কিন্তু এত বড় একটা গ্রামের সব লোক শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে একসঙ্গে ভূতের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে—কথাটা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, একটু যেন হাস্যকর বলেও মনে হল।

কিন্তু কারণ তো একটা নিশ্চয় আছে! বিনা কারণে একগ্রাম বাঙালী গৃহস্থ সম্পূর্ণ একমত হয়ে গাঁঠের কড়ি খরচ করে সারারাত ধরে কেরোসিন তেল পোড়াচ্ছে—পাগল ছাড়া এ কথা আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

মালদ'য় পৌঁছে আমরা কিছু কিছু খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এই অভিনব আলোকোৎসবের রহস্যভেদ করতে পারি নি।

গ্রামটার নাম পর্যন্ত জানতে পারি নি।

এই তো সেদিনের কথা।

দুপুরের পর বাঁকুড়া থেকে রওনা হয়েছি—উদ্দেশ্য দুর্গাপুর হয়ে এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরব, তার পর সন্ধ্যার কিছু পরেই কলকাতায় এসে পৌঁছুব।

সকলেরই মেজাজ খুব শরিফ—কুণ্ডুবাবুদের আতিথেয়তার প্রাচুর্য মাধুর্য ও আন্তরিকতা পাকস্থলীকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করার পর হৃদয় পর্যন্ত রসাপ্লুত করে তুলেছে। তখন সময় বা দূরত্ব কোন কিছু নিয়েই বেশি মাথা ঘামানোর মত মনের অবস্থা নয়।

ডান দিকে মোড় ঘুরে বেলিয়াতোড় আর বড়জোড়া হয়ে দুর্গাপুরে যেতে হবে; মোড়ের মাথায় 'টু দুর্গাপুর' লেখা দিশারী স্তম্ভও একটা আছে বলে মনে পড়ছে। সবই জানা আছে, কিন্তু দেহমন দুইই তখন আলস্যের আরামে শ্লথ হয়ে পড়েছে—সোজা পথ ধরে একটানা চলতে চলতে চোখ ও মস্তিষ্ক

ঝিমিয়ে আসছে। বুদ্ধিও অনেকটা যেন সহজিয়া-পন্থী হয়ে পড়েছে—যা সহজ তাইই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।

হুঁশ হল যখন, তখন দেখি পথটা গড়িয়ে গড়িয়ে ক্রমাগত নীচের দিকে নামছে। কই, ডান দিকে তো কোন মোড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না! সুতরাং আরও একটু এগিয়ে চল—আরও একটু—আরও একটু—

সামনে নদী—দামোদর; কিন্তু এ তো দুর্গাপুর নয়, পথ ভুলে সোজা মেজিয়ার ঘাটে এসে পৌঁছেছি। ওপারে রাণীগঞ্জ, বড় বড় কয়লাখনির চিমনি ও হেড-গিয়ারের উঁচু মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। ব্রিজ নেই, গাড়ি পার করবার খেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই—খানিকটা জল খানিকটা বালি, সন্তোষজনক ব্যবস্থা কিছু করাও সম্ভবপর নয়।

ঘোরাও গাড়ি। চল ফিরে। পথের বাঁ দিকের উপর এবার সকলেরই কড়া নজর—আবার ভুল না হয়।

ঐ তো মোড়! আর—হ্যাঁ, ঐ তো গাছের গায়ে কাঠের ফলকে পথনির্দেশ—'টু দুর্গাপুর'! 'ইউরেকা! ইউরেকা!' হারা পথ খুঁজে পেয়ে সবাই উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলাম।

মোড় পার হয়ে প্রায় বিশ মিনিট কাল চমৎকার পিচঢালা পথ ধরে ছুটে চললাম। তার পরই পথের চেহারা একদম বদলে গেল—উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও বা শুকনো কাদার সমতল, কোথাও বা বড় বড় গর্ত, আবার কোথাও বা হঠাৎ-উঁচু-হয়ে-ওঠা ইট আর খোয়ার দন্তবিকাশ। কাঁচা-পাকার সে এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। মোটরগাড়ির গতি গরুর গাড়ির সমপর্যায়ে নামিয়ে ফেলতে হল।

কারও ঠিক মনে পড়ছে না, যাবার সময় পথটা এই জায়গায় এই রকম খারাপ ছিল কি না। তা পথ তো মাঝে মাঝে এ রকম খারাপ হয়েই থাকে। সামনেই নিশ্চয় আবার ভাল পথ পাওয়া যাবে।

ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর আর কোন সন্দেহ রইল না—আবার পথ ভুল করেছি।

কিন্তু হিতেনবাবু বেঁকে বসলেন ; বললেন, 'গাড়ি আর কিছুতেই ফেরানো হবে না! দুর্গাপুরের রাস্তা যখন, দুর্গাপুরে ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে। পথ যত খারাপই হ'ক না কেন, এই পথেই যেতে হবে। একটু বেশি রাত্তির হয়ে যাবে—তা হ'ক, তাতে কি আর এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে আমাদের? বরং একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার হবে।'

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় 'মেলেড়া' অর্থাৎ মালিয়াড়া গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম। প্রকাণ্ড গ্রাম, বহু ভদ্রলোকের বসতি, মাঝখানে বিশাল কেল্লার মত পাঁচিলে-ঘেরা একটা প্রাচীন প্রাসাদের জীর্ণ কঙ্কালাবশেষ—এক প্রান্তে একটা ভদ্রগোছের চায়ের দোকানও আছে।

চা খেতে খেতে খোঁজ করে জানতে পারলাম, যতটা পথ এসেছি আরও প্রায় ততটা গেলে তবে আমরা বড়জোড়ায় দুর্গাপুরের পথে গিয়ে পড়ব। পথ আগাগোড়াই একরকম, তবে এই পথেই নাকি বাস যাতায়াত করে, এবং সেই বাসই মালিয়াড়া গ্রামের অধিবাসীদের বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবার একমাত্র উপায়।

মালিয়াড়া থেকে বেরিয়ে এসে পড়লাম একেবারে তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে। যত দূর চাই, শুধু মাঠ আর মাঠ—দিগন্তরেখার সুদূরতম প্রান্তেও কোথাও লোকালয়ের আভাস নেই। শস্যহীন চাষের জমি আর কাঁকুরে ডাঙা পাশাপাশি পড়ে আছে—একই রকম উদাস শূন্যদৃষ্টি মেলে বন্ধ্যা প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে চেয়ে আছে। পথে পথিক নেই, মাঠে একটা গরু-ছাগলও চরছে না। সূর্যাস্তের পর পৃথিবীর ফাঁকা রঙ্গমঞ্চ আস্তে আস্তে প্রদোষের অস্পষ্টতায় ভরে উঠছে।

আমাদের পথিক-জীবন দ্রুতলয়ের খেয়াল গানের মত। রোমাঞ্চের গমক যখন আসে তখন আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসে।—এবারও তাই হল।

চিনিবাবু হাত তুলে ডান দিকে কি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি?'

একটু সামনে, রাস্তা থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে, মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড

একটা অশ্বথ গাছ। তার নীচে একখানা পাল্কি—ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত পাল্কি নয়, নতুন রঙ-পালিশ করা বলেই মনে হচ্ছে; দু দিকের ডাণ্ডাদুটো চওড়া পিতলের পেটি দিয়ে বাঁধানো, সেগুলো দিব্যি ঘষা-মাজা—চকচক করছে। ভাড়াখাটা ছ্যাকড়া পাল্কি বলেও মনে হচ্ছে না, চেহারাটা বরং কোন পাড়াগেঁয়ে বড়লোকের শৌখিন যানের মত।

চিনিবাবু ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে ফেলেছেন।—'পাল্কির ভিতরে লোক রয়েছে!'—এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে তিনি দ্রুত সেইদিকে ছুটে চললেন।

এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! জনমানবহীন মাঠের মাঝখানে গাছতলায় পাল্কি ফেলে রেখে বাহকের দল কোথায় গেল? আর সেই পাল্কির ভিতর মানুষ!—নানা ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা ভেবে মনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমরা যতক্ষণে পাল্কির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি চিনিবাবু তার মধ্যে উবু হয়ে বসে পাল্কির মধ্যে উঁকি মেরে একবার দেখে নিয়েছেন, গাছটার চারিদিকে দ্রুত দুপাক ঘুরে এসেছেন, তার পর উর্ধ্বনেত্র হয়ে উপরের পত্র-পল্লবের ছায়াচ্ছন্ন জটিলতার মধ্যে তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টিনিক্ষেপ শুরু করে দিয়েছেন।

—'নাঃ—কোথাও কেউ নেই। কোথায় গেল ব্যাটারা?'

আশেপাশে কোথাও কোন পগার নেই, ডোবা নেই, পুকুর নেই, ঝোপঝাড় কিচ্ছু নেই, আর কোন বড় গাছ পর্যন্ত নেই—গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার কোন উপায় নেই।

পাল্কির মধ্যে ধোপদোস্ত চাদর-মোড়া নরম গদির বিছানায় ধবধবে ফুলকাটা ওয়াড়-পরানো তাকিয়া মাথায় দিয়ে কে একজন শুয়ে আছে। আপাদমস্তক আর একখানা সাদা চাদরে ঢাকা—স্ত্রী কি পুরুষ তাও বোঝবার উপায় নেই। তবে মৃত নয়, জীবিত—শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দেহের মৃদু আন্দোলন তার প্রমাণ দিচ্ছে।

রুগ্‌ণ? মাতাল? পাগল?—কিন্তু যা-ই হ'ক কেন, এমন সাজানো পাল্কিতে করে কারা ওকে এখানে নিয়ে এসেছে? আর এই নির্জন গাছতলায় এমনভাবে ফেলেই বা রেখে গেছে কেন?

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এমন করে বোকার মত কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকব? অথচ করাই বা যায় কি? রাধিকা মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, সে হঠাৎ বসে পড়ে পাল্কির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল—উদ্দেশ্য বোধ হয় লোকটার মুখের উপর থেকে চাদরের ঢাকনা সরিয়ে ফেলা।

চাদরের ভিতর থেকে গমগমে ভারী পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, 'গায়ে হাত দেবেন না—ভাল হবে না।'

রাধিকা তো এক লাফে তিন হাত ছট্‌কে গিয়ে দাঁড়াল। আমরা নির্বাক্ বিস্ময়ে এ-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলাম। লোকটা কি তাহলে বরাবর জেগেই ছিল, না এইমাত্র জেগে উঠল? আমাদের অবস্থাটা তখন শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় নয়, কিংবক্তব্যবিমূঢ়ও বটে।

আবার সেই অদৃশ্য মুখের বাণী শোনা গেল: 'আপনারা বোধ হয় বিদেশী লোক। যেখানে যাচ্ছেন চলে যান—আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমি কোন বিপদে পড়ি নি, আপনাদের সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে চাই, আপনারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে।'

এর পর আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। পায়ে পায়ে গাড়ির দিকে ফিরে চলেছি, এমন সময় পিছন থেকে শেষবারের মত শুনতে পেলাম, 'আর, হ্যাঁ—আর একটা কথা শুনে যান, আমি পাগলও নই।'...

বড়জোড়ার পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোককে আমাদের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলাম। গল্পটা শেষ হতে না হতেই একটা শুঁট্‌কো চেহারার আধা-ভদ্র ধরনের লোক চীৎকার করে উঠল, 'বলিহারি দাদা, বলিহারি—এমন না হলে গল্প! আমি নিমাই সাঁতরা—গুলপট্টির রাজা, অ্যাস্ত মাছে পোকা পড়াতে পারি; কিন্তু আপনি, দাদা, আমার ওপরেও এককাঠি! দিন গুরুদেব, অধম সেবককে একটু পায়ের ধুলো দিন।'

শ্রোতার দল হো-হো করে হেসে উঠল।...

নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। বড়দা সব কথা শুনে একবার বলেছিলেন, 'লোকটা বোধ হয় ডাকাতের দলের সর্দার—সেকালের রঘু ডাকাত বা বাবু বিশ্বনাথের মত।'

মানুভাই শুনে মন্তব্য করেছিল, 'হ্যাঁ, তাই সর্দারকে পাল্কিসুদ্ধ দিনের বেলা সদর রাস্তার ধারে গাছতলায় ফেলে রেখে দলের সব ডাকাত পাঁচ ক্রোশ দূরে বোধ হয় চড়িভাতি করতে কি চু-কিৎকিৎ খেলতে গিয়েছিল! আপনার যেমন কথা!'

লোকটা নিজে বলেছিল, 'আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে চাই।'—এ কোন্ ঘুমের কথা সে বলেছিল? তা হলে কি—

কিন্তু পাল্কি চড়ে আত্মহত্যা করতে কি আজকাল আর কেউ যায়? এক কালে যেত বটে বিয়ের বরেরা।

তবে বোধ হয় লোকটা সত্যিই পাগল ছিল। 'আমি পাগল নই'—লোক ডেকে একথা শুনিয়ে দেবার প্রয়োজন পাগলেরই সবচেয়ে বেশি। কি জানি!

দশ

ভাল গাড়ি এ সব পথে চলে না, তাই আগে থাকতে মতলব করে একটা জীপ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। গুয়ায় এসেছি টাটানগর চাঁইবাসা নোয়ামুণ্ডি বড়জাম্দা হয়ে; পথ খুব ভাল না হলেও মোটামুটি সমতল—চড়াই-উৎরাইএর বালাই বেশি নেই। ফেরবার পথে নোয়ামুণ্ডি পর্যন্ত যাব সারান্দার পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, কুমডি আর থলকোবাদ ঘুরে।

গুয়ায় একটা দিন বিশ্রাম। বাগচী-ভ্রাতৃগণের নেতৃত্বে এখানকার ক্ষুদ্র বাঙালী-উপনিবেশটির আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদের আতিথ্য-সৎকার ও প্রীতিসাধনের প্রচেষ্টায় যে রকম উঠে পড়ে লেগে গেছেন তাতে মাঝে মাঝে

আশঙ্কা হচ্ছে, হয়তো এই হঠাৎ-জড়িয়ে-পড়া মায়ার বাঁধন কেটে যথাসময়ে পথে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হবে না।

কিন্তু বাঁধন কাটতেই হবে, কাল সকালে রওনা হতেই হবে। পথের চেয়ে আশ্রয়কে বেশি মূল্যবান বা বেশি মধুর বলে মনে হলে আমাদের এই যাযাবর-বৃত্তির আসল উদ্দেশ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ব।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার প্লাবন নামছে আকাশ থেকে। কল্লোল-মুখরা খরস্রোতা কারো নদী দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্মাগ্র ত্রিভুজের মত ছোট্ট একটি উপলাকীর্ণ দ্বীপভূমি রচনা করেছে। তারই উপর আমরা চারটি প্রাণী চন্দ্রাহতের মত চুপ করে বসে আছি। সামনের অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়গুলোর মধ্যে ছায়াচ্ছন্ন রহস্য নিবিড় হয়ে উঠেছে; ডান দিকের রেলওয়ে ব্রিজটা হুইস্‌লারের আঁকা একখানা ছবির মত দেখাচ্ছে; তার ওধারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আর এক সার পাহাড়, ঝিলিং-বুরু, বনমালী-বুরু, হঞ্জুদারি-বুরু—বুকে আর মাথায় বিজলি-বাতির মালা পরে অকাল-দীপালির শোভা ধারণ করেছে। ঐ সব পাহাড়ের উপর দিনরাত কাজ চলছে। পাহাড়ের মাথা ফাটিয়ে পাথর সংগ্রহ করা হচ্ছে; সেই পাথর টবে ভর্তি হয়ে চংক্রমণরত লৌহরজ্জু অবলম্বন করে দুলতে দুলতে দু হাজার ফুট নীচে রেলওয়ে সাইডিঙের উপর নেমে আসছে; তার পর সেখান থেকে রেল-গাড়িতে চড়ে সোজা বার্নপুরের বহ্নিকুণ্ডের দিকে চলে যাচ্ছে। এই পাথরের মধ্যে আছে লোহা—সোনার চেয়ে দামী, হীরের চেয়ে দামী জিনিস—শিল্প-সমৃদ্ধির যক্ষপুরীর সদর দেউড়ি খুলে ফেলবার একমাত্র চাবিকাঠি। লোহার চাকা না হলে আধুনিক সভ্যতার এঞ্জিন একদিনেই অচল হয়ে পড়বে।

কর্মের ব্যস্ততা আছে, কিন্তু উত্তাপ নেই; গতি আছে, কিন্তু আলোড়ন নেই। অরণ্য-পর্বতের ছায়ায় এসে যন্ত্রদানব তার উগ্রতা হারিয়ে ফেলেছে, প্রকৃতিদেবীর নিজের হাতে পরানো শ্যামাঞ্জন তার রোষরক্তিম চক্ষুর দৃষ্টি স্নিগ্ধ

করে তুলেছে। প্রতিদিন ভোরবেলা ঐ পাহাড়গুলোর উপর থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়—বারুদ ডিনামাইট ও জেলিগ্নাইটের কঠোর সংঘাতে পাহাড়ের পর পাহাড় বুকফাটা হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু আকাশ ও উপত্যকার অপরিসীম বিস্তারের মধ্যে সে আওয়াজও যেন কেমন স্তিমিত হয়ে পড়, সুদূর মেঘগর্জনের মত মৃদু-গম্ভীর শোনায়।·····

বড় বাগচী মশায় উঠে গেলেন আমাদের নৈশ ভোজনের আয়োজন সমাধা করবার জন্য। আমরা তিনজন তখনও অর্ধ-তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বসে বসে লাস্তবিহ্বলা কারো-র ফেনমঞ্জীরের সেই অপরূপ শিঞ্জনধ্বনি শুনতে লাগলাম।

বেলা আটটার মধ্যে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম। সঙ্গে মাত্র একবেলার মত খাদ্যদ্রব্য থাকল, কারণ পথে যতই দেরি করি না কেন সন্ধ্যার অনেক আগে গিয়ে নোয়ামুণ্ডিতে পৌছুতে পারব—একটানা গেলে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবার কথা নয়।

বড় ইচ্ছা ছিল জঙ্গলের মধ্যে কোন একটা ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করব, কিন্তু তা হল না। দরখাস্ত একখানা করা ছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত তদ্বির-তাগাদার অভাবে সে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নি। সরকারী অনুমতিপত্র সঙ্গে না থাকলে বনবিভাগের ডাকবাংলোয় প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না।···

পথ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠছে, ছড়ানো ছিটনো লোকালয় দু পাশে ফেলে আমরা ক্রমশ বিরলবসতি অঞ্চলের মধ্যে এসে পড়ছি। বনবিভাগের গেট পার হবার পর দশ মিনিটের মধ্যেই সংরক্ষিত বনভূমির মধ্যে এসে পড়লাম।

কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল; মনের চিন্তাও হঠাৎ যেন গান হয়ে উঠল—ধ্রুপদের উদার সুরের প্রশস্ত আকাশে ডানা মেলে দিয়ে ঊর্ধ্বলোকে উধাও হয়ে যেতে চাইল।······

সব পিছনে ফেলে এলাম। বিরামহীন কর্মকোলাহলের পুঞ্জীভূত সন্তাপ, সামাজিক দেনাপাওনার ছোট ছোট গ্লানি, চিমনির ধোঁয়া আর ক্ষেতের

সোনালী ধান, বনমালী-বুরুর লোহা আর ঝিলিং-বুরুর ম্যাঙ্গানিজ, কুকুর আর মোরগের ডাক, দূরের আদিবাসী গ্রাম থেকে ভেসে আসা মাদলের অস্পষ্ট মধুর ঢক্কাধ্বনি—সব রইল পিছনে পড়ে। আমরা এগিয়ে চলেছি খাড়া চড়াইএর বাঁক ঘুরে ঘুরে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে, নির্জনতা থেকে নিবিড়তর নির্জনতার মধ্যে। সারান্দার মহারণ্য তার লক্ষ বাহু বিস্তার করে আমাদের নীরবে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছে।

সারান্দা! তার হিমশীতল ছায়ার ফাঁদে বন্দী হয়ে আছে সৃষ্টির আদিমতম রহস্যের নিগূঢ়তা। তার অযুত-নিযুত মহীরুহের প্রত্যন্তশীর্ষে ফুটে আছে সৃষ্টির উদাত্ততম উপাসনার ফুল। তার আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথের পাথরে-কাঁকরে বেজে ওঠে সৃষ্টিছাড়া নিরুদ্দেশ যাত্রার আহ্বানের সুর।

সারান্দা! তার গভীরতম গহনে নাকি ধরিত্রীচারী মেঘমালার মত হস্তিযূথ সঞ্চরণ করে; ক্রুদ্ধ বাইসনের বিষাণ-তাড়নায় অরণ্যভূমি বিধ্বস্ত হয়ে যায়; পাহাড়ী অজগরের অলস-পিচ্ছিল কুণ্ডলি হিংসার ক্রূরতায় হিল্‌বিল্ করে ওঠে। তার নৈশ নিস্তব্ধতা সচকিত করে জেগে ওঠে শম্বর-মৃগের ভাঙা-ভাঙা কাঁপাগলার বিচিত্র হ্রেষাধ্বনি, কোট্‌রার কর্কশ চীৎকার, আর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি-জাগানো ব্যাঘ্র-গর্জন।

আমাদের জীপগাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড় বেয়ে উঠছে। অরণ্যের অতলস্পর্শ প্রশান্তির মধ্যে তার এঞ্জিনের গোঙানি নিঃশেষে হারিয়ে যাচ্ছে—সমুদ্রের বুকে ভাসানো খোলা ডিঙির উপর ছোট্ট শিশুর কান্নার মত। আমরা তিনটি প্রাণী গুটিসুটি হয়ে বসে আছি; মুখের ভাষা, মনের চিন্তা, স্নায়ুমণ্ডলীর চাঞ্চল্য—সব স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সহসা মনে হল, অরণ্যের সব নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে যেন একটা মৃদু অস্ফুট গুঞ্জরণ ভেসে উঠছে; অব্যক্ত বাণীর আকুলতার আবেগে বিপুল বনভূমি যেন শিউরে শিউরে উঠছে। আমার মনেও সেই শিহরণের ছোঁয়াচ এসে লাগছে। বোঝা-না-বোঝার মাঝখানে দোল খেতে খেতে কোন্ এক ভুলে-যাওয়া ভাষার স্বপ্ন-ব্যাকরণের সূত্রগুলো আওড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছি।—সে

ভাষা বুঝি আদিম প্রাণবীজের ভাষা, আমার শিকড় আর সাল্লন্দার শিকড় অতীতের যে অন্ধগুহায় নেমে গিয়ে একত্র জড়িয়ে গেছে, সেই অতল অবচেতনার ভাষা।

সাসান্দা-বুরুর পাদভূমি বেষ্টন করে জীপ ছুটে চলেছে—এবার নীচের দিকে উৎরাইএর পথে। বাঁ দিকে ক্রমোচ্চ পর্বত-সানুর উপর ঘনশ্যামল লতাগুল্মের দুর্ভেদ্য জটিলতা, আর শত শত বিশালকায় সুপ্রাচীন বনস্পতি-কাণ্ডের সমান্তরাল স্তম্ভ-সন্নিবেশ; ডাইনে সুগভীর খদ বিটপিশীর্ষের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেছে—যতদূর দৃষ্টি যায়—ছায়ান্ধকার রহস্যময় সঙ্কীর্ণ উপত্যকার অন্তঃপুরচারিণী নাম-না-জানা গিরিনদীর তীরভূমি পর্যন্ত। খদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সাদা প্রজাপতির ঝাঁক—যেন উড়ন্ত কুয়াশা। খদের ওপারে তরঙ্গায়িত গিরিশ্রেণী, গম্ভীর, নিশ্চল,—সূক্ষ্ম নীলাভ ধোঁয়ার ওড়নায় সর্বাঙ্গ ঝেঁপে বসে আছে।...

আমরা এসে থেমেছি কুমডির ক্ষুদ্র অধিত্যকা-ভূমিতে, অরণ্যবিহারিণী কোইনা-নালার ধারে। আমি একখানা পাথরের উপর বসে জলস্রোতের মধ্যে দুই পা ডুবিয়ে চুপ করে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছি। চিনিবাবু গাড়ির সামনের সীটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে একমনে সিগারেট টানছেন। লাবু আশেপাশে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।—আমার মনের মধ্যে এতকালের বোবা কবিটা আবার প্রলাপ বকতে শুরু করেছে।

নুয়ে-পড়া পত্রপল্লবের ছায়াচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ থেকে কৃষ্ণাভ-পিচ্ছিলদেহা সর্পিণীর মত বেরিয়ে এসেছে কোইনা নালার জলপ্রবাহ। তৈলাক্ত মসৃণ তার গতি, পরম ঔদাসীন্যে মন্থর। ধারাধনুটি ঈষৎ বাঁকিয়ে আবার সে হারিয়ে গেছে নিগূঢ় বনান্তরালের অন্ধগুহার মধ্যে। যাবার আগে শুধু তীরশৈলে পুচ্ছ-তাড়নায় জাগিয়ে গেছে ফেনমর্মরের মৃদু বিদ্রূপের চাপা হাসি। এই অন্ধকারচারিণী অপীনদেহা স্রোতস্বিনীটিকে বড় রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ওর মধ্যে কোন্ এক মায়ামন্ত্রসিদ্ধা জাদুকরী নিশীথিনীর নিশির ডাকের অপেক্ষায় চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে। মধ্যরাত্রির

নিস্তব্ধতা যখন নিঝুম হয়ে আসবে তখন সে তার শিলাশয্যা ছেড়ে অরণ্যের রঙ্গমঞ্চে উঠে আসবে। অঙ্গের বারি-নির্মোক খসে পড়বে—শুরু হবে মধুক-প্রমত্তা নগ্না নটিনীর ডাকিনী-নৃত্য। মাথায় দুলবে কাকপক্ষের কৃষ্ণচূড়া, পায়ে বাজাবে নৈঃশব্দ্যের নূপুর—রিমি-ঝিম্-ঝিম্ রিমি-ঝিম্-ঝিম্।

কাব্যানুভূতির উচ্ছ্বাসে গা-ঢেলে-দেওয়া মনের উদ্দাম কল্পনাবিলাসে হঠাৎ বাধা পড়ল। লাবু এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে একটা জংলী গোছের ছোকরা; তার ডান হাতে কাঁড়-বাঁশ, বাঁ হাতে একজোড়া বেশ 'পুরুষ্টু' চেহারার বনমোরগ—বোধ হয় এইমাত্র ফাঁদ থেকে বের করে ঘাড় মটকে মেরে নিয়ে এসেছে। লাবুর মুখচোখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম, ঐ দুটি জীবের প্রাণহীন দেহ ঘিরে সে এর মধ্যেই সুমধুর কল্পনার জাল বুনতে আরম্ভ করে দিয়েছে, সুদূর সম্ভাবনার প্রত্যাশায় তার মনের রসনা এর মধ্যেই রসার্দ্র হয়ে উঠেছে। সুতরাং সামান্য একটু দর-কষাকষির পর একটাকা মূল্য দিয়ে পাখি দুটোকে হস্তগত করে ফেললাম। তার পর ছেলেটাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে আস্তে আস্তে তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেললাম।

এরা জাতিতে হো—নিজেদের জাতভাষা ছাড়া হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষাতেও স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারে। অনেক কথা হল। ছোকরার বাড়ি এই জঙ্গলের মধ্যে, ঝিস্তাড়ু গাঁয়ে—এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে। জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদের এমন অনেক গ্রাম আছে। জঙ্গলে পয়সা নেই বটে, কিন্তু খাদ্যের অভাব নেই। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে ক্ষেত আছে, তার জমি এত ভাল যে তাতে নাকি বছরে তিনবার ধান হয়—ফলনও হয় প্রচুর। ছোট-খাটো শিকার অনেক পাওয়া যায়, ফাঁদ পাতলে কিংবা কাঁড়-বাঁশ নিয়ে বেরুলে কখনও খালি হাতে ফিরতে হয় না। তা ছাড়া বনের মধ্যে নানাজাতীয় চুপড়ি আলু ও 'কাঁদা' অর্থাৎ কন্দ পাওয়া যায়—পেট চালাতে বিশেষ বেগ কারও পেতে হয় না। আজকাল গাঁয়ের মরদেরা ক্ষেতের কাজ না থাকলে গুয়া চিড়িয়া বড়জামদা বা নোয়ামুণ্ডি চলে যায়, কাঁচা পয়সা রোজগার করে

নিয়ে আসে। তবে এ সব গাঁয়ের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল হয় না—জরজালা লেগেই আছে, পঞ্চাশ-ষাট বছরের চেয়ে বেশি বুড়ো লোক কোন গাঁয়েই বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ী নদীনালার জল নাকি বড় খারাপ, পেটের ব্যারাম হয়—ছেলেমেয়েরা রক্তামাশায় ভোগে, মারাও যায় অনেকে।

ছোকরার নাম ভিখুয়া। বাপ-মা কেউ নেই, গাঁয়ে ঘরবাড়িও নেই। এইখানে এই কুমডিতেই থাকে, ভগ্নীপতির সংসারে। ভগ্নীপতি বনবিভাগে কাজ করে, ডাকবাংলোর পাশেই একখানা কুঁড়ে ঘরে থাকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা তুই করিস্ কি ?'

—'চাষের সময় ক্ষেতে কাজ করি, আর অন্য সময় এমনি বনে বনে ঘুরে বেড়াই—গুলতি দিয়ে হরিয়াল আর ঘুঘু মারি, ফাঁদ পেতে বনমোরগ আর তিতির ধরি, কাঁড়-বাঁশ দিয়ে মারি শজারু আর শশা (খরগোশ)। নালায় ছাঁকনি দিয়ে মাঝে মাঝে চুনো মাছও ধরে থাকি।—ভগ্নীপতি বলেছে, বড় হলে জঙ্গল-সরকারের একটা নোকরি ঠিক করে দেবে। তখন বিয়ে করব, গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ঘর বাঁধব।'

কুহকিনী আশা এই সৃষ্টিছাড়া মুলুকের ছন্নছাড়া ছেলেটার মগজে এসেও বাসা বেঁধেছে !

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস, তোর ভয় করে না ?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের ভয় ?'

—'কেন, বাঘের ?'

—'বাঘে তো বাবু মানুষ খায় না।'

—'বলিস কি রে ! বাঘে মানুষ খায় না তবে কিসে খায় ?'

—'না বাবু, বাঘে মানুষ খায় না—চিথল খায়, শম্বর খায়, বরা খায়, বাগে পেলে বুনো মহিষ মেরেও খায়, কিন্তু মানুষ খায় না। দু-একটা বাঘ মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে মানুষ খেতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু তারা জঙ্গলে এসে

পৌঁছুবার আগেই হুটিস্ পড়ে যায়, জঙ্গলের মানুষদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়। তার পর বন্দুক নিয়ে শিকারী সাহেব আর বাবুলোকেরা সব এসে পড়ে। মানুষ-খেকো বাঘ হয় মারা পড়ে, আর না হয় তো মুলুক ছেড়ে পালিয়ে যায়।'

—'তা হলে কি তোদের জঙ্গলে ভয়ের জিনিস কিছুই নেই?'

একটু ভেবে উত্তর দিল, 'আছে বৈকি বাবু, এখানে বড় সাপের ভয়। খরিস আছে, করেত আছে, চন্দ্রবোড়া আছে, কালনাগ আছে, আর আছে পাহাড়ী ময়াল। কালনাগের কামড়ে হাতি টলে পড়ে যায়—দশ মিনিটের মধ্যে মরে যায়। মানুষকে কামড়ালে "উঃ!" বলবার সময় মেলে না—সঙ্গে সঙ্গে খতম। বিষের এমন জোর বাবু, যে নাক বসে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, চোখের মণি ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়, মাথার হাড় গলে নরম তুলতুলে হয়ে যায়।'

একটু আধটু অতিরঞ্জন থাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারলাম, হামাড্রায়াড বা শঙ্খচূড় সাপের কথা বলছে।

—'আর ময়াল—', ভিখুয়ার সর্বশরীর শিউরে উঠল,—'ময়ালের বিষ নেই, কিন্তু বাবু, আমাদের এ অঞ্চলের ময়াল সাপ সাক্ষাৎ যম। ঝড়াৎ করে লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরে পাকে পাকে পেঁচিয়ে ফেলে, পিষে হাড়গোড় গুঁড়ো করে একটা মাংসের পিণ্ডি বানিয়ে ফেলে, তার পর আস্ত গিলে খায়। আমাদের গাঁয়ের ভুলন সর্দারের জামাইকে ময়ালে ধরেছিল—জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে একেবারে ঘাড়ে পা দিয়ে ফেলেছিল। সর্দার একটু দূরে ছিল, জামাইএর চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখে ময়াল তখন তিন পাক কষে দিয়েছে। সর্দারের হাতে ছিল কাঁড়-বাশ, তখুনি বুদ্ধি করে বিষ-তীর দিয়ে সাপের মাথা ফুঁড়ে দিল, তার পর চেঁচাতে চেঁচাতে গায়ে ফিরে গেল। গাঁয়ের লোক দল বেঁধে হাতিয়ার নিয়ে ছুটে গিয়ে দেখতে পেল, সাপ মরে গেছে, কিন্তু জামাইকে তখনও শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে আছে! দা-কুড়ুল দিয়ে সাপকে টুকরো টুকরো করে কেটে তবে তাকে বের করে আনা হয়, কিন্তু জামাইকে তখন আর জামাই বলে চেনবার কোন উপায় নেই।

চিনিবাবু গুটি গুটি জীপ ছেড়ে এসে আমার পাশে বসে পড়েছেন—গল্প শুনছেন আর সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছেন। শ্রীমান লাবুর মুখের চেহারা অবর্ণনীয়—কৌতূহলে, আতঙ্কে তার প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছে। হাঁ করে যেন ভিখুয়ার কথা গিলছে।

আবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'তা তোর কি সাপের ভয়ও করে না?'

—'না—আমি যে সাপের গন্ধ পাই।'

—'সাপের গন্ধ! সাপের আবার গন্ধ কি রে?'

—'সে আছে একরকম, মিঠে মিঠে মেটে মেটে গন্ধ। সবাই পায় না, আমি পাই। জঙ্গলের যেদিকটায় ঐ রকম গন্ধ ছাড়ে সেদিকটা এড়িয়ে চলি।'

এইবার চিনিবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আর হাতি?'

—'হাঁ বাবু, হাতি এ জঙ্গলে অনেক আছে, আর ঐ জানোয়ারটার চাল-চলনও খুব বেখাপ্পা ধরনের। তবে এক দলছাড়া গুণ্ডা হাতিই তাড়া করে মানুষ মারে। দল বেঁধে যেসব হাতি নামে তাদের সামনে থেকে সরে গেলেই আর প্রাণের ভয় থাকে না। কিন্তু ওরা মানুষের বড় নুকসান করে। ক্ষেতের ধান খেয়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে মাড়িয়ে তচ্‌নচ করে দেয়, বাগিচার গাছপালা ভেঙে-চুরে লোপাট করে ফেলে, আর কুঁড়েঘর দেখলেই ঢুঁ মেরে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় —ঘরের মধ্যে তৈরি চাল পাবে এই লোভেই ওরা ঘর ভাঙে। এমনও হয় যে হাতির পাল চলে যাবার পর গাঁয়ে আর একখানা ঘরও খাড়া থাকে না। আর-বছর এই কুমডিতেই হাতি নেমেছিল—আমাদের ঘরদোর সব গুঁতিয়ে ভেঙে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে ফেলেছিল, ডাকবাংলোর পিছনের কলা আর কমলালেবুর বাগানের একটা গাছও আস্ত রাখে নি। আমরা সবাই বাংলো-বাড়ির মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছিলাম—বড় বড় মশাল জেলে সেইগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর টিন-ক্যানেস্তারা পিটিয়ে পিটিয়ে সারারাত জেগে কাটিয়েছিলাম।'

তার পর ভিখুয়া ভূতের কথা বলতে শুরু করল। এ জঙ্গলে নাকি অসংখ্য ভূতের আস্তানা আছে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের মত উঁচু তাদের চেহারা;

বড় বড় গোল গোল চোখ রাত্রে মশালের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে ; জ্যান্ত বনবরা ধরে একহাত লম্বা লম্বা ধারালো দাঁত দিয়ে কচ্ মচ করে চিবিয়ে খায় ; হাতির পায়ের তিনগুণ মোটা মোটা পা ফেলে পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যখন থপ থপ করে হেঁটে যায়, তখন মাটি কেঁপে ওঠে, গায়ের ধাক্কা লেগে বড় বড় গাছ পট্ পট্ করে ভেঙে যায়। প্রত্যেক গ্রামে দুজন একজন করে গুনিন্ আছে তাই রক্ষে, নইলে ভূতের উপদ্রবে সব্বাইকে জঙ্গলের গাঁ ছেড়ে কবে পালিয়ে যেতে হত। এই সব গুনিন্‌রা নানান রকম মন্তর-তন্তর জানে, মাসে একবার করে ভূতের পূজো দেয়, মোরগ বলি দিয়ে তার রক্ত ছিটিয়ে গাঁয়ের চারিদিকে গণ্ডি কেটে দেয়—এই গণ্ডি পার হয়ে ভূত গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে পারে না। তাই এই গুনিন্‌দের উপরেই ভূতের সবচেয়ে বেশি রাগ। বাগে পেলেই হয় ঘাড় মট্‌কে মেরে ফেলে ; আর না হয় তো দূর থেকেই গায়ের রক্ত সব চুষে খেয়ে নেয়—তখন সে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, কথা বলতে পারে না, খেতে পারে না—তিনদিনের মধ্যে মরে যায়। কাউকে কাউকে আবার জঙ্গলের মধ্যে মাথায় টোকা মেরে পাগল করে দেয়।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। নালার ধারে বসেই বাগ্‌চী-ভ্রাতাদের গুছিয়ে দেওয়া সুখাদ্যগুলোর সদ্ব্যবহার করা গেল। তার পর থলকোবাদের দিকে রওনা হলাম।

পথে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো ধানক্ষেত নজরে পড়ল। তাদের কতক-গুলোয় সবে মাত্র চাষ পড়েছে, আবার কতকগুলোয় দুহাত উঁচু ধানের চারা লক্‌লকিয়ে উঠেছে। পাহাড়ী বহাল জমি, সারা বছর সমান জল পায়—বছরের যখন-তখন চাষ করা চলে।

প্রত্যেকটা ক্ষেতের চারপাশে ছোট ছোট ছুঁচলো-মুখ শালের রলা বাইরের দিকে হেলিয়ে সারবেঁধে পুঁতে দেওয়া রয়েছে—হাতির উপদ্রব থেকে শস্য রক্ষা করবার জন্য। জঙ্গলের এদিকটায় হাতির উপদ্রব সত্যিই খুব বেশি।

আমাদের মধ্যে কেমন একটা গয়ংগচ্ছ ভাব এসে পড়েছিল—থলকোবাদেও

অনেকটা দেরি হয়ে গেল। অবশ্য জায়গাটা এমন যে একবার চোখ বুলিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া অসম্ভব। সমগ্র সারান্দা রেঞ্জ-এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এই থলকোবাদ। তারই চূড়ার উপর বনজঙ্গল কেটে অনেকখানি সমতল জমি বের করে নিয়ে বনবিভাগের এই ছোট্ট সুন্দর ডাকবাংলোটি তৈরি করা হয়েছে। বাংলোর ভিতর ঢোকবার আমাদের অধিকার নেই, আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম—শহরের দেয়ালে দেয়ালে টক্কর খেয়ে ভোঁতা হয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তিকে সুদূর দিগন্ত-বেষ্টনীর শান-পাথরে নতুন করে শানিয়ে নিলাম।

মনে হতে লাগল যেন আমাদের চারিপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সুনীল উর্মিমালা নিস্তব্ধতার জাদুদণ্ডস্পর্শে হঠাৎ নিশ্চল নিথর হয়ে গেছে—এখনই হয়তো ইন্দ্রজাল অপসারিত হয়ে যাবে, আবার উন্মত্ত কোলাহলে আকাশ কাঁপিয়ে ঐ অন্তহীন বারিবাহিনী থলকোবাদের এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির তীর-শৈলের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কত দেখব? কখন দেখব? দেখবার জগৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে—কিন্তু জীবন বড় ছোট, অবসর বড় কম।

থলকোবাদ থেকে রওনা হতে হতে বেলা চারটে বেজে গেল। খোলা আকাশের তলা থেকে জঙ্গলে এসে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম—এর মধ্যেই সেখানে অপরাহ্ণের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। এখনও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হবে, বাইরে সূর্যাস্ত হবার আগেই হয়তো পথে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে পড়বে। চিনিবাবু বললেন, 'আর গড়িমসি করা চলবে না—গাড়ি জোরে চালিয়ে একছুটে নোয়ামুণ্ডি গিয়ে পৌঁছুতে হবে।'

পা দিয়ে অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরতেই গাড়ির এঞ্জিনটা বার কয়েক খক্ খক্ করে কেসে উঠল, তার পর দু বার জোর হ্যাঁচ্কা দিয়ে আস্তে আস্তে কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে গাড়ি থেমে পড়ল। চিনিবাবু আবার স্টার্ট দিলেন, আরও কয়েকবার কাসির আওয়াজ ছাড়া এঞ্জিনের কাছ থেকে কোন সাড়া মিলল না।

চিনিবাবু নেমে পড়ে গাড়ির বনেট তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এঞ্জিনের অন্দরমহলের মধ্যে চেয়ে রইলেন, তার পর ঈষৎ অন্যমনস্ক সুরে বললেন: 'যন্ত্রপাতির ব্যাগটা দিন তো!'

বুঝলাম, ব্যাপারটা একটু জটিল, বেশ কিছু সময় নেবে। মনে মনে ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম।

কিন্তু ব্যাগ কই? কোথাও সে ব্যাগ খুঁজে পেলাম না। চিনিবাবু আবার এসে ভিতরে ঢুকলেন, তিনজনে মিলে আতিপাতি করে গাড়ির মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা খুঁজলাম—কিন্তু ব্যাগের পাত্তা পাওয়া গেল না। উদ্বেগ ধীরে ধীরে আশঙ্কায় পরিণত হতে লাগল। গাড়ির মালপত্র নামিয়ে ফেলে বিছানা সুটকেস খুলে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, কিন্তু নাঃ—ব্যাগ নেই। পথে কোথাও ফেলে এসেছি—হয়তো জমশেদপুরে, হয়তো চাইবাসায়, হয়তো বা গুয়াতেই!

চিনিবাবু হতাশ ভাবে জানিয়ে দিলেন, যন্ত্রপাতি না পেলে এঞ্জিন মেরামত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সঙ্গে তাঁর একখানা ছুরি পর্যন্ত নেই, সব সেই ব্যাগের মধ্যে।

—'তা হলে এখন উপায়?'

—'উপায় কিচ্ছু নেই। গাড়ি বেশ ভাল রকম জখম হয়েছে। এইখানেই পড়ে থাকতে হবে। তবে এ সব পথে কাঠের লরি যাতায়াত করে মাঝে মাঝে, তাদের একখানা এসে পড়লেই একটা সুরাহা হয়ে যাবে।'

বিশেষ কোন আশ্বাস পেলাম না। সন্ধ্যা হয়ে এল। যদি কোন কাঠের লরি সত্যিই এদিকে এসে থাকে এতক্ষণে নিশ্চয় লোকালয়ে ফিরে গেছে। মনের মধ্যে আতঙ্কের ভিড় জমে উঠতে লাগল, কিন্তু লাবুর দিকে চেয়ে মুখ ফুটে কিছু বললাম না। ভয়ে বেচারার মুখ শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে, একটা কথা উচ্চারণ করবারও যেন আর সামর্থ্য নেই। অত্যন্ত অসহায় ভাবে একবার আমার দিকে একবার চিনিবাবুর দিকে তাকাচ্ছে।

মালপত্র আবার বেঁধেছেঁদে গাড়িতে তুলে দিলাম। তার পর লাবুকে

সামনের সীটে বসিয়ে দিয়ে আমরা ছুজন মুখে সিগারেট আর মনে ছুশ্চিন্তার পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে পথের উপর পায়চারি করতে লাগলাম। মনে মনে ঠিক বুঝে নিয়েছিলাম, এইখানে এই ভয়াবহ অরণ্যের মধ্যে জীপ-গাড়িতে বসেই সারারাত কাটাতে হবে। কিন্তু এ রাত কি সত্যিই কাটবে?…

জঙ্গলের ছায়া ক্রমশ ঘোরালো হয়ে আসছে, গাছপালার স্থনিবিড় জটিলতার মধ্যে চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে। ঘড়িতে মাত্র পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট। কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই নীরন্ধ্র অন্ধকারের যবনিকা আমাদের চারিদিক ঘিরে ফেলবে।

দিবানিদ্রার বিশ্রান্তির পর এতক্ষণে বোধ হয় অরণ্যচারী শ্বাপদের দল একে একে বেরিয়ে পড়ছে শিকারের সন্ধানে। ভিখুয়া আশ্বাস দিয়ে গেছে, বাঘে নাকি মানুষ খায় না; আর তার শালগাছ-প্রমাণ রাক্ষুসে ভূতের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না;—কিন্তু হাতি? রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে হাতির পাল এই পথ ধরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নামতে নামতে যদি আমাদের জীপ-গাড়িতে বাধা পায়?—পাশের স্থগভীর খদের দিকে চেয়ে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল। তা ছাড়া ভালুক আছে, চিতা আছে, অসংখ্য বিষধর সাপ আছে—সারান্দার জঙ্গলে তো মৃত্যুদূতের অভাব নেই।

অপ্রত্যাশিত বিপদ যখন সত্যিই ঘাড়ের উপর এসে পড়ে মানুষের মন তখন একটা অদ্ভুত অযৌক্তিক একগুঁয়েমির সঙ্গে ক্রমাগত তাকে অস্বীকার করতে থাকে—ছেলেমানুষের মত ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, 'এ হতেই পারে না, কিছুতেই হতে পারে না, এ বিপদ যাবেই কেটে।' আমাদেরও তখন সেই অবস্থা। কেবলই ভাবছি, উপায় একটা-কিছু নিশ্চয় হবে—এমন অসহায় ভাবে মৃত্যুর সিংহদ্বারে বসে প্রহর গুনে গুনে আমাদের রাত কাটাতে হবে না নিশ্চয়।

অপরাহ্ণের নীলাভ ক্ষীণ দীপ্তি ক্রমে ক্রমে মসীকৃষ্ণ হয়ে আসছে, পায়ের নীচে পথরেখাও আর স্পষ্ট দেখা যায় না। লামুকে মাঝখানে রেখে আমরা ছুজন ছুদিকে গাড়ির সামনের সীটে উঠে বসলাম। এমনি ভাবেই হয়তো

সারারাত বসে থাকতে হবে। ফ্ল্যাস্কে যেটুকু চা ছিল ঢেলে ভাগাভাগি করে খেয়ে নিলাম। সঙ্গে আর খাদ্যদ্রব্য নেই, কিন্তু খিদেও নেই—খিদে অনুভব করবার শক্তিই বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছি আমরা ততক্ষণে।…

চিনিবাবু নাক দিয়ে জোরে জোরে বারকয়েক নিশ্বাস টেনে সহসা বলে উঠলেন, 'কিসের একটা গন্ধ আসছে না? কেমন যেন পচা পচা মিঠে মিঠে একটা গন্ধ!'

সবাই যে গন্ধ পায় না ভিখুয়া তা পায়। চিনিবাবুরও সেই ক্ষমতা আছে না কি! অনুভবে বুঝলাম লাবুর সর্বশরীর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। লাবুও বোধ হয় ভিখুয়ার মুখে শোনা সেই সব গল্পের কথাই ভাবছে। গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার পর থেকে এ পর্যন্ত সে একটা কথাও বলে নি।

পায়ের ধাক্কায় কি একটা জিনিস খড়মড় করে উঠতেই কথাটা মনে পড়ে গেল। একটু হেসে বললাম, 'ও কিছু না। পায়ের কাছে খবরের কাগজে জড়ানো সেই বনমোরগ দুটো পড়ে আছে—একটু রসে উঠেছে, তাই ও রকম গন্ধ ছাড়ছে।'

লাবু হেঁট হয়ে কাগজে জড়ানো পুঁটলিটা হাতে তুলে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে এক টানে সেটাকে পাশের খদের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিল।

মনে মনে ভাবলাম, এ ভালই হল। নইলে হয়তো মরা পাখির গন্ধে রাত্রে গাড়ির আশেপাশে নানা অবাঞ্ছিত অতিথির সমাগম হত।

আবার চুপ করে বসে থাকা—কিছুই করবার নেই, কিছুই বলবার নেই। চিন্তার রাজ্যেও খুব খানিকটা আলোড়নের পর আস্তে আস্তে পক্ষাঘাতের প্রশান্তি নেমে এসেছে।……

হঠাৎ ডান দিকে খদের মধ্যে বেশ একটু নীচে জঙ্গলটা একবার নড়ে উঠল, তার পর অরণ্যের নিস্তব্ধতার বুক চিরে হঠাৎ ভেসে উঠল এক বিকট উল্লাসের পৈশাচিক হাসির আওয়াজ, হু—উ—উঃ—উঃ হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ খ্যাক্—খ্যাক্—খ্যাক্ হু—উঃ হিয়া—হিয়া—হ্যাঃ—

তিন জনেই একসঙ্গে চমকে উঠলাম। একবার মনে হল যে ভূতে বিশ্বাস নেই বলে এখুনি মনে মনে দম্ভ প্রকাশ করছিলাম, তাদেরই একজন বোধ হয় আমাদের অবিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করে ছুয়ো দিয়ে উঠেছে, এখুনি বোধ হয় খদের মধ্য থেকে জলন্ত মশালের মত দুই চোখ নিয়ে এক হাত লম্বা দাঁত বের করে নিষ্ঠুর হাসি হাসতে হাসতে একখানা প্রকাণ্ড দানবীয় মুখ আমাদের চোখের সামনে আবির্ভূত হবে।

পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিলাম। মূর্ছিতপ্রায় লাবুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলাম, 'ভয় নেই—ভয় নেই, হুড়ার—মানে হায়েনা ডাকছে। মরা পাখি দুটো ওখানে পড়ে আছে, তাই খেতে এসেছে বোধ হয়—জোড়ার আর একটাকে ডেকে আনছে। ভয় নেই, হুড়ারে মানুষের কোন ক্ষতি করে না।'

এমন সময় চিনিবাবু ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলেন, 'সামনে ঐদিকে চেয়ে দেখুন তো যাদুবাবু—কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?'

স্নায়ুমণ্ডলীর তারে তারে বিদ্যুৎশিহরণ খেলে গেল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কই ? কোথায় ? কোন্ দিকে ?—কি দেখতে পাচ্ছেন ?'

—'আলো, গাড়ির আলো—এইদিকেই আসছে।'

খুট্ করে সুইচ টিপে তিনি হেড-লাইট দুটো জেলে দিলেন, তার পর ইলেকট্রিক হর্নের সুতীব্র দীর্ঘায়িত ধ্বনিতে অরণ্যপথ মুখরিত করে তুললেন।……

দুখানা গাড়ি—একখানা জীপ ও একখানা ল্যাণ্ড্রোভার। সামনে এসে থামতেই আমরা নীচে নেমে পড়লাম ; ল্যাণ্ড্রোভার থেকে কয়েকজন আর্দালী চাপরাসী শ্রেণীর লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। তাঁদের মুখে শুনলাম, বনবিভাগের একজন বড়কর্তা সফরে বেরিয়েছেন—এখন থলকোবাদ চলেছেন, রাত্রে সেইখানেই ক্যাম্প পড়বে।

জীপ থেকে বড়কর্তা নিজেই নেমে এলেন। অন্ধকারের মধ্য থেকে তাঁর উদ্ধত বিরক্ত কণ্ঠের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম, 'কে আপনারা ? এমন সময়

এখানে কি করছেন? পোচিং-এর মতলব আছে নিশ্চয়—একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন।'

গট্‌মট্ করে সামনে এসে আমার মুখের উপর টর্চের আলো ফেললেন, তার পর—

—'এ কি স্যার, আপনি এখানে! কি ব্যাপার? কোন বিপদ-আপদ হয় নি তো?'

হেঁট হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলেন।

প্রাক্তন ছাত্র!

আঃ! যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম খলকোবাদ ডাকবাংলোয় রাত কাটানোর জন্য, কিন্তু লাবু জিদ ধরে বসল, জঙ্গলে সে কিছুতেই রাত্রিবাস করবে না। তার মনের অবস্থা চিন্তা করে আমাদেরও তার মতেই মত দিতে হল।

জীপখানিকে আমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। আমাদের অচল গাড়িকে লোহার শিকল দিয়ে তার পিছনে বেঁধে নেওয়া হল। ভগবৎপ্রেরিত দেবদূত স্বকার্য সাধন করে পুনরায় পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় হয়ে গেলেন।

আমরাও রাত সাড়ে নটার আগেই নোয়ামুণ্ডিতে পৌঁছে গেলাম।

•

কি যেন তার নাম বলেছিল ছাত্রটি—তখন ভাল করে শোনাও হয় নি, আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না।

এগারো

শরতের সকাল। রাঁচির শহুরে পরিবেশ পিছনে ফেলে সবে মাত্র খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি। বাতাসে শিশির-ভেজা ঘাসের ও মাটির গন্ধ। শিশু-সূর্য পূর্ব-গগনের প্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। পাখির প্রভাত-কাকলী তখনও নীরব হয়ে যায় নি। সামনে চুটুপালুর বিভঙ্গ-বঙ্কিম আরোহ ও অবরোহের রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তার পরই লম্বা দৌড়—একটানা সত্তর মাইল, হাজারিবাগের পাশ কাটিয়ে একেবারে সেই বগোদরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত।—মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছে।

হিতেনবাবু গান ধরলেন সর্বপ্রথম। তিনি থামতেই শুরু করলেন নীতীশবাবু। তার পর টিকি দুলিয়ে গুন্‌গুনিয়ে উঠল ড্রাইভার রতন সিং। অবশেষে একটু অবকাশ মিলল—সুরের ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আমিও গান গেয়ে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে—দুম্! পিছনের একখানা টায়ার ফেঁসে গেল। কি জানি, বেচারার বোধ হয় হাসতে হাসতেই পেট ফেটে গেল।

রতন সিং জ্যাক্ নিয়ে গাড়ির পিছনে বসে পড়ল, হিতেনবাবু পাশে বসে তার কাজের তদারক করতে লাগলেন, আমি আর নীতীশবাবু সিগারেট ধরিয়ে পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়লাম এক পাক ঘুরে আসবার জন্য।—সত্যিই বড় ভাল লাগছিল। টায়ার ফাঁসার মত সামান্য ব্যাপারকে একটা গুরুতর দুর্ঘটনা বলে মনে করা তখন আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

পর পর দুটো করে সিগারেট পোড়ানোর পর আমরা যখন আবার গাড়ির কাছে ফিরে এলাম, তখনও চাকা বদলানোর কাজ শেষ হয় নি। রতন সিং-এর পাশে হিতেনবাবু তখনও গাড়ির পিছনে পথের উপর উবু হয়ে বসে আছেন।

কিন্তু গাড়ির মধ্যে ও কে?

আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা নেড়ামাথা হৃষ্টপুষ্ট চেহারার একটি ভদ্রলোক গাড়ির সামনে ড্রাইভারের সীটে বসে আমাদের দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছেন—ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন আমাদের সঙ্গে কতদিনের পরিচয়, আচমকা দেখা দিয়ে আমাদের খুব অবাক করে দিয়েছেন, আর নিজে মনে মনে সেই মজাটা উপভোগ করছেন।

নীতীশবাবু চড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনি? বলা নেই কওয়া নেই, গাড়িতে চড়ে বসে আছেন! মতলব কি আপনার?'

ভদ্রলোক নির্বিকার হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'কলকাতায় যাব।'

হিতেনবাবু ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন; ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে তিনি আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারলেন না; প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, 'তার মানে? কলকাতায় যাবেন তো আমাদের গাড়িতে কেন? বাস্ ধরে সোজা স্টেশনে চলে যান—টিকিট কিনে রেলগাড়িতে চেপে বসলেই কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারবেন। নামুন গাড়ি থেকে!—রতন সিং!'

গোলমাল শুনে রতন সিং হাতের কাজ ফেলে উঠে এসেছে। এগিয়ে এসে বলল, 'উতারিয়ে বাবু—গাড়িসে উতর্ যাইয়ে!'

ভদ্রলোক কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না—যেমন বসে ছিলেন তেমনি রইলেন, তেমনি মিটমিট করে হাসতে হাসতে বললেন, 'আ-হা-হা, আপনারা অত চটছেন কেন? টিকিট কিনে রেলগাড়িতে চেপে যে কলকাতায় যাওয়া যায় তা কি আমি জানি নে? কিন্তু আমার যে মূলেই হাঁভাত মশাই—পকেটে পয়সা নেই তো টিকিট কিনব কি দিয়ে? দেখলাম আপনাদের কলকাতার গাড়ি—ফিরতি পথে চলেছে, আপনাদেরও ভদ্দরলোক বলেই মনে হল, তাই চড়ে বসলাম আপনাদের গাড়িতে। কলকাতায় আমাকে যেতেই হবে, অথচ এতটা পথ হেঁটে যাওয়াও তো সম্ভব নয়—কি করব বলুন?'

হিতেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাতে পয়সা নেই বলছেন, তবে এখানে এসে পড়লেন কি করে?'

—'আমি কি আর ইচ্ছে করে এসেছি মশাই? আমাকে জোর করে ধরে

নিয়ে এসেছে ওরা দুই শালায় মিলে—মানে, আসলে একটা শালা আর একটা খুড়শ্বশুর, কিন্তু আমি ওদের দুজনকেই শালা বলি—শালার ব্যাটা শালা !'

দাঁতে দাঁত চেপে অত্যন্ত হিংস্রভাবে গালাগালটা উচ্চারণ করলেন।

মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠছিল ; প্রশ্ন করলাম, 'তা ওঁরা—মানে আপনার শালা আর খুড়শ্বশুর এখন কোথায় ?'

ক্রোধের কুয়াশা কেটে গিয়ে অনাবিল কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল মুখে : 'ওরা সেই হোটেলেই পড়ে আছে—হয়তো এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। বড়লোকের এঁড়ে তো দুটোই—আলসের হদ্দ ! নটার আগে ঘুমই ভাঙে না শালাদের। আমি শেষরাত্রে উঠে চুপি চুপি চম্পট দিয়েছি।—অনেকটা পথ হেঁটেছি মশাই, আর পারছি নে। তা আপনারা তো কলকাতায় যাচ্ছেনই, গাড়িখানাও বেশ বড়সড় আছে দেখছি—চার জনের জায়গায় পাঁচ জন হলে কি আর এমন বোঝা বাড়বে বলুন !'

মনের সন্দেহ ততক্ষণে বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আপনি এমন ভাবে পালাচ্ছেনই বা কেন ? ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারছি নে।'

—'না বোঝবার এতে কি আছে মশাই ? ঐ দুই শালা জবরদস্তি করে আমাকে কলকাতা থেকে রাঁচি টেনে এনেছে। সারাটা পথ চোখে চোখে রেখেছে—আমাকে মাঝখানে নিয়ে দু জন দু পাশে আগাগোড়া গ্যাঁট্ হয়ে বসে থেকেছে। এমন সুন্দর রাস্তা মশাই ! এত করে বললাম, আমাকে একটু গাড়ি চালাতে দে, তা ষ্টিয়ারিঙে হাত পর্যন্ত ছোঁয়াতে দিল না একবার !'—হঠাৎ গলার সুর একদম নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'ওদের আসল মতলবটা কি জানেন ? আমাকে কোনমতে পাগল প্রমাণ করে রাঁচির পাগলা গারদে ভর্তি করে দিতে চায়।—হুঁ-হুঁ বাবা ! আমিও ঘুঘু ছেলে—কেমন চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়েছি !'

আমার সন্দেহটাই সত্যি। পাগল !—পথের মধ্যে বাগে পেয়ে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

রতন সিং চাকার কাজ শেষ করতে গেল। আমরা পাগলের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

হিতেনবাবু একটু মজা করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সত্যি সত্যি পাগল নন তো?'

সিংহ-গর্জনের মত আওয়াজ করে ভদ্রলোক অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন: 'পাগল হয়েছেন আপনারা? আমি পাগল! আমি পাগল হতে যাব কোন্ দুঃখে? আসলে আমার ঐ শালাটাই পাগল। খুড়শ্বশুর ছোঁড়াটাও পাগল— তবে অমন বদ্ধপাগল নয়। ঐ দুই শালা পাগলের পাল্লায় পড়েই আজ আমার এই দশা।'

নীতীশবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনারা তো গাড়িতেই এসেছেন, আর সে গাড়িও এখন তাঁদের কাছেই আছে। তাঁরা জানেন আপনার কাছে পয়সা নেই—আপনার কলকাতায় ফেরবার ঝোঁকও নিশ্চয় তাঁদের অজানা নয়। কাজেই আপনি তাঁদের কাছ থেকে কি করে পালাবেন বলুন? এখুনি তাঁরা গাড়ি নিয়ে এদিকে এসে পড়বেন, তার পর আবার আপনাকে জোর করে ধরে রাঁচি নিয়ে চলে যাবেন। আপনি হলেন তাঁদেরই আপনার জন—আমরা তো তাঁদের কাজে বাধা দিতে পারব না!'

—'কি করে আসবে বললেন? গাড়ি নিয়ে? গাড়ি!'—আবার সেই পিলে-চমকানো হাসি—'ওদের গাড়ি তো আর নেই!'

—'সে কি! গাড়ি নেই? গাড়ি কি হল?'

—'গাড়ি মরে গেছে।'

—'মরে গেছে! গাড়ি মরে গেছে! সে আবার কি রকম কথা!'

অনেক পাগল দেখেছি, অনেক পাগলের কথা শুনেছি—কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তো কাউকে বলতে শুনি নি! কৌতুক ও কৌতূহল দুইই প্রবল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে মরল তাঁদের গাড়ি?'

'চিনি খেয়ে।'

অপ্রত্যাশিত উত্তরের জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু কল্পনায় দৌড় এতটা

পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি। একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। বোকার মত বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, 'চিনি!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি। চিনি চিনি বললেই কি আর চিনিকে চেনা যায় মশাই! চিনিকে আপনারা চেনেন না, চিনির সব গুণ জানেন না। শেষ রাত্রে হোটেল থেকে পালানোর সময় পুরো আড়াই সের চিনি ওদের গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢেলে দিয়ে এসেছি। ব্যস্! গাড়ির দফা গয়া।—স্টার্ট ঠিকই নেবে, কিন্তু ঐ তেল-শরবতের কয়েক ফোঁটা কার্বুরেটর ঘুরে সিলিণ্ডারের মধ্যে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনের নাড়ীভুঁড়ি সব এলিয়ে যাবে—গাড়ি আর চলবে না। ও চিনির ধাক্কা স্বয়ং চিন্তামণিও সামলাতে পারবেন না। মেরামত করে আবার গাড়ি চালু করা—সে এখন দশ বাঁও জলের তলায়!'—কথা শেষ করে অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হিতেনবাবুর দিকে চাইলাম। তিনি গম্ভীরমুখে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলেন, পাগল সত্যি কথাই বলেছে।—তবে তো এ পাগল বেশ সেয়ানা পাগল! পাগলামির সঙ্গে সঙ্গে শয়তানী বুদ্ধিটুকু ঠিক আছে!

নীতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সঙ্গে পয়সা নেই বলছেন, তবে আড়াই সের চিনি আপনি যোগাড় করলেন কোত্থেকে?'

—'ও চিনি আমি কলকাতা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। পোঁট্লা সুদ্ধ আমার নিজের সেক্রেটারিয়াট টেবিলের দেরাজের মধ্যে লুকোনো ছিল—আসবার সময় রুমালে বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিলাম।'

—'সঙ্গে আর কিছুই আনলেন না, নিয়ে এলেন শুধু চিনির পোঁট্লা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা-ই এনেছি।—চিনি বড় সোজা জিনিস নয় মশাই—অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলবেন না। ঐ আড়াই সের চিনির কথাই ধরুন না কেন—ঐ চিনির শরবত খেয়ে শালাদের গাড়ি অক্কা পেয়েছে, শুনলেন তো? আবার ঐ চিনিরই শরবত না খেতে পেয়ে আমার বৌ অক্কা পেয়েছে।'

হিতেনবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার স্ত্রী সম্প্রতি মারা গেছেন বুঝি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই তো তরস্থ দিন মাত্র শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকেছে। দেখছেন না—এখনও নেড়া মাথায় চুল গজায় নি।'

—'সে আবার কি রকম কথা মশাই! বৌ-এর শ্রাদ্ধে কি কেউ মাথা নেড়া করে?'

—'যাদের বৌ আটপৌরে হেঁজি-পেঁজি জিনিস তারা হয়তো করে না, কিন্তু আমার বৌকে তো দেখেন নি—সে ছিল পটের পরী, আলমারির আহ্লাদী পুতুল। তার জন্যে মাথা নেড়া করা তো ছার—কপ্‌নি-কমণ্ডলু নিয়ে সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেলেও বোধ হয় কম করা হত। তা ছাড়া সে তো আমার শুধু বৌ ছিল না, অন্নদাতা ভয়ত্রাতা ইত্যাদি সবই ছিল—তারই পয়সায় খেতাম পরতাম, তারই বাড়িতে বাস করতাম, কায়মনঃপ্রাণে তার সেবা করতে পারলে জীবনটা সুখেই কেটে যেত। কিন্তু তা আর হল কই বলুন!'—ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

চাকার কাজ শেষ করে রতন সিং এসে পাশে দাঁড়াল, যন্ত্রপাতি সব গাড়ির মধ্যে তুলে দিল। কিন্তু আমরা তখন পাগলের গল্পের মোহে আটক পড়ে গেছি। বাইরে বেরুলে সময়টাকে আমরা অবহেলার বস্তু বলেই মনে করে থাকি—প্রয়োজন হলে দু'চার ঘণ্টা এদিক ওদিক করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করি না। পথে-পড়ে-পাওয়া এই পাগলটিকে এত সহজে ছেড়ে যেতে আমাদের কারোরই মন সরছিল না। তা ছাড়া, বড়দাও সঙ্গে নেই, সিডিউল ভাঙবার জন্য তিরস্কৃত হতে হবে না।

কাজেই আবার প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আপনার স্ত্রী চিনির শরবত না খেতে পেয়ে কি করে মারা গেলেন? ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলুন, নইলে বুঝব কেমন করে?'

প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক মুচকি হেসে হাত-মুখ নেড়ে একেবারে গোড়া বেঁধে আত্মকাহিনী শুরু করলেন: 'বাপ নেই মা নেই, ভাইবোন কেউ নেই—ছেলেবেলা থেকে কাকার বাসায় লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হয়েছি মশাই। কিন্তু লেখা-পড়ায় বরাবরই ভাল ছিলাম—ম্যাট্রিকে ইণ্টারে স্কলারশিপ পেয়ে পাশ

করেছিলাম। ইস্কুলে কলেজে কোনদিন মাইনে দিতে হয় নি, বইপত্তরও কাকামশাই নানান দাতব্য-সমিতি থেকে যোগাড় করে এনে দিতেন। জল-পানির টাকাগুলো কাকীমা নিয়ে নিতেন—খাই-খরচার কিছুটা ঐভাবেই উশুল হত। জলখাবার বরাদ্দ ছিল চিঁড়ে আর ভেলিগুড়। খুব ছেলেবেলায় একদিন খুড়তুতো ভাইদের দেখাদেখি চিনি খেতে চেয়েছিলাম—কাকা খড়ম দিয়ে পিটিয়ে নাকমুখ থেঁতো করে দিয়েছিলেন। চিনি কি বস্তু সেই আমি প্রথম চিনতে শুরু করি।

'বি-এস্-সিতে অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়বার সময় চিনির বিশ্বরূপ দর্শন করতে শিখি। ঐ সময়ে "চিনি-চরিত" নাম দিয়ে একটা বাংলা প্রবন্ধ লিখে ফেলে-ছিলাম। একখানা নামকরা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধটা ছাপা হয়—সাড়ে সাত টাকা দক্ষিণাও পেয়েছিলাম। কাকা-কাকীমা এই টাকাটার হদিশ পান নি—তোশকের ওয়াড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। দু-চার আনা করে বের করতাম, চিনি কিনে এনে চুপি চুপি শরবত করে খেতাম। ভয়ানক ভাল লাগত।

'কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি-এস্-সি পাশ করলাম। নিজের ইচ্ছে ছিল এম্-এস্-সি পড়ব, গবেষণা করব—চিনির ভিতরকার গোপন রহস্য বিশ্লেষণ করে চিনিতত্ত্ববিশারদ হব। কাকা একটা পেটেণ্ট ওষুধের কারখানায় আটষট্টি টাকা মাইনের কেরানিগিরি যোগাড় করে এনে বললেন, "ঢুকে পড় এখন—কেমিস্ট্রির কোয়ালিফিকেশন আছে, পরে উন্নতি হবে।"—কাকা দু বেলা খেতে দেন, সুতরাং তাঁর কথা মানতেই হবে—চাকরিতেই ঢুকে পড়লাম পড়া-শুনো ছেড়ে। কিন্তু বেশিদিন চাকরি করতে হল না। হঠাৎ শোভাবাজারের এক গলি থেকে মস্তবড় গোবদা চেহারার এক লক্ষপতি কারবারী ভদ্রলোক এসে উদয় হলেন—হাতে টাকার থলি আর বগলদাবায় একটি মেয়ে। কাকা পেলেন টাকার থলিটি আর আমার ঘাড়ে চাপল সেই মেয়ে। ব্যস্, একদিনে পাশার দান উলটে গেল।

'মেয়ের নামে একখানা বাড়ি লিখে দিলেন শ্বশুরমশাই—সেখানে আমাদের

জন্য আলাদা সংসার পাতা হল। মোটা মাসোহারা বরাদ্দ হল—সেও ঐ মেয়ের নামে। কোন অভাব নেই, ঠাকুর-চাকর আসবাব-পত্তর খানাপিনা—একেবারে এলাহি ব্যাপার। কাজ নেই কর্ম নেই, শুধু খাও দাও আর গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও!

'আমার বৌকে আপনারা দেখেন নি—লোকে বলত অপরূপ সুন্দরী, ডানাকাটা পরী। তা সুন্দরী সে সত্যিই ছিল—ঢলঢলে কালো চোখ, বাঁশির মত নাক, একমাথা চুল, চাঁপা ফুলের মত ফুটফুটে রঙ। কিন্তু বেজায় মোটা—থলথলে ঢ্যাপসা চেহারা, নড়তে চড়তে চাইত না বড় একটা, চুপচাপ হাত কোলে করে বসে থাকতে ভালবাসত সব সময়। আর ছিল একখানা মুখ মশাই—কি বলব, এমন দু-কান-এঁটো-করা মুখ আমি বাবার জন্মে কখনও দেখি নি। আর সেই মুখের মধ্যে ছিল বড় বড় সাদা সাদা দু পাটি শক্ত দাঁত। যখন হাঁ করে হাই তুলত, হঠাৎ নজরে পড়লে ভয়ে বুকের মধ্যে হিম হয়ে যেত।

'আর খেতেও পারত কিছু বৌটা—সারাদিনই শুধু খাচ্ছে। চানাচুর নিমকি পাঁপরভাজা সিঙাড়া থেকে রাবড়ি সন্দেশ রসগোল্লা রাজভোগ পর্যন্ত, শুক্ত চড়চড়ি ঘণ্ট ডালনা থেকে পোলাও কালিয়া চপ কাটলেট পর্যন্ত—সে যেন একেবারে ভোজনের রাজসূয় যজ্ঞ। সে খাওয়া দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আমার মনে হত, আস্ত একটা খাণ্ডববন না হলে বৌএর জঠরের এ আগুন বোধ হয় কোনদিন নিভবে না।

'আমিও খেতাম। জীবনে কোনদিন পেট ভরে খেতে পাই নি—ভালমন্দ জিনিস চোখেও দেখি নি। খোদা যখন দিন দিয়েছে তখন খাব না কেন? পেট ভরে খেতাম, আশ মিটিয়ে খেতাম। তবে মিষ্টি জিনিস এক চিনি ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগত না, আর কিছুই খেতাম না। বৌ যখন রসগোল্লা ক্ষীরকদম্ব লেডিকেনি মালাই-চপ ডজনে ডজনে ঠুসত, আমি তখন খেতাম শুধু চিনির শরবত।—তা দিনে প্রায় সাত আট গ্লাস করেও খেতাম। ভয়ানক ভাল লাগত জিনিসটা।

'বছর আষ্টেক এমনি করেই কাটল। ছেলেপুলে একটাও হল না—তবে বৌএর ডায়াবিটিস্ হল। আমার একটা নিয়মিত কাজ জুটল—রোজ তার প্রস্রাব পরীক্ষা করা আর দরকার বুঝলে ইনসুলিন ইনজেকশান দেওয়া। এও সেই চিনির খেলা!

'অসুখ হওয়ার পর থেকেই বৌএর মেজাজ বেজায় খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই খোঁটা দিত—বুড়ো মদ্দ নিষ্কর্মা বসে বসে শ্বশুরের অন্নধ্বংস করতে লজ্জা করে না দেখে ঝাঁঝালো বিস্ময় প্রকাশ করত। বলত, আত্মীয়-মহলে এইজন্যে তার নাকি আর মুখ দেখাবার উপায় নেই।

'রোজ রোজ ঐ একই ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। একদিন বললাম, "তা বেশ তো, তোর বাবার তো অনেক টাকা, দিয়ে দিক না আমাকে লাখ দুয়েক—ইউ পি-র ওধারে গিয়ে ছোট একটা চিনির কারখানা খুলি। বল্ না বুড়োকে কথাটা।"

'তা কথাটা বলেছিল সে বাপকে। বুড়ো নাকি শুনে ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছিল—"ওঃ! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর! বাবাজীর মুরোদ যে কত তা এই আট বছরেই বোঝা গেছে। আর চিনির কারখানা দিয়ে কাজ নেই, যেমন আছে তেমনি থাক্—একটা পুষ্যিজামাই পালবার ক্ষমতা আমার আছে।"……

'তার পর সেদিনের কথা। দুপুরে শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্ন ছিল—সকাল সকাল চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়ে সদর দরজায় তালাবন্ধ করে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই বৌ বিছানায় শুয়ে পড়ে হাঁস্‌ফাঁস্ করতে লাগল, বলল, শরীরটা খুব খারাপ ঠেকছে। তখন মনে পড়ল সেদিন সকালের প্রস্রাবটা পরীক্ষা করা হয় নি—ভুলে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ছুটলাম বাথরুমে।—পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, প্রস্রাবে চিনি প্রায় নেই বললেই চলে। ইনজেকশনের কোন দরকার নেই। আসলে রাক্ষসের মত গোগ্রাসে কতকগুলো অখাদ্য-কুখাদ্য গিলেই ওরকম হাঁস্‌ফাঁস্ করছে।

'হঠাৎ একটা চমৎকার মতলব মাথায় খেলে গেল। আমার চিনির

শরবত খাওয়া নিয়ে বৌটা যখন তখন বেজায় ঠাট্টা করে—খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা বলে, বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে হাসাহাসি করে। চিনি কি জিনিস ওকে একবার জন্মের শোধ ভাল করে বুঝিয়ে দিলে হয় না ?

'ফিরে এসে বৌকে বললাম, প্রস্রাবের চিনি হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। তার পর ডবল্ ডোজ একটা ইন্‌সুলিন ইনজেকশন ঠুকে দিলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওর কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম ফুটে বেরুল, মাথা ঘুরতে লাগল। বললাম, বোধ হয় একটু ওভারডোজ হয়ে গেছে, ঘন করে এক গ্লাস চিনির শরবত করে নিয়ে আসি—খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

'তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে ভাঁড়ারে গেলাম। আতিপাতি করে খুঁজে দেখলাম, আমার জন্যে আনা চিনির একটা আড়াই-সেরি পোঁট্‌লা ছাড়া ঘরে মিষ্টি জিনিস বলতে আর কিছু নেই। চিনির পোঁট্‌লাটা ভাঁড়ার থেকে বের করে বৈঠকখানায় নিয়ে এলাম, সেক্রেটারিয়াট টেবিলের একটা দেরাজের মধ্যে সেটা তুলে রেখে চাবি বন্ধ করে দিলাম, তার পর চাবির গোছাটা পকেটে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সদর দরজার বাইরের শিকলটা তুলে দিয়ে পাড়ার পার্কে গিয়ে একটা গাছতলায় চুপচাপ বসে রইলাম।

'ঘণ্টা দুই পরে বাড়ি ফিরে দেখলাম বৌ ভাঁড়ার ঘরের দরজার উপর কাঠ হয়ে মরে পড়ে রয়েছে। বোধ হয় চিনির সন্ধানেই ঐ ঘরে গিয়েছিল।'

কি সর্বনাশ! কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এ যে সত্যিই সাপ বেরিয়ে পড়ল! এতক্ষণ নিরীহ পাগল ভেবে যাকে নিয়ে মজা করছিলাম আসলে সে একটা খুনী! বিনা কারণে নিজের বৌকে ইনসুলিন দিয়ে খুন করেছে,—আবার নির্বিকারচিত্তে হাসিমুখে আমাদের কাছে সেই খুনের গল্প করে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করছে! একেই বোধ হয় হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক বলে। এখন উপায় ? একে নিয়ে আমরা কি করি ?—বিপন্ন ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

ভদ্রলোকের কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই, আগের মতই প্রসন্নমুখে বলতে লাগলেন, 'শ্বশুরবাড়ির লোকগুলোর চোখে কিন্তু ধুলো দিতে পারলাম না।

ওরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝে নিল। কিন্তু বড়লোকের ঘরের কেলেঙ্কারি—এ নিয়ে তো আর থানা-পুলিশ করতে পারে না। তাই শ্রাদ্ধের হাঙ্গামা চুকতেই ঐ দুই শালায় মিলে আমাকে দেশভ্রমণের অছিলা করে রাঁচিতে টেনে এনেছে পাগলা-গারদে আটকে ফেলবার জন্যে।······শুনলেন তো সব কথা? ব্যাস—আর কেন? আসুন, উঠে পড়ুন সব—এইবার রওনা হওয়া যাক্।'—এমনভাবে কথা বলছেন যেন ওঁরই গাড়ি, আমাদের সঙ্গে নিয়ে কোথায় বেড়াতে চলেছেন।

নীতীশবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন, আমরা তিনজন একটু পিছনে সরে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলাম। স্থির হল, হিতেনবাবু সামনে পাগলের পাশের সীটে গিয়ে বসবেন, আমরা দু জন পিছনে উঠে বসব। রতন সিং গিয়ে পাগলকে অনুরোধ করবে নেমে পিছনে এসে বসতে। কিন্তু নামলে আর তাকে উঠতে দেওয়া হবে না, ঐখানেই পথের মধ্যে ফেলে রেখে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু ব্যাপারটা যা ঘটল তা আমরা কেউই প্রত্যাশা করি নি। আমরা তিন জন সবে গাড়িতে চড়ে বসেছি—রতন সিং কেবল গুটি গুটি পাগলের দিকে এগুচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট নিয়ে পূর্ণবেগে ছুটতে আরম্ভ করল। পাগল গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে! রতন সিং খুব চট্‌পটে শক্ত-সমর্থ মানুষ, ঝাঁপিয়ে পড়ে পা-দানির উপর উঠে দাঁড়াল তাই রক্ষা, নইলে তাকেই পিছনে পড়ে থাকতে হত—হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোন রকমে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পিছনে আমাদের পাশে বসে পড়ল।

তার পর যা শুরু হল সে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের কাহিনী। ভারী অ্যামেরিকান গাড়ি, প্রচণ্ড পিক্-আপ্—স্পীডোমিটারের কাঁটা দেখতে দেখতে তরতর করে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট পার হয়ে গিয়ে পঁয়ষট্টি ও সত্তরের মধ্যে দুলতে লাগল। ঝড়ের মত ছুটে চলেছি—আতঙ্কে সর্বশরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে, মুখের ভিতর তালু পর্যন্ত শুকিয়ে ধূলো হয়ে গেছে।—পাগল দু হাতে স্টিয়ারিং চেপে চুপ করে খাড়া হয়ে বসে আছে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসছে!

দেখতে দেখতে চুটুপালুর ঘাট এসে পড়ল—মোটা মোটা হরফে বিজ্ঞপ্তি লেখা রয়েছে : Many dangerous curves ahead (সামনে বহু বিপজ্জনক বাঁক আছে)। কিন্তু পাগ্লের ভ্রূক্ষেপ নেই। খাড়া চড়াইএর পথে যেন গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। গাড়ির হর্ন একবারও স্পর্শ করছে না—প্রতিটি বাঁকের মুখে এসে বিটকেল সরু বাজখাঁই আওয়াজে ক্র্-র্-র্-র্ করে এক-একটা লম্বা হাঁক ছাড়ছে। আমরা কাঠ হয়ে বসে আছি আর মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপের চেষ্টা করছি—কিন্তু চোখের সামনে ভাসছে শুধু মৃত্যুর কঙ্কাল-করোটির বিদ্রূপ-হাস্যের দন্তবিকাশ।

বাঁকের পর বাঁক বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাচ্ছি। গাড়ি মাঝে মাঝে মোড় ঘোরবার সময় উল্‌টে টাল খেয়ে পড়বার ভয় দেখাচ্ছে, আবার সামলে নিচ্ছে—হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে মুখে লাগছে, কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে ঘেমে একেবারে জবজবে হয়ে উঠেছি।

ঘাটের মাথা পার হয়ে গেলাম। এবার উৎরাইএর পালা। ডান দিকে খাড়া খদ—সোজা তিন হাজার ফুট নীচের সমতল প্রান্তরে নেমে গিয়ে মিশেছে, বাঁয়ে ডিনামাইট ফাটিয়ে তৈরি করা ধারালো খোঁচা-খোঁচা-দাঁতওয়ালা পাথুরে দেয়াল। তার উপর ঘন ঘন পথের প্যাঁচ ও বাঁক তো আছেই। সেই পথ ধরে আমাদের গাড়ি যেন উড়ে চলেছে। ডাইনে মৃত্যু, বাঁয়ে মৃত্যু—সামনেও যে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারে তেমন ভরসা করবার সামর্থ্য অনেকক্ষণ হারিয়ে ফেলেছি।

সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত আমাদের গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে।…

কিন্তু লোকটা গাড়ি চালাতে জানে বটে! পথে কত গাড়ি পড়ল, দু-একখানা বাস্ পড়ল, একবার পড়ল স্ট্যান্‌ভ্যাকের প্রকাণ্ড একখানা তেল-টানা ট্যাঙ্কার। কিন্তু একবারও না থেমে, একটুও স্পীড না কমিয়ে ঠিক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল—থেকে থেকে শুধু ক্র্-র্-র্-র্ করে সেই বিটকেল ফুৎকার ছাড়ছে আর সমানে মিট্‌মিট করে হাসছে।

গাড়ি অবশেষে সত্যিই চুটুপালুর পাহাড়ী পথ ছেড়ে সমতলে এসে নামল। তা হলে কি এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম?…

সামনেই রামগড়। কিন্তু পাগল কি গাড়ি থামাবে? ভাবগতিক দেখে তো তা মনে হয় না—গাড়ির স্পীড একটুও কমায় নি। চলতি গাড়ির ষ্টিয়ারিং নিয়ে তো আর হাত-কাড়াকাড়ি করা যায় না—তা হলে অ্যাকসিডেণ্ট অবশ্যম্ভাবী।—কি করা যায়?

স্বয়ং ভগবানই বোধ হয় বুদ্ধি যুগিয়ে দিলেন। সামনে ঝুঁকে পড়ে পাগলের কানের কাছে চীৎকার করে বললাম, 'রামগড়ের বাজারে একবার গাড়িখানা থামাবেন, কিছু চিনি কিনতে হবে।'

হঠাৎ গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে পাগল প্রশ্ন করল, 'কি—কি কিনতে হবে বললেন?'

—'চিনি!'

—'কতটা কিনবেন?'

—'এতগুলো লোক আছি আমরা, সাড়ে সাত সেরের কমে কি আর হবে!'

পাগলের মুখ পরম সন্তোষের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: 'সাড়ে সাত সের! বেশ—বেশ!—আচ্ছা থামাব।'

জয় ভগবান!

রামগড়ের বাজারে এসে গাড়ি থেমেছে। আমরা তিনজনে মিলে পাগলকে চেপে ধরে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়েছি। রতন সিং পুলিশের খোঁজে গেছে।

বারো

ভূত দেখেছি দু বার—একবার জ্যান্ত ভূত, একবার মরা ভূত। মরা ভূতের গল্পটাই আগে শোনাই।

গোসানিমারি চিলারায়ের গড় প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করে যখন দিনহাটায় ফিরে এলাম তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। বন্ধু ছাড়তে চান না—একটা দিন থেকে যাবার জন্য পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু আমাদের রাত্রে কুচবিহারে ফিরতেই হবে—পরদিন ভোরবেলা কোদালবস্তির জঙ্গলে যাবার কথা ঠিক হয়ে আছে, এখন আর প্রোগ্রাম নড়চড় করবার উপায় নেই।—রওনা হতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল।

রাস্তা মোটের উপর ভালই, তা হলেও রাতের পথ—চিনিবাবু খুব সতর্ক ভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন। রাত আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় চাঁদ উঠল। প্রথম জ্যোৎস্নার ম্লান-পাণ্ডুর আলোয় নজরে পড়ল, পথের পাশে একটু দূরে জমাট অন্ধকারের স্তূপের মত মস্ত বড় একটা ভাঙাচোরা অট্টালিকা—"চিলম্-খাওয়া ধনী"-র বাড়ি। নামটা একটু বিচিত্র ধরনের, পিছুনে ছোট্ট একটা কাহিনীও আছে। যাবার সময় মানুভাই গল্পটা আমাদের শুনিয়েছিল।

কুচবিহার অঞ্চলটা সত্যিই "হট্টমালার দেশ"—প্রতিদিনই আশে-পাশে কোথাও একটা দুটো হাট বসে। প্রায় শ-খানেক বছর আগে এইখানকার এক হতদরিদ্র গ্রামবাসী মস্ত বড় একটা ছিলিমে করে তামাক সেজে হাটে হাটে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ধূমপান করিয়ে বেড়াত। পরিবর্তে কখনও, পেত কলাটা মূলোটা, কখনও বা একটা-আধটা পয়সা। এমনি করে সারা জীবন ছিলিম খাইয়ে খাইয়ে সে নাকি বহু টাকা সঞ্চয় করে, আর বুড়ো বয়সে সেই রাই-কুড়ানো বেল ভেঙে এই অট্টালিকা নির্মাণ করায়।

আজকাল স্থানীয় লোকদের অনেকেই এ কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করেন না-

তাঁরা বলেন, লোকটা নিশ্চয় কোন গুপ্তধন পেয়েছিল। হাটে হাটে তামাক খাইয়ে বেড়ানোটা নাকি ছিল স্রেফ 'কামুফ্লাজ'।...

এইবার আমাদের রাস্তা এসে পড়ল একটা প্রকাণ্ড পুরনো দীঘির ধারে। যাবার সময় দিনের আলোয় দীঘিটাকে বেশ ভাল করেই দেখতে পেয়েছিলাম—চারিদিকে কোথাও কোন ঘাট-ঘাটলার চিহ্নমাত্র নেই, কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ ও সুগভীর জলের মধ্যে স্থানে স্থানে শেওলার দাম—জলজ উদ্ভিদের জঙ্গল, ঠিক মাঝখানে একটা ইটে-গড়া স্তম্ভের কঙ্কাল কোন রকমে জলের উপর অশ্বত্থ-শিকড়ের সাদা-পাগড়ি-বাঁধা মাথাটা তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দীঘির নাম 'মশানকুড়া'। কুচবিহারী ভাষায় 'কুড়া' শব্দের অর্থ দীঘি, আর 'মশান' বলতে আমরা বধ্যভূমিই বুঝেছিলাম। একটা সাধারণ বড় সাইজের পুষ্করিণীর এ রকম ভয়াবহ নামকরণের কি হেতু থাকতে পারে তা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম। মামুভাই আঞ্চলিক কিংবদন্তীর উৎসাহী সংগ্রাহক, কিন্তু সেও আমাদের এ সম্বন্ধে কোন হদিশ দিতে পারে নি।

চাঁদ ততক্ষণে অনেকটা উপরদিকে উঠে এসেছে, জ্যোৎস্নার আলোও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কালো পিচের পথ তেলের মত চকচক করছে, কোথাও একটু হাওয়া নেই—পথের ডানদিকে দীঘির জল আয়নার মত স্থির হয়ে পড়ে আছে, আলোছায়ার অগোছালো সন্নিবেশে কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে। চারিদিক থম্ থম্ করছে—একটা রাতজাগা পাখিও কোথাও ডাকছে না। জায়গাটা সত্যিই ভয়ঙ্কর নির্জন।

এমন সময় আমরা সবাই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, দীঘির বিপরীত দিকের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘাকৃতি উলঙ্গ মনুষ্যমূর্তি একছুটে বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির মাত্র বিশ-পঁচিশ গজ সামনে দিয়ে বোঁ করে রাস্তা পার হয়ে আরও কিছু ঝোপজঙ্গল ভেঙে দীঘির ধারে গিয়ে দাঁড়াল, তার পর সেখান থেকে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। উৎক্ষিপ্ত জলকণা ছিটকে-ওঠা পারার মত চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। বোধ হয়

গাড়ির শব্দের জন্যই কোন শব্দ শুনতে পেলাম না, কিন্তু নিস্তরঙ্গ দীঘির জলের উপরকার আকস্মিক আলোড়ন কারও দৃষ্টি এড়াল না।

সবাই ভীষণ চমকে গেলাম। প্রথমেই মনে হল, লোকটা পাগল। ধারণাটা যুক্তিসঙ্গত কিনা ভাল করে ভেবে দেখবার আগেই আবার মনে সন্দেহ জাগল, আত্মহত্যার চেষ্টা নয় তো?—লোকটাকে যেখান দিয়ে পথ পার হয়ে যেতে দেখেছিলাম সেইখানে এসে চিনিবাবু গাড়ি থামিয়ে ফেললেন। চারজোড়া কৌতূহলী চোখের সন্ধানী দৃষ্টি একসঙ্গে ডানদিকে ফিরে দীঘির জলের ওপর গিয়ে পড়ল।

দু দু বার এতগুলো লোকের একসঙ্গে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল এমন কথা আপনারা বিশ্বাস করতে চান করুন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে বলবেন না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দায় আপনাদের—সেদিন ফুটফুটে চাঁদের আলোয় মশানকুড়ায় জলের উপর আমরা যে দৃশ্য দেখেছিলাম আমি শুধু তার বর্ণনা দিয়েই খালাস।

জল আবার কাচের মত মসৃণ অচঞ্চল হয়ে পড়ে আছে, এইমাত্র অতবড় একটা আলোড়ন হয়ে গেছে, কিন্তু কোথাও তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। একটা লহরও কোথাও দুলছে না, একটা মাছেও ফুটকি কাটছে না। আর সেই জলের উপর—আমাদের গাড়ি থেকে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে চিৎ হয়ে ভাসছে উলঙ্গ একটা মানুষের মৃতদেহ। পচে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, নাক ও একটা চোখ সমেত মুখের একটা দিক কিসে যেন খুবলে খেয়েছে, ওষ্ঠাধর শ্লথ হয়ে ঈষৎ ফাঁক হয়ে পড়েছে—তার ভিতর দিয়ে সাদা দু-পাটি দাঁত উঁকি মারছে; মনে হচ্ছে যেন, ঠেলে-বেরিয়ে-আসা একটিমাত্র অক্ষিপিণ্ডের নির্বোধ অন্ধ দৃষ্টি মেলে চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে বীভৎস হাসি হাসছে!

মানুভাই উঁকি-টামার মত একটা অব্যক্ত শব্দ করে হিতেনবাবুর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। চিনিবাবুর মুখের সিগারেটটা একবার দপ্‌ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার পর তিনি মুহূর্তের মধ্যে গাড়িতে

স্টার্ট দিয়ে পূর্ণবেগে সামনের দিকে বেরিয়ে গেলেন।—কুচবিহারের আস্তানায় এসে পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা আর একটাও কথা বলি নি, একবারও পিছন ফিরে চাই নি।

আমাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই—যে মূর্তিটাকে আমরা পথ পার হয়ে ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দেখেছিলাম সেটা একটা মরা মানুষের মূর্তি, অন্তত-পক্ষে পাঁচ ছ দিনের বাসি মড়া।

পরে জানতে পেরেছিলাম, নামটা 'মশানকুড়া' নয়—'মাসানকুড়া'। কুচবিহারের গ্রামাঞ্চলের ভাষায় 'মাসান' শব্দের অর্থ ভূতপ্রেত বা অপদেবতা।

এইবার একটা মস্তবড় লাফ দিতে হবে। একলাফে পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় তিন বছর সময় আর অতিক্রম করতে হবে প্রায় আট শ মাইল পথ।

হাজারিবাগ শহর থেকে বেশি দূরে নয়—রাঁচি রোডের পাশে একটা ছোট পাহাড় আছে—সবুজ ঘাস ও আগাছায় ঢাকা, একেবারে চূড়ার কাছে ছোটবড় গাছের একটু জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের মধ্যে পথ থেকে প্রায় হাজার-বারো-শ ফুট উপরে আছে একটা প্রাচীন সৌধের ভগ্নাবশেষ। কেল্লা বা প্রাসাদ বলে মনে হয় না—গড়নের ধাঁচটা অনেকটা মন্দিরজাতীয়।—বহুবার এই পথে যাতায়াত করেছি, প্রতিবারই মনে হয়েছে পাহাড়ে উঠে জিনিসটা একবার দেখে আসি, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠে নি।

এবার বড়দা জিদ্ ধরেছেন, তিনি যাবেনই। রাধিকা ও সমর তাঁর সঙ্গে যাবে—তাদের উঠতি বয়স, কৌতূহল ও আনন্দের চাঞ্চল্যে জীবন ভরপুর। কিন্তু হায়, আমার যাবার উপায় নেই। বাতগ্রস্ত কটিদেশ এখনও কায়েমী ভাবে জখম হয় নি বটে, তবে মাঝে মাঝে কটাস্ করে অপ্রত্যাশিত কামড় দিয়ে এমন অসহায় ভাবে পথে বসিয়ে দেয় যে সর্বদা সতর্ক হয়ে চলতে হয়, সঙ্গে লাঠি রাখতে হয়। চিনিবাবুও যাবেন না—গাড়ি-ছাড়া হয়ে পড়লে কোন রকম আনন্দ তো দূরের কথা, একটু স্বস্তিও তিনি কখনও অনুভব করতে পারেন না—এক মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। বড়দার দল গাড়ি

থেকে নেমে পড়তেই সীটের উপর কোনাকুনি গা ঢেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'ব্যস্! অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে নিশ্চিন্দি। আসুন যাদুবাবু, আরাম করে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।'

শীতের দুপুর গড়িয়ে গেছে, গাড়ির মধ্যে তেরছা হয়ে রোদ এসে পড়েছে—ঘুমুলে অবশ্য ঘুমটা খুব আরামেরই হবার কথা। কিন্তু চিনিবাবুর মত যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়বার আর্ট আমার আয়ত্ত হয় নি কোনদিনই। প্রয়োজনও হয় না, কারণ গাড়ি চড়ে বেড়াই বটে, কিন্তু গাড়ি চালাতে জানি না—ভ্রমণের ফলে আনন্দ বা উত্তেজনা যতই হ'ক না কেন, স্নায়বিক ক্লান্তিতে আমাকে কখনও ভুগতে হয় না।

অভিযাত্রীদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত গেলাম—দেখলাম, পথ বলতে বিশেষ কিছুই নেই, একটা অস্পষ্ট পদচিহ্নের নিশানা মাত্র রোদে-পোড়া ঘাসের মরা সবুজের উপর পিঙ্গলতর রেখার আভাস টেনে আগাছার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে উপর দিকে উঠে গেছে। ঈশ্বর ও রাধিকা ঠিকই উঠে যাবে, কিন্তু বড়দার কষ্ট হবে। নিষেধ করে কোন লাভ নেই—স্বাভাবিক একগুঁয়েমির সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেস্টিজের প্রশ্নও আছে, সুতরাং কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করা যাবে না। তিনি উঠবেনই। সুতরাং নীরবে হাতের লাঠিটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে পিছন ফিরলাম।

বেশ কিছুক্ষণ একা একা থাকা যাবে। পথের পাশে গাড়ির মধ্যে চিনি-বাবু এতক্ষণ নিশ্চয় নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছেন। পথেও লোকজন বা গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় বেশি নেই—মাঝে মাঝে যা দুই-একখানা লরি বা বাস ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা আমার চেতনাবৃত্তের পরিধিপ্রান্ত স্পর্শ করে যাচ্ছে মাত্র, কেন্দ্রে কোন চাঞ্চল্যের ঢেউ তুলছে না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছি—মন ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ নির্জনতার শান্ত রসে অভিষিক্ত হয়ে উঠছে।

পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে একদল ছোট ছোট শুয়াপাখি অকারণে

লাফালাফি করছে—ঝোপটা থেকে থেকে থর্ থর্ করে পত্র-পল্লব কাঁপিয়ে যেন নেচে উঠছে ; আর তার সঙ্গে অত্যন্ত মিহি সুরের পিক্ পিক্ আওয়াজে সমবেত সঙ্গত চলছে। দুটো ঘুঘু একটানা আক্ষেপোক্তির দ্বৈত-সঙ্গীত চালিয়ে যাচ্ছে—বোধ হয় মান-অভিমানের পালাই হবে, কিন্তু তারও সুর খুব নীচু পর্দায় বাঁধা। হঠাৎ বহু দূর থেকে একটা কাঠঠোকরার দ্রুতচালের গিটকিরি বাতাসে ভেসে এল, কী—ক্—কিট্—কিট্—কিট্—কিট্—র্—র্—র্! কাঠঠোকরার তীব্রস্বরও যেন জলতরঙ্গের মূর্ছনার মত মধুর শোনাচ্ছে।

বেড়াতে বেরুলে নির্জনতার প্রশান্তি প্রতিদিনই উপভোগ করতে পাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রাঙ্গণে সম্পূর্ণ একলা থাকার আনন্দ যখন-তখন জোটে না। মনের আকাশ যখন কার্যকারণ-চিন্তার কুয়াশা ও আলাপ-আলোচনার ধোঁয়া আর ধূলো থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল আয়নার মত পরিবেশের প্রতিটি রঙ প্রতিটি রেখা নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত করতে থাকে, সেই বিরল মুহূর্তগুলি জীবনে খুব ঘন ঘন আসে না। যখন আসে তখন সমগ্র প্রাণসত্তা একটা অপূর্ব পুলকদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য মগজ হাল ছেড়ে দিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, কালপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়—অনুভূতির অন্তরতম প্রদেশে শুধু একটা একটানা আনন্দ-স্পন্দন চলতে থাকে।

পথ থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি। ডানদিকের সৌধশীর্ষ পাহাড়টার গায়ে বড়দা সমর ও রাধিকাকে তিনটি ছোট্ট ছোট্ট পুতুলের মত দেখাচ্ছে। এখনও ওরা অর্ধেক পথও উঠতে পারে নি। আমার সামনে আর একটা ছোট পাহাড়—পাহাড় না বলে তাকে বোধ হয় টিলা বললেই ভাল হয়। তার উপর অনেকগুলো ছোটবড় সাদা পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে—দেখলে মনে হয় যেন মাটির গায়ে মস্তবড় একটা সবুজ রঙের আব গজিয়েছে, তার উপর অসংখ্য ছোট ছোট সাদা সাদা আঁচিল। টিলার গায়ে ঢালুর উপর বড় একপাল ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চল পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তাদের সাদা-কালো-খয়েরী দেহের আনাগোনা একটা বিচিত্র ধরনের

বর্ণাবর্তের সৃষ্টি করছে। আধ-শুকনো ঘাস আর পাতালতা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে,—মাঝে মাঝে অকারণ আনন্দে লাফিয়ে উঠছে, ছুটোছুটি করছে। দুই একটার গলায় ঘণ্টা বাঁধা—টুং টাং করে বাজছে। সবসুদ্ধ দলটার গতি উর্ধ্বমুখী। দেখলেই বোঝা যায়, চরে বেড়াবার আনন্দ যতখানি আছে, টিলার মাথায় চড়বার উৎসাহও তার চেয়ে কম নয়।

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই ছাগলের পালের মালিকদের সন্ধান মিলল। মস্ত বড় একখানা পাথরের আড়ালে বসে ছিল বলে এতক্ষণ দেখতে পাই নি।

দু পাশে গুটি পাঁচ ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে পা ছড়িয়ে পাথরে ঠেস দিয়ে আরাম করে যেন আসর জাঁকিয়ে বসে আছে এক বুড়ি। চাপা স্বরে কল্‌বল্‌ করে কথা বলছে ছেলেমেয়েগুলো, বুড়ি চুপ করে অলস স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার এদিকে একবার ওদিকে ফিরে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে—শুধু মুখচোখ নয়, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন প্রশান্ত প্রসন্নতা ঝরে পড়ছে।

এই অঞ্চলের দেহাতী গৃহস্থঘরের গৃহিণীদের সাজপোশাক সাধারণত যেমন হয়ে থাকে, বুড়িরও তেমনি। পরনে একখানা মোটা আধময়লা লালরঙের শাড়ি, গায়েও লালরঙের হাতকাটা কুর্তা, পায়ে ও হাতে একগোছা করে ভারী রুপোর গয়না, কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত দুই বাহুর নিম্নাংশ সবুজ কালিতে আঁকা উল্‌কির ফুলকারিতে বোঝাই। মাথায় আড়ঘোমটার নীচে ঈষৎ অবিন্যস্ত পাকা চুলের সিঁথিতে লাল-টক্‌টকে তেল-সিঁদুরের প্রশস্ত রেখা—

এই পর্যন্ত এসেই আমার নিরুৎসুক দৃষ্টি হঠাৎ তার ঔদাসীন্য হারিয়ে ফেলল। বুড়ির মুখখানা সত্যিই অসাধারণ, মাত্র বিশ বছর আগেও বোধ হয় এ মুখের দিকে চাইলে সহজে কেউ চোখ ফেরাতে পারত না। এদেশী মেয়েদের মুখের রঙ—তা সে যতই সুন্দর হ'ক না কেন—খানিকটা রোদে-পোড়া লালচে বা তামাটে ধরনের হয়ে থাকে। বুড়ির মুখের রঙ ধবধবে ফরসা—এত ফরসা যে তার তুলনায় কপালের ফিকে নীল উল্‌কির টিপটাকে

কুচকুচে কালো বলে মনে হচ্ছে। তোবড়ানো গাল ও কোঁচকানো চামড়া সে রঙের লাবণ্য একটুও হরণ করতে পারে নি, বরং বার্ধক্যের রেখা-কুঞ্চনের ফলে সমগ্র মুখখানা একতাল অযত্নরক্ষিত নবনীতের পেলবতা লাভ করেছে। পাতলা ওষ্ঠাধরে এখনও পুরাতন লালিমার আভাস লেগে রয়েছে—বুড়ি পান-তামাকের বিশেষ ভক্ত নয় বলেই মনে হল। কোটরগত হলেও দুই চোখের দীর্ঘায়ত ভঙ্গি এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

বার্ধক্য এত সুন্দর হতে পারে!

বুড়ির মুখের উপর শুধু অসাধারণ রূপের নয়, অপরিসীম পরিতৃপ্তির ছাপও সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। দুঃখ নেই, গ্লানি নেই, কারও বিরুদ্ধে কোন রকম নালিশ নেই—বুড়ির মনের মণিকোঠায় যেন সর্বক্ষণই আনন্দের রত্নপ্রদীপ জ্বলছে, তারই অক্ষয় দীপ্তি ভিতর থেকে তার সমগ্র মুখমণ্ডলকে উদ্‌ভাসিত করে তুলেছে।

বার্ধক্য এত সুখীও হতে পারে!...

—'এ নানী, নানী গে, এক কহানী শুনাও তো!'

তীব্র সরু সুরের দীর্ঘায়িত চীৎকার—বুড়ি দিদিমার হাঁটু ধরে নাড়া দিতে দিতে নাতনী আবদার ধরেছে, রূপকথা শোনাতে হবে।

একগাল দন্তহীন হাসি হেসে বুড়ি সোজা হয়ে উঠে বসল। তার পর পরম স্নেহে নাতনীর থুতনিটি ধরে তালে তালে পা দুলিয়ে দুলিয়ে সুর করে ইনিয়ে বিনিয়ে কি একটা লম্বা ছড়া আউড়ে গেল—ছড়ার ছন্দ পূর্ণচ্ছেদে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ের দল হাততালি দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

বুড়িও হাসছে। আনন্দ তারই যেন সবচেয়ে বেশি—হাসির উচ্ছ্বাসও তাই সবচেয়ে অনর্গল। হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ছে; হাসির দমকে ফরসা মুখ সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠেছে, মাথার কাপড় কাঁধের উপর খসে পড়েছে।

বুড়ির হাসি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কি যেন একটা

দুরন্ত আলোড়ন শুরু হয়ে গেল—কেমন যেন একটা বোবা আবেগ চাপা কান্নার মত অনেক নীচে থেকে বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড বড় বুদ্বুদ ফানুসের মত ফুলে ফেঁপে উঠছে—এখুনি বুঝি ফেটে পড়বে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আমার সমগ্র সত্তাও বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। কিছুই বুঝতে পারছি না স্পষ্ট করে। কি যেন ছিল—কি যেন হারিয়েছি—আবার কি যেন ভাল করে ধরবার আগেই হাত পিছলে পালিয়ে যাচ্ছে! মন্ত্রমুগ্ধের মত এক পা এক পা করে বুড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

বুড়ি তখনও হাসছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল—তখন আমি ওদের এত কাছে এসে পড়েছি যে খুঁটিনাটি কিছুই আর আমার নজর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই—স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বুড়ি যত হাসছে তার আনন্দ-কৌতুক-মথিত মুখের উপর বাঁশির মত টিকলো ধবধবে ফরসা নাকটা ততই থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। হাসি যখন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, নাকের ডগাটা তখন কাঁপতে কাঁপতে কেমন এক বিচিত্র ভঙ্গিতে ডানদিকে একটু বেঁকে পড়ছে।

বুড়ি হাসছে, তার নাক কাঁপছে—অসহায় মোহগ্রস্ত জীবের মত নিবদ্ধ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা মনে হল আমারও সর্বশরীর ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে। চারপাশের চেনা জগৎ কাঁপছে—হাওয়ার ঝাপটা-লাগা পাড়াগেঁয়ে থিয়েটারের ছবি-আঁকা পর্দার মত দুলে দুলে কেঁপে উঠছে। পাহাড়-পাথর গাছপালা আকাশ-বাতাস সব কাঁপছে। পায়ের নীচে ভূমিকম্পের ভূতে-পাওয়া পৃথিবীটাও কাঁপছে।—তার পর চোখের সামনে দিনের আলো কাঁপতে কাঁপতে মলিন হয়ে উঠতে লাগল; তার পর আর আলো নেই—নিঃসীম নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য ঘূর্ণিবাত্যার আলিঙ্গনে তৃণখণ্ডের মত আবর্তিত হচ্ছি। নীচে মাটির অবলম্বন নেই, উপরে আকাশের সান্ত্বনা নেই—অন্ধকার মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে আমাকে হু-হু করে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে!……

ফুটফুটে জ্যোস্না-রাত। সারাদিনের পচা গুমোটের পর এখনে হাওয়া ছেড়েছে। কলকাতা শহর গা এলিয়ে আরাম করছে। নীচের সরু গলি থেকে বেলফুলওয়ালার চড়া গলার হাঁক ও মালাই-বরফওয়ালার শ্রান্ত কণ্ঠের ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই দুর্বল দীর্ঘনিশ্বাসের মত ভাঙা গলার কাঁপা-কাঁপা আওয়াজ শোনা যাবে: 'মুশ্‌কি-ল্ আসা-ন। যাঁহা মুশ্‌কি-ল্ তাঁহা আসা-ন!' তখন আমরা সবাই মিলে আলসের উপর দিয়ে উঁকি মেরে মগ্‌বাতি- ও বাঁকা-লাঠি-হাতে পাকা-দাড়িওয়ালা সেই বুড়ো ফকিরকে দেখে আসব।

আপাতত রূপকথার আসর বসেছে। জল ঢেলে জুড়িয়ে নেওয়া ছাদের উপর মস্ত বড় পাটি পেতে আমরা গুটি-আষ্টেক ছেলেমেয়ে জমায়েত হয়েছি—রাজুপিসি রূপকথা বলছে। আমি একেবারে তার কোল ঘেঁষে বসে আছি, পাছে সে হঠাৎ হারিয়ে যায় এই ভয়েই বোধ হয় তার হাঁটুর উপর হাত চেপে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছি। রাজুপিসির মুখ আর রাজুপিসির মুখের কথা—এ ছাড়া আমার সমগ্র চেতনার রাজ্যে আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

বনোয়ারি জেঠার মেয়ের বিয়েতে মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসেছি। সম্পর্কটা মোটেই নিকট নয়, অত্যন্ত অস্পষ্ট ধরনের, কিন্তু সম্পর্কের তুলনায় পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি। কাজেই বিয়ের হাঙ্গামা চুকে যাবার পরও কিছুদিন রয়ে গেছি। আরও দুই-একটি পাড়াগেঁয়ে আত্মীয় পরিবার আমাদেরই মত নিখরচায় কলকাতা-প্রবাসের সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন। সেই আমার প্রথম কলকাতায় আসা। বাড়ির ঝাড়পোঁছের চাকর এতোয়ারিকে সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে আজ চিড়িয়াখানা, কাল জাদুঘর, তার পরদিন হয় পরেশনাথের মন্দির না হয় তো হাবড়ার পোল (হায়, সে পোল আর নেই!)—এই করে বেড়াচ্ছি। এতোয়ারি চাকর হলে কি হয়, খুব শৌখিন মানুষ, বেশি দূর পায়ে হেঁটে ঘোরার তকলিফ করতে সে নিতান্তই নারাজ। কাজেই সেকেন ক্লাস ট্রামগাড়ির ছারপোকা-সঙ্কুল কাঠের বেঞ্চিতে বসে ঘর্ঘর-ঝঞ্ঝনার আবহ-সঙ্গীত সহযোগে 'কলকাতা-ভ্রমণের স্বর্গ-সুখ প্রাণ ভরেই

উপভোগ করছি। তা ছাড়া এতোয়ারি লোকটিও বড় ভাল ছিল, আমাদের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রকাশ করে বলবার আগেই সে তা পূরণ করে দিত। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বনোয়ারি জেঠা তার হাতে পয়সা দিয়ে বলতেন, 'ওরে, ওদের ভাল করে জলখাবার খাওয়াবি, চর্বি-মেশানো ঘিয়ের ভাজাভুজি বা অন্য কোন বাজে জিনিস যেন খাওয়াস নি, শুধু সন্দেশ আর রসগোল্লা, বুঝলি?' এতোয়ারি আমাদের খাওয়াত ঝালছোলা, সাড়ে বত্রিশ ভাজা, আলুকাবলি, নকলদানা আর গোলাবি রেউড়ি। বলত, 'বাড়িতে গিয়ে যেন বলে দিও না বাবুরা, তা হলে দিদিমণি আর আমাকে আস্ত রাখবে না।'—দিদিমণি অর্থাৎ রাজুপিসি।

বাইরে এতোয়ারি আর ভিতরে রাজুপিসি। রাজুপিসি বিধবা। কথাটা তখনই শুনেছিলাম, মানে কিছুই বুঝি নি, বোঝবার প্রয়োজনও অনুভব করি নি। তবে দেখতে পেতাম, বিয়ের কাজকর্মে সে মোটেই হাত দিত না, ওদিকে ঘেঁষতই না। সে থাকত আমাদের অর্থাৎ ছেলেপুলের দলকে নিয়ে; আমাদের নাওয়াত খাওয়াত, খেলাধুলো দিয়ে ঠাণ্ডা রাখত, হাজারো রকমের দৈনন্দিন আবদার নালিশ আর ঝগড়ার নিষ্পত্তি করত, আর রাত হলেই ছাদের উপর আসর বিছিয়ে রূপকথা শোনাত। সে কত রকমের রূপকথা—সবুর রাজপুত্তুরের কথা, অগ্নীশ্বর গণ্ডারের কথা, কেশবতী রাজকন্যার কথা, সোনার কাঠি রূপোর কাঠির কথা!

রূপকথা আরও অনেকের মুখে শুনেছি, কিন্তু সে শুধুই কথা। রাজুপিসির মুখেই প্রথম রূপকথার রূপ দেখতে পাই। যারা রূপসী নয় তারা রূপকথা বলবে কি করে? রাজুপিসির মুখের সাধারণ কথাও আমার কানে রূপকথার মত মিষ্টি শোনাত।

রাজুপিসি ছিল অপরূপ রূপসী মেয়ে। দশ বছরের ছেলের চোখে দেখা নারীর রূপ, ক্লেদ-কলুষিত জীবনের অপরাহ্ণে দাঁড়িয়ে সে রূপের বর্ণনা দেবার চেষ্টা করার অর্থ শুধু শৈশবস্মৃতির মর্মরমূর্তিকে পাঁকের পুতুলে পরিণত করা। তবে একথা আজও স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, রাজুপিসি দশ জনের এক জন ছিল

না। সে ছিল অসাধারণ। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্য-রাজ্যের মহীয়সী সম্রাজ্ঞী। বাড়ির সবাই তাকে দস্তুরমত সমীহ করে চলত। আমরা তাকে এত কাছে পেয়েছিলাম, কিন্তু আমরাও তাকে ভয় করতাম।

রূপেও সে স্বতন্ত্র ছিল। পাড়াগাঁয়ে সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই, কিন্তু আমার চোখে তাদের সবাইকে কেমন যেন সাদামাটা আটপৌরে ধরনের ঠেকত। রাজুপিসি ছিল একদম পোশাকী মেয়ে। আমার মনের মধ্যে সেই শৈশবেই রোমান্সের আয়না-আলমারি আতর-গোলাপজল বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠনের গন্ধ ও জৌলুষে ভরপুর একটা মায়ামহল গড়ে উঠেছিল। রাজুপিসির সিংহাসন পড়েছিল সেই মহলের মাঝখানে। বনোয়ারি জেঠার বাড়িতেও অন্য যে সব মেয়েদের দেখেছিলাম তাদের কথা মনে হলেই মনে পড়ে হাতিপাড় পাছাপাড় শান্তিপুরী শাড়ি-পরা, এক-গা ভারী ভারী গহনার বোঝা-টানা, পানদোক্তা-ও পরচর্চা-সর্বস্ব কতকগুলি গোলগাল নরম নরম জীবের কথা। তাদের মধ্যে রাজুপিসি—সে যেন প্রদীপ ও জোনাকির রাজ্যে জ্বলন্ত বিদ্যুল্লেখা। দীর্ঘ একহারা বাহুল্য-বর্জিত ছিমছাম-চেহারা, শরৎপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত পরিচ্ছন্ন ধবধবে গায়ের রঙ, বুদ্ধিদীপ্ত ঈষৎ প্রখর মুখশ্রী, পরনে কালো ভেলভেট-পাড় ফুরফুরে সাদা ধুতি, নিরাভরণ দুই বাহুর মণিবন্ধে দুগাছি মাত্র সরু সোনার চুড়ি। চোখ বুজলে এখনও আমি রাজুপিসিকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

সেই আমার প্রথম প্রেম। দশ বছরের ছেলের প্রেম, আর সেই প্রেম যার উদ্দেশে নিবেদিত তার বয়স অন্তত-পক্ষে একুশ-বাইশ! আপনারা বোধ হয় হাসছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি হাসির গল্প লিখতে বসি নি। আমার সে প্রেম হয়তো সত্যিই 'নিকষিত হেম' ছিল, যার সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি বলেছেন, 'কামগন্ধ নাহি তায়'। সুতরাং সে প্রেম আপনাদের কাছে হাস্যকর বস্তু হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা যদি প্রেমের গভীরতার পরিমাপ হয়, তাহলে সে প্রেম অপর কোন বয়সের কোন মানুষের প্রেমের চেয়ে কোন অংশেই খাটো ছিল না, এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

বাইরে বাইরে ঘুরতাম, অনেক সময় তফাতে থাকতে বাধ্য হতাম, কিন্তু যেই রাজুপিসির কাছে এসে দাঁড়াতাম, মনে হত যেন আমার মধ্যে হঠাৎ দপ করে আনন্দের রঙমশাল জ্বলে উঠেছে, সব কিছু রঙিন হয়ে উঠেছে, মধুর হয়ে উঠেছে। রূপকথার আসরে আর সব ছেলেমেয়েরা যখন রাজুপিসির মুখের কথা শুনত, আমি তখন হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু রূপ দেখতাম।

আমার ডাক-নাম যাদুগোপাল—বিশ্রী নাম! রাজুপিসি ডাকতো যাদুমণি বলে। অনেকখানি স্নেহের সঙ্গে সামান্য একটু বাঁকা ব্যঙ্গের রসান দিয়ে ঝক্‌ঝকে মিষ্টি গলায় ঐ নামে যখন সে আমায় ডাকত, আমার সমস্ত দেহের মধ্যে যেন পুলকের জোয়ার জাগত, বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠত, গলা বন্ধ হয়ে কেমন যেন হাঁপ ধরার মত হত, মনে হত ছুটে গিয়ে তাকে জাপ্‌টে ধরি, তার পর নিজেকে নির্মম ভাবে ভেঙে-চুরে গুঁড়ো করে ফেলে তার দেহের মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিই।......

বনোয়ারি জেঠার বড় ছেলে মানিক ছিল আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। মহা ওস্তাদ ছেলে। মাথার চুল ফাঁপিয়ে অ্যালবার্ট টেরি কাটে, পান খায়, শিশ দিয়ে গান গায়, আবার শুনতাম মাঝে মাঝে নাকি রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে থিয়েটার দেখতে যায়। একদিন আর কাউকে কাছে না পেয়ে মনের আবেগে তার কাছেই বলে বসেছিলাম, 'সত্যি মানিকদা, তোদের রাজুপিসি কত ভাল রে! তোদের কি মজা, দিনরাত রাজুপিসির কাছে থাকতে পাস্‌।'

মানিকদা ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'হুঃ! ভাল না ছাই! বাক্স-ভর্তি গয়না টাকা, অথচ চাইলে একটা পয়সা দেয় না। হাড়কেপ্পন বজ্জাত কোথাকার!'

মনের প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বিচার করলে তখুনি একটা খুনোখুনি হয়ে যাবার কথা। কিন্তু নিজের হাড়জিরজিরে পাকাটির মত শরীরের উপর বিন্দু-মাত্র ভরসা ছিল না। ম্যালেরিয়ায় শুধু দেহই কাবু করে না, মনকেও দুর্বল করে

ফেলে। জানতাম, মানিকদার মত থাজাগুণ্ডার হাতের একটিমাত্র থাপ্পড়ই আমাকে ধরাশায়ী করে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। তাই কোনমতে চোখের জল চেপে পিছন ফিরে প্রায় ছুটতে ছুটতে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। অসহায় আক্রোশে শুধু বার বার মানিকদাকে নীরবে অভিসম্পাত করেছিলাম, 'তুই মর্, তুই মর্, মর্, এখুনি মরে যা।' · ···

দেশে ফেরবার দিন খুব কেঁদেছিলাম, কিন্তু কেন কেঁদেছিলাম কেউ তা বুঝতে পারে নি। রাজুপিসি একটুও কাঁদে নি—হেসেছিল।

পাঁচ বছর পরে আবার কলকাতায় এলাম—হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ব। প্রথম দিনই সন্ধ্যাবেলায় খুঁজতে খুঁজতে সিমলে পাড়ার এঁদো গলির মধ্যেকার সেই পুরনো চুন-বালি-খসা দোতলা বাড়িটার সামনে গিয়ে পৌছুলাম। কড়া নাড়তেই অচেনা চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

ভিতরে ঢুকে নজরে পড়ল একতলায় ভাঁড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় জেঠাইমা বসে কুটনো কুটছেন। গিয়ে প্রণাম করতেই চিনতে পারলেন, আশীর্বাদ করলেন, পিঁড়ি পেতে বসতে দিলেন। তার পর শুরু হল কুশল-প্রশ্নের ধারাবর্ষণ। সে আর ফুরুতেই চায় না। অবশেষে আমি অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, 'রাজুপিসি বোধ হয় উপরে আছে, যাই একবার দেখা করে আসি।'

জেঠাইমা হঠাৎ কুটনো কোটা থামিয়ে মুখ তুলে আমার দিকে অনেকক্ষণ গম্ভীর ভাবে চেয়ে রইলেন, তার পর আস্তে আস্তে বললেন, 'ও! তোরা খবরটা পাস নি বুঝি? তোর রাজুপিসি তো আর নেই, চার বছরেরও বেশি হল কলেরায় মারা গেছে।' তার পরই ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে ও কি! এখুনি চললি কেন? বোস্ বোস্! ওরে ও যাদু, এতদিন পরে এলি, একটু চা খেয়ে যা বাবা!'

পিছন না ফিরেই ধরা গলায় উত্তর দিলাম, 'আজ থাক জেঠাইমা, আর একদিন এসে খেয়ে যাব।' হন হন করে বাইরের দিকে চললাম। পচা

বাড়িটা যেন জগদ্দল পাথরের মত বুকের উপর চেপে বসেছে, আর কিছুক্ষণ এর মধ্যে থাকলে বোধ হয় দম ফেটেই মরে যাব।

সদর দরজার ঠিক সামনের গলিতে মানিকদার সঙ্গে দেখা হল। রোগা শুঁট্‌কো হাড়গিলের মত চেহারা হয়ে গেছে, পরনে আধময়লা লুঙ্গি আর ফতুয়া; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। আমাকে দেখে শ্লেষ্মা-বসা ভাঙা গলায় হাঁক দিয়ে উঠল, 'কে রে? যেদো না? তুই কোত্থেকে এসে হাজির হলি? আর এলিই যদি তো এখুনি ছুটে পালাচ্ছিস কোথা? চ', চ', ওপরে চ', নিরিবিলি বসে দুটো মনের কথা কই। এত কাল পরে দেখা হল!'

ততক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়েছি। তার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'না মানিকদা, আজ আর বসব না। হঠাৎ রাজুপিসির মৃত্যুসংবাদ শুনে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেছে। এখন আছিই তো কলকাতায়, আর একদিন আসব।'

মানিকদার দুই চোখের মধ্যে একটা কৌতুকের হাসি চক্‌চক্ করে উঠল: 'তোকেও বুঝি মা বলল সেই কথা? কলেরায় মরেছে?—মরেছে না আমার ইয়ে করেছে! ভেগেছে, বুঝলি যেদো? বেরিয়ে গেছে। সেই যে এত্তোয়ারি বলে একটা খোট্টা চাকর ছিল বাড়িতে, তারই সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। নচ্ছার খানকী মাগী, পাড়ার লোকের কাছে আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেছে!'

কানে আঙুল দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলাম।

নানা কথার ভিড়ে একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। রাজুপিসি বড় হাসকুটে মেয়ে ছিল, যখন-তখন হাসত, হেসে গড়িয়ে পড়ত। আর যখনই সে হাসত তখনই তার বাঁশির মত টিকলো ধবধবে ফরসা নাকটা থর থর করে কাঁপত। হাসি যখন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত নাকের ডগাটা তখন কাঁপতে কাঁপতে কেমন এক বিচিত্র ভঙ্গিতে ডানদিকে একটু বেঁকে পড়ত।...

আজ মাঝে মাঝে মনে হয়, সেদিন যদি অমন পাগলের মত দু হাতে মুখ চেপে বুড়ির সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে না এসে সোজা তার সামনে গিয়ে

দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, 'রাজুপিসি না? কেমন আছ? আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যাদু, তোমার সেই যাদুমণি!'—তা হলে বুড়ি কি করত?

হো হো করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বেহায়া বিদ্রূপের ফুৎকারে আমাকে উড়িয়ে দিত?

না মুখের দিকে চেয়ে দেখেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিত?

না মৃত অতীতের অন্ধকার থেকে উঠে-আসা এই প্রেতমূর্তির আকস্মিক আহ্বান শুনে আতঙ্কে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যেত?

তেরো

In this lines poet said that he is borned among the poors and when he shall be died he did not liked to went to heaven.......

পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। দেখতে দেখতে বহুকাল আগে শোনা একট গল্প মনে পড়ে গেল—গালগল্প নয়, সত্য ঘটনা।

কলেজে পড়বার সময় একজন সহপাঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে ছিল 'ক্যারা বাঙালী' অর্থাৎ তাদের পরিবার জাতিতে বাঙালী বটে, কিন্তু বহু প্রাচীন কাল থেকেই তারা উড়িষ্যা প্রদেশের অধিবাসী।

গল্পটা বন্ধুর বাবার সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন সেকেলে ইংরেজিনবিশ, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। এম্-এ পাস করে দেশে ফেরবার দু-চারদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রথম চাকরি পেয়ে যান—গৃহশিক্ষক হিসাবে স্থানীয় কোন নেটিভ স্টেটের যুবরাজকে পড়াতে হবে। মোটা মাইনের চাকরি—কাজেই প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা যখন রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন, উল্লাসের উত্তেজনায় তখন তাঁর মানসিক আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু প্রথমেই দেখা হল দেওয়ানজির সঙ্গে, এবং এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে

যুবরাজ সম্বন্ধে তিনি যে তথ্যাদি আহরণ করলেন তাতে তাঁর উৎসাহের বেলুন বেশ খানিকটা চুপ্‌সে গেল। যুবরাজের এখনও পর্যন্ত বর্ণপরিচয় হয় নি। শিকার ও আরও দু-চারটি যুবরাজোচিত ব্যসন ব্যতীত কোন বিদ্যাই তাঁর আয়ত্ত হয় নি। এম্-এ-পাস শিক্ষক মহাশয়কে একেবারে অ-আ-ক-খ থেকেই শুরু করতে হবে।

কিন্তু মাইনেটা সত্যিই মোটা অঙ্কের ছিল।......সুতরাং যথাকালে শিক্ষক মহাশয়কে পাঠকক্ষে নিয়ে গিয়ে যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হল। ছাত্রের ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ নবজলধরকান্তি চেহারা ও মুখের ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ-জোড়াটি দেখেই ভদ্রলোকের পেটের পিলে চম্‌কে গিয়েছিল, কিন্তু তবু তিনি হাল ছাড়েন নি। অভিবাদনাদি বিনিময়ের পর যুবরাজের সামনে ওড়িয়া বর্ণপরিচয়খানি খুলে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন :

—'অবধঁড়, শ্রীমুখে স্বরে-অ কহন্তু।'

গোঁফের নীচে গুণ্ডিপানের ছোপ-ধরা দাঁতের ঈষৎ আভাস জানিয়ে শুধু একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল—শিক্ষক মহাশয় আবার কাতর কণ্ঠে মিনতি জানালেন :

—'শ্রীমুখে স্বরে-অ কহন্তু।'

এবার যুবরাজ গম্ভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় উত্তর দিলেন :

—'ন কহিব।'

ব্যস্! ঐখানেই ইতি। শিক্ষক মহাশয় আরও দুদিন রাজবাড়িতে গিয়েছিলেন—অনেক সাধ্যসাধনা অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিলেন, কিন্তু যুবরাজের মুখ থেকে আর একটা কথাও তিনি বের করতে পারেন নি।

প্রথম যখন গল্পটা শুনি, খুব হেসেছিলাম—কিন্তু এখন আর হাসি না। বরং অতীতযুগের সেই অজ্ঞাতনামা দৃঢ়চেতা মিতভাষী রাজকুলর্ষভের কথা মনে হলে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা হেঁট হয়ে আসে। আহা, বঙ্গজননীর যে সব

লক্ষ লক্ষ বুকের-দুলাল অঞ্চলের-নিধিরা প্রতিদিন ইস্কুলে কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করছে তাদের যদি তাঁর মত নৈতিক সাহস থাকত! প্রথম যেদিন তাদের কানে এ-বি-সি-ডি-র মূলমন্ত্র ফুঁকে ইংরেজী বিদ্যায় দীক্ষা দেওয়া হয় সেদিন যদি তারা তাঁরই মত বুক ফুলিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে সদর্পে ঘোষণা করতে পারত,—'ন কহিব,'—তাহলে দেশের ও দশের মঙ্গলামঙ্গল কি হত তা জানি না, তবে আমাদের অর্থাৎ হাজার হাজার হতভাগ্য মাস্টারের খাতা-দেখার এই নরকযন্ত্রণার হয়তো কিছুটা উপশম হত।......

খোলা খাতা সামনে রেখে ভাবনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে যখন এতটা পর্যন্ত এসে পড়েছি ঠিক সেই সময়ে বাইরের দরজার পর্দা সরিয়ে একটি মুণ্ড ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। মুণ্ডটি অপরিচিত, সুতরাং একবার মাত্র সেদিকে চেয়েই মুখস্থ বলার মত আউড়ে গেলাম, 'ব্রজগোপালবাবুকে চাই তো? পাশের গলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে সোজা তিন-তলায় চলে যান।'

তিনতলার ফ্ল্যাটের ব্রজগোপালবাবু একজন মেজো-সেজো পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মী ও দেশনেতা, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একতলার বৈঠক-খানাটি সদর রাস্তার ঠিক উপরেই অবস্থিত। কাজেই এই ধরনের বিনি-মাইনের দারোয়ানের কাজটি আমাকে হামেশাই করতে হয়—দিনের মধ্যে কম-সে কম দশবার ঐ একই বাঁধাবুলির পুনরাবৃত্তি করে যাই।

কিন্তু মুণ্ডটি অপসারিত হল না, পরন্তু সবাক্ হয়ে উঠল: 'আমি ব্রজগোপালবাবুকে চাই নে, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।'

একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'অ—, তা আপনি ভিতরে আসুন।'

মুণ্ডের পিছন পিছন ধড়টিও এবার পর্দা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকল। দেখলাম, দোহারা চেহারার একটি হ্রস্বকায় যুবক—কালো কুচকুচে রঙ, মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুল, গোল মুখ, ঈষৎ থ্যাবড়ানো নাক। কুশ্রী তো বটেই, কুৎসিতও বলা চলে। পূর্বে কোথাও কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসুন আমার কাছে আপনার কি দরকার ?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, 'কথাটা পাড়তে একটু ভয় ভয় করছে। একটা অন্যায় আবদার—পাছে আপনি কিছু মনে করেন—'

ভাল রে ভাল ! চেনা নেই শোনা নেই, তার আবার আবদার কি রে বাপু ! মনে মনে একটু অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। তবু শান্ত স্বরেই বললাম, 'কোন ভয় নেই। আপনি নির্ভয়েই বলুন।'

—'আচ্ছা বলছি, কিন্তু আপনি আমার বাপের বয়সী—আপনি যদি আমার সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেন তাহলে আমি আরও নার্ভাস হয়ে পড়ব—কিছুই বলতে পারব না।'

ছোকরার কথাবার্তা তো বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে ! একটু হেসে বললাম, 'বেশ, এখন থেকে তুমিই বলব। এইবার বলে ফেল—আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিল, 'দেখুন, আমি জানতে পেরেছি আপনারা কয়েকজন বন্ধু মোটরে করে মানভূম-হাজারিবাগ-রাঁচি অঞ্চলে প্রায়ই বেড়াতে যান। আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই—'

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে কি একটা আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বিনীত ভাবে বাধা দিয়ে সে বলতে লাগল, 'আমার কথাটা আগে শেষ পর্যন্ত শুনুন।—আমি জীবনে কখনও কলকাতার বাইরে যাই নি। কিন্তু মনে মনে দেশভ্রমণের ইচ্ছেটা খুবই প্রবল—মানে রেলগাড়িতে চড়ে হোটেলে বাস করে দেশভ্রমণ নয়, পথে পথে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, সাধারণ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের সুখদুঃখের খোঁজ-খবর নেওয়া—এই সব আর কি। অর্থাৎ মোটরে বেড়াতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু আমার তো মোটর নেই—মোটর কেনবার পয়সাও নেই। আরও দু-একজনের সন্ধান করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা বড্ড বেশি বড়লোক, তাছাড়া দুই একবার ভ্রমণের পরেই তাঁদের ও শখ মিটে গেছে। শুনেছি আপনারা নাকি বার বার যান, তাই—'

ছেলেটার মুখের উপর একটা করুণ সারল্যের ছাপ, একটু বোকা-বোকা হাসি—কুৎসিত মুখখানাকে আর তত কুৎসিত মনে হচ্ছে না। তবু একটু শক্ত হয়ে বললাম, 'তা কি করে সম্ভব হয়, বল। আমাদের এই ভ্রমণের বাতিক—এ শুধু আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তুমি একটা বাইরের উটকো লোক—তোমার নাম-ধাম-পরিচয় আমরা কিছুই জানি নে—কি কর, কোথায় থাক, কেমন স্বভাবচরিত্র—হয়তো আমাদের ধরন-ধারন তোমার ভাল লাগবে না, হয়তো বনিবনাও হবে না,—কি দরকার এসব হুজ্জুতের মধ্যে যাবার?'

—'পরিচয়, সার? সে আর এমন শক্ত কি—এখুনি দিচ্ছি। আমার নাম অরণ্যকুমার দাশগুপ্ত। নামটা একটু ন্যাকা ধরনের, তা আপনারা না হয় শুধু কুমার বলেই ডাকবেন। আমার বাবা স্বর্গীয়—দাশগুপ্ত বাগবাজার অঞ্চলের একটা ইস্কুলের সহকারী শিক্ষক ছিলেন, বছর দেড়েক হল মারা গেছেন। মা মারা যান আরও প্রায় পাঁচ বছর আগে। কোন ভাই-বোন নেই, আর কোন নিকট আত্মীয়-স্বজন যে আছেন তারও কোন প্রমাণ পাই নি। কাজেই বাবার মৃত্যুর পর ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটা মেসে এসে উঠেছি—সেখানেই থাকি। মেসের ঠিকানা—নম্বর—স্ট্রীট।'

—'তা তুমি কি কর? চলে কেমন করে তোমার?'

—'বাবার লাইফ ইনস্যুরেন্স বাবদ পেয়েছিলাম হাজার তিনেক টাকা। সেইটে হল পুঁজি। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আঁকবার হাত আছে দেখে বাবা আর্ট কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পাস করে বেরুতে পারি নি—ক্লাসের রুটিন অসহ্য মনে হত বলে ছেড়ে দিয়েছি। তবে এমনিতেই আর্টিস্ট হিসেবে একটু নাম হয়েছে—মাঝে মাঝে দু-একখানা ছবি বিক্রি হয়, ভাল দামেই বিক্রি হয়। পোর্ট্রেট-পেন্টিং-এর দু-একটা কমিশন পেয়ে থাকি। একটা পেট তো—চলে যায় এক রকম করে।'

—'তা তো বুঝলাম, কিন্তু একে তো ঠিক পরিচয় বলা চলে না। এসব খবর থেকে তোমার সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানা যাবে, আর তা জেনে আমাদের লাভই বা কি হবে?'

—'বুঝেছি সার,—আপনি স্বভাব-চরিত্রের কথা ভাবছেন তো? তা কিছু যদি মনে না করেন, দুখানা সার্টিফিকেট এনেছি সঙ্গে করে—একটু চোখ বুলিয়ে দেখুন।'

এ ছেলে বলে কি! আগে থাকতে এত আটঘাট বেঁধে তবে আমার কাছে এসেছে?—দেখলাম, একখানি সার্টিফিকেট দিয়েছেন উত্তর কলকাতার বাসিন্দা জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী, আর একখানি দিয়েছেন আমারই একজন প্রাক্তন সহপাঠী—বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের ডাকসাইটে ব্যারিস্টার ও দিল্লীর লোকসভার সদস্য। দুজনেই অরণ্যকুমারের পিতার দেবতুল্য চরিত্রের উল্লেখ করে লিখেছেন, শিশুকাল থেকেই তাঁরা অরণ্যকুমারকে জানেন, সে অতি বিনয়ী ও সচ্চরিত্র ছেলে, তাকে বিশ্বাস করলে কাউকে কখনও ঠকতে হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঈষৎ নীরসকণ্ঠে বললাম, 'দেখ, এত হাঙ্গামা তুমি না করলেও পারতে। আমি একা বেড়াতে যাই নে, আমার অন্যান্য সঙ্গীরা খুব সম্ভব তোমার প্রস্তাবে রাজি হবেন না। বাইরের লোক সঙ্গে থাকলে হয়তো তাঁদের অসুবিধা হতে পারে।'

—'কেন অসুবিধা হবে সার? আমি কথা দিচ্ছি তাঁদের কোন অসুবিধা হবে না। আপনাদের মত আমিও খরচ-খরচা দেব—তাছাড়া, আপনাদের বয়েস হয়েছে, মনে করুন না কেন সঙ্গে একটা চাকর নিয়েছেন। আমার গায়ে অসুরের মত জোর—খুব খাটতে পারি; আপনাদের সব কাজ করে দেব। ভাল রান্নাও করতে পারি। মা মারা যাবার পর বাবাকে আমিই রেঁধে খাওয়াতাম।—আপনি একটু বললেই ওঁরা আর অমত করবেন না। বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি, সার।'—কথা বলতে বলতে শেষের দিকে ওর গলা ভারী হয়ে উঠল, চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করতে লাগল।

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল! এ নাছোড়বান্দাকে নিয়ে আমি এখন করি কি? অথচ ছোকরার স্বভাবটা এত নরম আর কথাবার্তা এত মিষ্টি যে কড়া কথা বলে বিদায় করে দিতেও প্রাণ সরে না।

অগত্যা বলতেই হল, 'আচ্ছা, তাহলে চল—কাছেই তো—একবার বড়দা আর হিতেনবাবুর সঙ্গে তোমাকে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি।'......

এইভাবে অচেনা আগন্তুক অরণ্যকুমার আমাদের অন্তরঙ্গ ভ্রাম্যমাণ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই আমরা হাজারিবাগ-রাঁচির চেনা পথের জের টেনে নেতারহাট রওনা হলাম—অরণ্যকুমার সঙ্গে গেল। ফিরল যখন, তখন সে আমাদের সকলেরই হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জয় করে নিয়েছে। আগেই বলেছি, তার রূপ নেই। সহজেই সর্বজনের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে এমন কোন বিশিষ্ট গুণও তার আছে বলে মনে হয় না। খুব স্মার্ট বা বলিয়ে-কইয়ে ছেলে সে নয়—প্রথম দিন আমার সঙ্গে একটানা যত কথা বলেছিল তত কথা আর তাকে কখনও বলতে শুনি নি। লেখাপড়াও বেশি কিছু জানে না—ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেই আর্ট কলেজে ঢুকেছিল। কিন্তু তবু এই প্রথম পর্যটনের দিন-সাতেকের মধ্যেই আমরা তাকে ভালবেসে ফেললাম।

সেবা কিছু করতে জানে বটে ছেলেটা। নীরব অক্লান্ত সেবা—মনে হত যেন এই সেবার সুযোগ পেয়ে সে কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম নিজেদের অপরাধী মনে হত, একটু প্রতিবাদের চেষ্টা করতাম—কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম, প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। সেবা করেই সে আনন্দ পায়, বাধা দিলে আহত পশুর মত নির্বাক করুণ দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। দেখলে কেমন মায়া হয়।

বালতি করে কুয়ো থেকে জল তুলে আমাদের স্নানের আয়োজন করে দেওয়া, কাপড়চোপড় কাচা, পথের ধারে কাঠকুটো কুড়িয়ে জল গরম করে চা তৈরি করা, প্রতিদিন গাড়ি থামলে মালপত্র নামানো ও পরে আবার তোলা, বিছানার বোঝা খোলা ও বাঁধা, গাড়ি ধোওয়া ও মোছা—সব কাজই সে করত, খুশি মনে করত, না বলতেই করত। পথের মধ্যে একবার গাড়ি বিকল হয়। সে আর রতন সিং দুজনে মিলে চার মাইল পথ গাড়ি

ঠেলে হাজারিবাগ নিয়ে গিয়েছিল—আমাদের গাড়ি থেকে নামতে পর্যন্ত দেয় নি। একদিন রাত্রে তো বড়দার পা টিপে দিতে গিয়ে তাঁর হাতে প্রায় মার খাবার উপক্রম করেছিল।

কিন্তু তার সেবার জন্য তাকে আমরা ভালবাসি নি। সেবা তো বেতন-ভোগী ভৃত্যের কাছেও পাওয়া যায়। তার বলিষ্ঠ দেহ ও সুপরিণত বুদ্ধির অন্তরালে আমরা একটা অতি সরল অতি অসহায় শিশুমনের আভাস পেয়েছিলাম। তাকে দেখলেই মনে হত যেন তার অন্তর এখনও কোন আশ্রয় বা নির্ভর খুঁজে পায় নি, ঝড়ে উড়ে আসা পাখির মত সব নীড়কেই সে আপন নীড় বলে ভাবে। তাকে না ভালবেসে থাকা অসম্ভব—তাকে ভাল-বাসতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

কিন্তু এই প্রথম ভ্রমণেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ছেলেটার মধ্যে কোথায় যেন কি একটা রহস্যও আছে। তার স্বভাব অত্যন্ত অকপট, মন অত্যন্ত নরম—সে অল্পে হাসে, অল্পেই কেঁদে ফেলে। লোহার মত মজবুত শরীরের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকত। কিন্তু এ সবই বাহ্য ব্যাপার। তার ব্যক্তিত্বের মূলকেন্দ্রে ছিল একটা উদাসীন গাম্ভীর্য, এবং এইজন্যই আমরা তার মনের অনেকখানি জানতে পারলেও সবটা জানতে পারি নি।

এত সাধাসাধি অনুরোধ-উপরোধ করে কেন সে আমাদের সঙ্গী হল? প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে তার কোন টান আছে বলে মনে হয় না। আমাদের এত প্রিয় তোপচাঁচি সম্বন্ধে সে মাত্র একটা প্রশ্ন করেছিল: 'এখানে কি আদি-বাসীদের কোন পল্লী আছে?'—নেই শুনে সেই যে শামুকের মত খোলের মধ্যে গুটিয়ে গেল আর একবারও শুঁড় বার করল না। পরেশনাথ চুটুপালু সম্বন্ধে ভালমন্দ একটা মন্তব্য করল না। এমন কি, নেতারহাটের ডাক-বাংলোয় পৌঁছে সারাক্ষণ শুধু খানাপিনা ও গৃহস্থালির বন্দোবস্ত নিয়েই ব্যস্ত রইল—একবার বাইরের দিকে চেয়ে পর্যন্ত দেখল না কি অপরূপ সৌন্দর্যের রাজ্যে আমরা এসে পড়েছি। সে আর্টিস্ট, কিন্তু পুরো এক সপ্তাহের মধ্যে

তাকে একবারও বলতে শুনলাম না, 'একটু দাঁড়ান, এইখানকার একটা স্কেচ করেনি', কিংবা 'এই দৃশ্যটার একটা ছবি এঁকে নিতে পারলে ভাল হত।'—সারাক্ষণ চলন্ত গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসে বসে তীব্র গম্ভীর দৃষ্টিতে পথ আর পথের পরিবেশ দেখে যাচ্ছে, আর গাড়ি থামলেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাদের পরিচর্যার কাজে লেগে যাচ্ছে।

ধরবার-ছোঁবার মত কিছুই নেই, কিন্তু তবু বারবার মনে হয়েছে ছেলেটা ঠিক আর-পাঁচজনের মত নয়। ওকে যেমন ভাল না বেসে উপায় নেই, তেমনি ওকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাধারণ অংশ হিসাবে স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়াও অসম্ভব।

হিতেনবাবু একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'যাদুবাবু, আপনার অরণ্য সত্যিই অরণ্য। ওর মনের অন্ধকার ছায়ার মধ্যে সাপ আছে না বাঘ আছে বুঝে ওঠা শক্ত।'......

একদিন মাত্র ওকে একটু উত্তেজিত হতে দেখেছিলাম।—নেতারহাট থেকে ফিরছি। লোহারডগায় এসে পৌছুতে তখনও আধঘণ্টাখানেক দেরি আছে। এমন সময় দেখতে পেলাম রাস্তার ডান দিকে জঙ্গলের কোলে মস্তবড় হাট বসেছে—আদিবাসীদের হাট। রাস্তার পাশেই জন পাঁচ ছয় মারোয়াড়ী আস্তানা গেড়ে বসেছে। এরা এসেছে লাক্ষা খরিদ করতে। তা ছাড়া ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই আদিবাসী। গাড়ি থামিয়ে হাট দেখবার জন্য নেমে পড়লাম।

কাঁচা লাক্ষা আর হাঁড়িয়া মদ তৈরি করবার সাদা মশলা—এই দুটি জিনিসেরই সবচেয়ে বেশি আমদানি দেখলাম। নানাজাতীয় চেনা-অচেনা তরি-তরকারি আছে—বড় বড় সাদা সাদা বনসিম, আনারসের মত সাইজের লাল-টুকটুকে বুনো কাঁকরোল, হরেক রকমের কচু, চুপড়ি আলু আর কুমড়ো—এইগুলোই সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ল। হাঁড়ি-কলসী, দড়ি-পেরেক, নুন-তেল ও বেনেতি মশলার দোকানও আছে দু-একখানা করে। একটা লোক রঙিন কাচ ও প্লাস্টিকের চুড়ি, সস্তা চিরুনি, আর পুঁতি কড়ি ও কাচের গুটির মালার

পসরা সাজিয়ে বসেছে—আদিবাসী তরুণীদের কৌতুক-গুঞ্জন ও কলহাস্য তাকে ঘিরেই সবচেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। একদিকে বসেছে শুধু মুরগীর হাট, আর এক কোণে খাসি ও শূওর কেটে মাংস বিক্রি হচ্ছে।—সওদার চেয়ে জনসমাবেশ অনেক বেশি, কেনাবেচার চেয়ে অনেক বেশি হাসি আর গল্প। হাটের প্রান্ত থেকে একটু দূরে শাল-পলাশের বনের মধ্যে একদল মেয়েপুরুষ বসে গেছে হাঁড়িয়ার পাত্র নিয়ে—তারা মাঝে মঝে সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠছে; দুই এক কলি গেয়েই হঠাৎ থেমে যাচ্ছে, ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ ভাবে হো-হো করে হেসে উঠছে।

আমরা এক পাক ঘুরেই গাড়ির কাছে ফিরে এলাম, কিন্তু অরণ্য ফিরল না—হাটের ভিড়ে সে আমাদের কাছছাড়া হয়ে পড়েছিল। উঁচু রাস্তার উপর থেকে জনতার দিকে চেয়ে আমরা সহজেই তার ফরসা-জামা-কাপড়-পরা চেহারা খুঁজে বের করতে পারলাম। পথ থেকে অনেকটা দূরে ভিড়ের মধ্যে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোথাও থামছে না, বিশেষ ভাবে কোন কিছুই দেখছে না, অথচ কি এক উদ্দেশ্যহীন সন্ধানের নেশায় ক্রমাগত ভিড় ঠেলে ঠেলে চঞ্চল-চরণে পায়চারি করছে। এত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, কি একটা কারণে যেন সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

বহুক্ষণ ধরে ইলেকৃট্রিক হর্ন বাজিয়ে বাজিয়ে অবশেষে তাকে গাড়ির কাছে ফিরিয়ে আনা হল। তখনও তার দুই চোখ চাপা উত্তেজনায় ঝক্‌ঝক্ করছে। এসেই বলল, 'জানেন? আদিবাসীদের গায়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে।'

বললাম, 'তা হতে পারে। বড় গরিব তো! গায়ে সাবান দেয় না, নোংরা কাপড়-চোপড় পরে থাকে—তাছাড়া চুলে মহুয়ার তেল মাখে, তা থেকেও একটা বিটকেল গন্ধ বেরোয়।'

—'না না, সে রকম গন্ধ তো সব গরিব লোকের গায়েই থাকে। এ অন্য রকম গন্ধ—এ ওদের শরীরের গন্ধ, রক্তমাংসের গন্ধ। বড় অদ্ভুত গন্ধটা—ভারি মিষ্টি!'

সত্যিই ছেলেটা যেন কেমন-কেমন!

কুচবিহার-যাত্রায় অরণ্য আমাদের সঙ্গী হল না। বলল, একটা পোর্ট্রেটের কাজ পেয়েছে, মোটা টাকার কাজ—তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার।

তার পরের বার গেলাম ধানবাদ পুরুলিয়া রঘুনাথপুর ঘুরে বাঁকুড়া, সেখান থেকে মেদিনীপুর হয়ে দীঘা। আমাদের প্ল্যানের কথা শুনে অরণ্য বলল, 'অতটাই যখন যাচ্ছেন তখন একবার রাঁচিটাও ঘুরে এসে তার পর পুরুলিয়ার দিকে রওনা হলে হয় না?'

বড়দা পরিকল্পনা পালটাতে রাজি হলেন না। অরণ্য সেবারও আমাদের সঙ্গে গেল না।

সুতরাং প্রায় বছরখানেক পরে সে আবার আমাদের সঙ্গে বেরুল। এবার আমরা চলেছি রাঁচি খুঁটি হয়ে বড় ঘাট পার হয়ে চক্রধরপুর পর্যন্ত। এ যাত্রায় আমাদের কোন নতুন বিস্ময় বা রোমাঞ্চের প্রত্যাশা নেই—সবটাই পুরাতন পথ। ফেরবার সময়ও নতুন পথ পড়বে মাত্র পনেরো মাইল—চক্রধরপুর থেকে চাঁইবাসা। তার পর আবার চেনা শড়কের যাত্রী হয়ে টাটানগর ও ধানবাদের উপর দিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়ব।

আনন্দের পুনরাবৃত্তিতে আমাদের কোনদিনই অরুচি নেই। পথের টানেই আমরা পথিক—আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কার আমাদের সমান ভাবে উল্লসিত করে তোলে। আমাদের মনকে আমরা ভাল করেই চিনি। কিন্তু অরণ্যকে এবারও আমরা পুরোপুরি চিনে উঠতে পারলাম না।

• •

তার বাঁ হাতের কবজির ভিতরদিকে আঁকা উল্‌কির ছবিটি প্রথম আমার নজরে পড়ে যাবার পথে তোপচাঁচিতে। বাথরুম থেকে সে তখন সবেমাত্র স্নান করে বেরিয়েছে—গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি ছাড়া আর কিছু নেই। দু হাত উপরে তুলে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছছে, হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই দিকে।

—'ইঃ! এ যে রক্ত! কবজি কাটলে কি করে? দেখি দেখি!'—হাত টেনে সামনে ধরেই ভুল বুঝতে পারলাম—রক্ত নয়, রক্তের মত টক্‌টকে লাল রঙে আঁকা উল্‌কি।

একটা সাপের ছবি। মণিবন্ধের সন্ধিরেখার সমান্তরাল করে আঁকা, লেজ ও মাথার মাঝখানে একটা কুণ্ডলি—মুখ থেকে দো-ফরকা জিভ বেরিয়ে আছে। গায়ে মাছের মত বড় বড় আঁশ, মাথায় দুটো ছোট্ট বাঁকা শিং। সাপ হিসাবে একান্ত অবাস্তব, কিন্তু শিল্পকর্ম হিসাবে বেশ একটু অসাধারণ। একবার চেয়ে দেখলে বহুক্ষণ চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

—'আরে, কলকাতার ছেলের গায়ে উল্‌কি! এ কি যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যদের দেখাদেখি আঁকিয়ে নিয়েছ নাকি?'—হিতেনবাবু কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখে বললেন।

আমি তখনও ছবিটা দেখছি। বললাম, 'না,—আধুনিক উল্‌কি-শিল্পীরা লাল রঙ দিয়ে সাপ আঁকে না, সাপের মাথায় দুটো শিং-ও পরিয়ে দেয় না। এ অন্য জিনিস।—কি হে, তুমি চুপ করে আছ যে? এ উল্‌কি তোমার হাতে কে আঁকল?'

আস্তে আস্তে অরণ্য আমার হাত থেকে তার হাতখানা টেনে নিল। তার পর টেবিলের উপর থেকে ছেড়ে-রাখা খদ্দরের পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলল, 'কি জানি! ছেলেবেলা থেকেই দেখছি ওটা, কোনদিন জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবার ইচ্ছে বা সুযোগ হয় নি। বাবা-মাও কিছু বলেন নি কোনদিন।'

চুড়িদার পাঞ্জাবির বোতাম-আঁটা আস্তিনের তলায় উল্‌কির ছবি চাপা পড়ে গেল।......অরণ্যের মুখখানা কেমন যেন থম্‌থমে দেখাচ্ছে, দুই চোখের মধ্যে একটা অসহায় দিশাহারা ভাব ফুটে উঠেছে।

আর কোনদিন এই উল্‌কির প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন রকম আলোচনা হয় নি।

আর একদিনের কথা। আমরা তখন রাঁচিতে। খাওয়া-দাওয়ার পর হিতেনবাবু ও চিনিবাবু অরণ্যকে নিয়ে বেরিয়েছেন, হুণ্ড জোনা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন। আমার কোমরের ব্যথাটা একটু বেড়েছে, তাই কতকগুলো ইর্‌গাপাইরিন আর নোভাল্‌জিনের বড়ি গিলে হোটেলের ঘরের মধ্যে খাটের উপর পড়ে আছি—দিবানিদ্রার প্রত্যাশায়। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না।

অনেকক্ষণ ছটফট করার পর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। টেবিলের উপর অরণ্যের পোর্টফোলিও ব্যাগটা পড়ে রয়েছে। এটা ও কখনও হাতছাড়া করে না, ঘুমুবার সময়ও বালিসের পাশে নিয়ে শোয়—মাঝে মাঝে খুলে ভিতরের কাগজপত্র উলটে-পালটে দেখে। আজ বোধ হয় ভুল করে ফেলে গেছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ব্যাগটা খুলে ফেললাম। দেখাই যাক না যদি এর ভিতর থেকে অরণ্যকুমারের মনের অরণ্যে ঢোকবার কোন পথের হদিশ মেলে।

ছবি। একতাড়া ছবি। নিশ্চয় অরণ্যের নিজেরই আঁকা। কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে প্রথমখানির উপর ঝুঁকে পড়লাম। ছোট্ট একটি ল্যাণ্ডস্কেপ—জলরঙে আঁকা। বাঃ, ছেলেটার হাতের কাজ তো ভারি চমৎকার! বেশ জোরালো ড্রয়িং—রঙের চোখও খুব ভাল। তবে এখনও নিজস্ব কোন শিল্পধর্ম খুঁজে পায় নি—এক্‌লেক্‌টিসিজ্‌মের সহজ পন্থা ধরেই চলেছে। রুসো মিলে কট্‌ম্যান কন্‌স্টেবল্ মোনে সেজান—সবার কাছ থেকেই কিছু কিছু নিয়েছে, কিন্তু সংমিশ্রণের মধ্যে একটা নিজস্ব সংশ্লেষবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পাকা হাত—মনটা আরও একটু পাকলে এর ছবি শিল্পজগতে সত্যিই একটা আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

ছোট একটা পাহাড়ী নদীর উপর বড় কালভার্ট-জাতীয় একটা সেতু—তার উপর দিয়ে কালো পিচের পথ চলে গেছে। নদীর এপারে পথের দু-পাশেই ঢেউ-খেলানো কাঁকুরে ডাঙা, এখানে ওখানে দুই একটা হ্রস্বকায় বনকুল ও পলাশ গাছের ঝোপ। ওপারে পথের একপাশে ছোট একটা পাহাড়—নীচের দিকটা ঘাসে ঢাকা মাটি, উপর দিকটা দাঁত-বার-করা

অবক্ষয়িত কালো পাথর। তার বিপরীত দিকে পথের ওপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের ঠিক কোণটিতে অর্থাৎ পথ ও নদীতীরের সংযোগস্থলে একটা দীর্ঘদেহ স্থূলকাণ্ড শালগাছ, তার দুপাশে দুটো ছোট ছোট ঝুপসি চেহারার গাছ—বোধ হয় মহুয়া কি পলাশ—পিছনে নিবিড় অরণ্যচ্ছায়ার শ্যামলিমা।

ছবিখানার দৃশ্যের মধ্যে আরও একটি বৈচিত্র্য ছিল। নদীর এপারে পথটা ডান দিক থেকে বেঁকে এসে সোজা সেতুর উপর দিয়ে ওপারে খানিকটা চলে গিয়ে আবার হঠাৎ মোড় ঘুরে বাঁ-দিকে চলে গেছে। সেতুর নীচের নদীটাও এদিকে কিছুদূর এসে বাঁ-দিকে বেঁকেছে, ওদিকে কিছুদূর গিয়ে ডান দিকে বেঁকেছে। পথ আর নদী দুইএ মিলে দেখাচ্ছে একটা মোটা আঁচড়ে আঁকা স্বস্তিক-চিহ্নের মত।

প্রথমবার-ভ্রমণের স্মৃতি থেকেই এ ছবির সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়, নইলে আজন্ম কলকাতায় প্রতিপালিত অরণ্যকুমার এমন দৃশ্য কোথায় পাবে? কিন্তু অনেক ভেবেও জায়গাটা চিনতে পারলাম না।

দ্বিতীয় ছবিখানা হাতে তুলে একটু হতাশ হলাম। সেই একই দৃশ্য—তফাতের মধ্যে শুধু কালটা বোধ হয় ভরা বর্ষা। গাছপালার পত্র-পল্লব ভিজে-ভিজে, নদীর খাতে গেরুয়া রঙের জলধারার প্রবলোচ্ছ্বাস। চোখে দেখা দৃশ্যকে একটা কাল্পনিক কাল-পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে এঁকেছে—খুবই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ কি! তৃতীয় ছবিখানাতেও ঐ একই দৃশ্য! চতুর্থ—পঞ্চম—ষষ্ঠ—অতি দ্রুত সবগুলো ছবি দেখে ফেললাম। সবসুদ্ধ একুশখানা। একুশখানাতেই অরণ্যকুমার একই জায়গার ছবি এঁকেছে! সেই একই নদীর উপর একই সেতু—সেই একই পাহাড়-প্রান্তর-অরণ্যের সমাবেশ—সেই একই স্বস্তিক-চিহ্নের ডিজাইন! কোনখানিতে দুপুরের রোদ, কোনখানিতে সন্ধ্যার ছায়া; কোনখানিতে বসন্তের পুষ্পাভাস, কোনখানিতে বা শীতের নিষ্পত্র রিক্ততা। কিন্তু পার্থক্য শুধু ঋতু বা ক্ষণের, শিল্পবস্তু এক ও অপরিবর্তিত।

কেন?

পোর্টফোলিওটা সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। অরণ্যের রহস্য যেন ক্রমেই গভীরতর হয়ে উঠছে!

ভেবেছিলাম এ সম্বন্ধে পরে তাকে প্রশ্ন করব কিন্তু তা করি নি—কেমন যেন মনের মধ্যে ভরসা পাই নি।

চৌদ্দ

এর পর অরণ্যকুমার আরও তিনবার আমাদের সঙ্গে বেরিয়েছে।—বড়দা হিতেনবাবু বা চিনিবাবুর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কোনদিন আলোচনা করি নি, কাজেই তাঁরা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না—কিন্তু আমি বার বার লক্ষ্য করেছি, ছোটনাগপুর অঞ্চল ও রাঁচি শহর বাদ দিয়ে যে-বারই আমরা অন্য কোন দিকে যাত্রা করেছি সেই বারই সে কোন না কোন ওজর-আপত্তি দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে পড়েছে, আমাদের সঙ্গে যায় নি। আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াটা ওর উপলক্ষ্য মাত্র, ও শুধু ঐ একই জায়গা বারবার দেখতে যায়—কি যেন সেখানে খুঁজতে যায়!

নিজের জীবন সম্বন্ধে গায়ে পড়ে সে আমাদের কোনদিন একটা কথাও বলে নি, জিজ্ঞাসা করলে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছে মাত্র। অথচ খোঁজ-খবর নিয়ে যতটা জেনেছি, গোপন করবার মত কিছুই নেই তার জীবনে। সে আর্টিস্ট, অথচ আর্ট-সংক্রান্ত কোন রকম আলোচনার কাছেও ঘেঁসতে চায় না। বেড়াতে বেরুবার সময় ছবি আঁকার সরঞ্জামও কিছু সঙ্গে নিয়ে বেরোয় না।

একদিন আমি হঠাৎ চটে-মটে তাকে খুব খানিকটা বকে দিলাম। সেদিন আমরা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিলাম রাজারাপ্পায়। ভেড়া নদী পার হয়ে

ছিন্নমস্তার মন্দির পিছনে ফেলে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে সংকীর্ণকায় দামোদরের খাড়া প্রাচীরের মত শৈলময় তীরভূমির উপর বসেছিলাম। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের নির্জন গাম্ভীর্য আমাদের মনের মধ্যে একটা অপূর্ব অনুভূতির শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটু দূরে অরণ্য তিনখানা পাথর সাজিয়ে একটা উনুন গড়ে ফেলেছে, গাড়ির ভিতর থেকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি আর চাল-ডাল তেল-নুনের বাক্সও টেনে বার করেছে।

বড়দা হাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও আবার কি হচ্ছে? সঙ্গে তো যথেষ্ট খাবার রয়েছে।'

বিনীত ভাবে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে সেগুলো তো সবই ঠাণ্ডা—এই শীতে আপনাদের খেতে কষ্ট হবে। তাই সঙ্গে চাট্টি গরম গরম খিচুড়ির আয়োজন করছি।'

আমার আর সহ্য হল না। চড়া গলায় বলে উঠলাম, 'কি রান্নাবান্না হাঁড়িহেঁশেল নিয়ে সময়ের অপব্যবহার করছ অরণ্য! চারদিকে একবার চেয়ে দেখ—ছবি আঁকো, অন্তত-পক্ষে পেন্‌সিল-স্কেচ করে নাও। আমি তোমার পোর্টফোলিওর ছবিগুলো দেখেছি—'

একটু চকিতভাবে চোখ তুলে অরণ্য আমার মুখের দিকে একবার চাইল। সে দৃষ্টিতে কোন নালিশ নেই, আছে সেই পুরাতন অসহায় উদ্‌ভ্রান্তি।

—'হ্যাঁ, তোমার পোর্টফোলিওর ছবিগুলো আমি দেখেছি। ল্যাণ্ডস্কেপে তোমার এমন সুন্দর হাত—তবে আঁক না কেন? কলকাতার গলিঘুঁজি আর ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে আঁকবার মত ল্যাণ্ডস্কেপ তুমি কোথায় পাবে?'

অত্যন্ত নরম গলায় উত্তর পেলাম, 'ছবি এঁকে কি হবে?'—তার পর কণ্ঠস্বর আরও মৃদু হয়ে উঠল: 'ছবি আঁকতে আমার ভাল লাগে না।'

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। একই দৃশ্যের ছবি যে একুশবার আঁকতে পারে তার মুখে একি কথা!

অরণ্য আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাকে আমরা হারিয়েছি। সেইজন্যই বোধ হয় তার সঙ্গে আমাদের স্বল্পকালস্থায়ী ঘনিষ্ঠতার প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা এত উজ্জ্বল রঙে স্মৃতির পটে আঁকা হয়ে আছে।

পথের ধারে গাছের তলায় জলযোগান্তে কম্বল বিছিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে একটু বিশ্রাম করছি, এমন সময় দেখি, একজন হিন্দুস্থানী মুসলমান একটা ছাগলের গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। ছাগলটা তার সঙ্গে যেতে একান্ত অনিচ্ছুক—মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কাতরভাবে ব্যা-ব্যা করে চেঁচাচ্ছে। তার পিছন পিছন মড়াকান্নার মত সুর করে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে একটা আদিবাসী বুড়ি। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, শেখজি ঐ বুড়ির কাছ থেকে সাড়ে তিনটাকা দাম দিয়ে ছাগলটা কিনেছে, এখন নিজের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। বুড়ির ছেলেমেয়ে কেউ নেই, ঐ ছাগলটাকেই পুত্রস্নেহে পালন করেছিল। বড় গরিব, পেটের দায়ে পোষা ছাগল বেচতে বাধ্য হয়েছে—এখন আবার মায়ার টানে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার পিছু পিছু চলেছে।

অমনি অরণ্যকুমারের চোখ ছল্ ছল্ করে উঠল। সে তখুনি উঠে গিয়ে শেখজির হাতে সাড়ে তিনটে টাকা গুঁজে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করে দিল—বুড়ির ছাগল বুড়ির হাতে ফিরিয়ে দিল। তার পর বুড়ির মুখের অনর্গল আনন্দিত আশীর্বাদ শুনতে শুনতে তার কালো মুখখানা সেদিন সত্যিই যেন আলোকিত হয়ে উঠেছিল।...

আর একদিন আমরা গাড়ি থামিয়েছি একটা পাহাড়ের পায়ের গোড়ায়। জায়গাটা অতি মনোরম। চারিদিকে নানাজাতীয় গাছের বিরল-বিন্যাস, পাশেই একটা ঝরনা। জলস্রোতের ঝর্ঝর আর শত শত অদৃশ্য পাখির কাকলী—দুইএ মিলে একটা অপূর্ব ধ্বনিসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে; তার পিছনে প্রতিধ্বনির তানপুরায় অস্পষ্ট ঝঙ্কার বেজে চলেছে।

ঝরনাটা পার হয়ে পাহাড়ের পাদমূলের বাঁকা রেখার পথ ধরে ঘনশ্যামল তৃণভূমির উপর দিয়ে সবাই মিলে খানিকটা ওদিকে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ের

পাশ ঘুরে কিছুদূর গিয়েই একটা বিচিত্র ধরনের স্থান নজরে পড়ল। পঁচিশ-ত্রিশটা লম্বা লম্বা শালগাছ খানিকটা খোলা জায়গা ঘিরে চমৎকার একটা বৃত্তাকার বেষ্টনী রচনা করেছে। গাছগুলো সবই প্রায় সমান সাইজের, তার উপর বেশ মানানসই ভাবে ডালপালা ছেঁটে দেবার ফলে যত্ন করে কম্পোজ করা একখানা ছবির মত দেখাচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায়, এ জিনিস প্রকৃতির খেয়ালের সৃষ্টি নয়—এর পিছনে মানুষের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা আছে। শ্রীমান লাবুর হাতের ক্যামেরা ক্লিক্ করে উঠল।

বৃক্ষবেষ্টনীর মধ্যে গিয়ে দেখলাম, নরম দূর্বায় ঢাকা জমি যেন তকৃতক্ করছে—কুটোকাটা বা শুকনো পাতা একটাও কোথাও পড়ে নেই। বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে তিনখানা চৌকো পাথর সাজিয়ে একটা বেদীর মত করা হয়েছে, তার উপর কিসের লাল লাল শুকনো দাগ।

হিতেনবাবু বললেন, জায়গাটা আদিবাসীদের ভূতপূজোর 'থান'। সভ্য মানুষের বসতি থেকে একটু দূরে সরে গেলেই এসব অঞ্চলে ওদের এ রকম 'থান' অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ওরা প্রায়ই আসে—একলা আসে, দল বেঁধে আসে—মানসিক করে যায়, বেদীর উপর মুরগী বলি দিয়ে পূজো দিয়ে যায়। ক্ষেতের ফসল ঘরে ওঠবার পর যখন গাঁয়ে গাঁয়ে পরবের হিড়িক পড়ে যায় তখন এখানে মেলা বসে, দিনরাত ধরে নাচগানের জলসা চলতে থাকে।

গাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ দেখি অরণ্য আমাদের সঙ্গে নেই। পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম—যা দেখলাম সেটা অদ্ভুত ব্যাপার তো বটেই, একটু হাস্যকরও বটে।

বৃক্ষবেষ্টনীর বাইরে এসে অরণ্য আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। একদৃষ্টে গাছ দিয়ে ঘেরা সেই জায়গাটার দিকে চেয়ে আছে। তার পর সে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পরম ভক্তিভরে স্থানটির উদ্দেশে একটা প্রণাম করল—তার ভঙ্গি দেখে লাবু এখানে হো-হো করে হেসে উঠল।

ফিরে আসতেই ওকে চেপে ধরলাম; বললাম, 'এ আবার কি ঢঙ

দেখালে ? কোনদিন তো কোন ঠাকুর-দেবতার নামও মুখে শুনি নি—হঠাৎ আদিবাসীদের ভূতের প্রতি এত ভক্তি গজাল কেন ?'

মাথা হেঁট করে জবাব দিল, 'অনেক মানুষ যে-ভূতের পূজো করে সে-ভূত আর ভূত থাকে না, সার। সে ভূত তখন ভগবান হয়ে যায়। মানুষের ভগবানকে প্রণাম করলে মানুষের কোন অপরাধ হয় না।'

সেই অভ্যস্ত শান্ত কণ্ঠস্বর, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন একটু উত্তাপের আভাসও আছে।

সবসুদ্ধ পাঁচবার অরণ্যকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। আজ পিছন ফিরে সেই দিনগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় যেন একখানা পঞ্চাঙ্ক রহস্য-নাটিকার প্লটের জালে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম। সে নাটিকার প্রধান রস রোমাঞ্চ বা উত্তেজনা নয়—মৃদু বিস্ময়। অরণ্য-ঘটিত রহস্য আমাদের মনে কখনও সমাধানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়ে তোলে নি। তাকে যত দেখেছি, যত কাছে পেয়েছি, ততই তার সম্বন্ধে নানা অলস প্রশ্ন আমাদের মগজের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে—তার কোনটির কোন সদুত্তর আমরা খুঁজে পাই নি। বিস্মিত হয়েছি, বিভ্রান্ত হয়েছি, কিন্তু তবু তাকে আমাদেরই একজন বলে মেনে নিতে, ভালবাসতে কোনদিন কোন অসুবিধা হয় নি।

মৃদু শান্ত স্বভাবের মানুষটি, চলন্ত গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে চুপ করে বসে থাকে, গাড়ি থামলেই সেবাকর্মের ব্যস্ততায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত নরম সুরে কথা বলে, প্রশ্ন না করলে সাধারণত কোন কথাই বলে না, অত্যন্ত সরল—মাঝে মাঝে একটু বোকা বলেই মনে হয়—অথচ মনের ভিতরের কি একটা গোপন কথা কাউকে কিছুতেই জানতে দেয় না—অরণ্যকুমারের এই রূপটাই আমাদের মানসিক অভ্যাসের অংশীভূত হয়ে উঠেছিল। সঙ্গীদের কথা বলতে পারি না—তবে অরণ্যকে দেখতে দেখতে আমার অন্তত অনেক সময় মনে হয়েছে যেন স্বচ্ছ নির্মল জলে পরিপূর্ণ একটা অতলস্পর্শ কূপের পাশে

আমি দাঁড়িয়ে আছি। সে কূপের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করাও যেমন সহজ ডুবে মরাও তাই।...

এই রহস্য-নাটিকার শেষ অঙ্কের যবনিকা যেদিন পড়ল সেদিন কিন্তু তার মধ্যে কোন অভ্যস্ত সাধারণত্ব ছিল না। রামধনুর রঙিন রহস্যের উপর সেদিন সহসা গাঢ় অন্ধকারের যবনিকা নেমে এসেছিল, অপ্রত্যাশিত ট্রাজেডির বিস্ফোরণে বিস্ময় ও কৌতূহলের পল্‌কা কাচঘর ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

রাঁচি থেকে বেরিয়েছি ভোরবেলা। কোন্ পথ দিয়ে কোন্‌দিকে যাচ্ছি সেকথা এখানে বলব না। চিনিবাবু গাড়ি চালাচ্ছেন, তাঁর পাশে অরণ্য, তার পাশে বড়দা। আমি আর হিতেনবাবু পিছনে আছি। দিনটা সকাল থেকেই মেঘলা করে আছে, আকাশে কেমন একটা ঘোলাটে থম্‌থমে ভাব। তবে শীঘ্র বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। আমাদের কোন তাড়া নেই, সামনে সারাদিনটাই হাতে আছে—গাড়ির স্পীড বিশ-পঁচিশ মাইলের বেশি নয়।

বেলা তখন সাড়ে-সাতটা কি আটটা। সামনে একটা নদী পড়তেই অরণ্য বলে উঠল, 'গাড়িটা একটু থামাবেন, আমাকে একবার নামতে হবে।'

প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এমন আমাদের সকলেরই মাঝে মাঝে নামতে হয়। ব্রিজটা পার হয়ে পথের পাশে জঙ্গলের ধারে গাড়ি দাঁড় করানো হল—অরণ্য নেমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমরাও নেমে পড়লাম। ব্রিজের উপর এসে রেলিং ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাই একটা করে সিগারেট ধরালাম। ভিজে ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, আকাশের মেঘ একটু পাতলা হয়ে এসেছে—চাপা সূর্যালোকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নদীর খাতের ভিতর দিয়ে ঘোলা জলের প্রবল স্রোত পাথরে পাথরে টক্কর খেয়ে আবর্ত জাগিয়ে, হুঙ্কারের ধমক দিতে দিতে ছুটে চলেছে।

হিতেনবাবু বললেন, 'উপরদিকে পাহাড়ের মধ্যে বড় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে

গেছে—তারই জল নামছে। ঘণ্টাখানেক পরেই এ জল কমে যাবে, স্রোতেরও আর এত জোর থাকবে না।'

দু'চারটে এ-কথা ও-কথার পর হিতেনবাবু আর বড়দার মধ্যে প্রবল তর্ক বেধে গেল পরদিনের প্রোগ্রাম নিয়ে। হিতেনবাবু যে পথ দিয়ে যেতে চান সেটা গেছে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সে পথে কোন ভাল ডাকবাংলো নেই, ভদ্ররকমের শহর-বাজারও কিছু নেই। খাবার-দাবার সঙ্গে যা নেওয়া যাবে তাই ভরসা, রাত্রে কোন সুবিধাজনক আশ্রয় মিলবে কিনা তারও কোন স্থিরতা নেই।

বড়দা বলেন, 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত একবার চাট্টি ভাত আর রাত্তিরে আরাম করে ঘুম—এ আমার চাইই। তা না, যতো সব জঙ্গুলে পথ আর পাণ্ডব-বর্জিত জায়গা!'

হিতেনবাবু জবাব দেন, 'ঐ তো আপনার দোষ—আপনি অ্যাডভেঞ্চার বোঝেন না। খাওয়া আর শোওয়া—সে তো রোজই আছে, একদিন না হয় নাই বা হল! একটা নতুন ধরনের থ্রিল্ পাওয়া যাবে—সেটাই কি কম লাভ?'

তর্ক তুমুল হয়ে উঠল।

বাধা দিলেন চিনিবাবু। হাতের ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু অরণ্য এখনও ফিরছে না কেন? আধঘণ্টারও উপর হয়ে গেল—'

তাই তো! এতক্ষণে তো তার ফেরা উচিত ছিল! চিনিবাবু গাড়ির কাছে গিয়ে জোরে জোরে হর্ন বাজালেন বারকয়েক, বড়দা মুখের কাছে হাত জড়ো করে প্রচণ্ড একটা হাঁক ছাড়লেন।

কোন জবাব নেই।

আরও মিনিট পনেরো কেটে গেল।

হিতেনবাবু বললেন, 'যা হ্যালাভোলা ছেলে! কোথায় আবার কি দেখেছে হয়তো—সেখানেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।'

আবার শুরু হল হর্ন বাজানো আর মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠের সচীৎকার আহ্বান।—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু অরণ্যের কোন সাড়াই মিলল না।

দেড়ঘণ্টা কেটে গেল। মনের আকাশ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মেঘে ক্রমশ অন্ধকার হয়ে উঠল। জায়গাটাও বড় নির্জন। এতক্ষণ এখানে আছি, পথ দিয়ে কোন লোককে যেতে দেখি নি; দুখানা খালি লরি ছাড়া কোন যানবাহনও চোখে পড়ে নি। বড়দা উদ্বিগ্নকণ্ঠে মন্তব্য করলেন, 'নদীর ধারের জঙ্গল! বড় খারাপ জায়গা। সাপখোপ আছে, বাঘভালুক থাকাও বিচিত্র নয়। কি যে হল ছেলেটার!'

অনেক কিছুই হতে পারে।—কিন্তু আমরা এখন কি করি? পরের ছেলে সঙ্গে এনে একি ফ্যাসাদে পড়া গেল!

শেষকালে চিনিবাবুকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে আমরা তিনজন দুর্গা বলে জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকে পড়লাম। পথের ধারে জঙ্গলটাকে যেমন পরিচ্ছন্ন ও সুগম বলে মনে হয়েছিল ভিতরে ঢুকে দেখলাম, তা নয়—ক্রমশ নিবিড় ও অন্ধকার হয়ে উঠেছে, আগাছা ও কাঁটালতার ঝোপঝাড়ে দুর্ভেদ্য। তবু ঠেলেঠুলে অনেকখানি ভিতরে চলে গেলাম, অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করলাম—পথের উপর থেকে চিনিবাবুর হর্ন তখনও সমানে চীৎকার করে চলেছে।—কিন্তু কোথায় অরণ্য?...

বিরাট অরণ্য। বাইরে থেকে অতটা বুঝতে পারি নি। বাঁ দিকে গিরি-নদীর ক্ষীণায়মান গর্জন তখনও শোনা যাচ্ছে, পিছনে হর্ন বাজছে। কিন্তু এই দুটি ধ্বনির নিশানা যদি হারিয়ে ফেলি তাহলে কি আর পথ চিনে ফিরতে পারব? অরণ্যের মত আমরাও যদি হারিয়ে যাই?

তিনজনই মধ্যবয়সী শহুরে ভদ্রলোক—কায়িক পরিশ্রমে একান্ত অনভ্যস্ত। ঘণ্টা দুয়েক জঙ্গল ঢুঁড়ে বেড়াবার পর গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠলাম—হাত-পা ছড়ে গেছে, জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, ক্লান্তিতে পা অচল হয়ে পড়েছে। আমার ডান পায়ের হাঁটুটা অসহ্য জ্বালা করছে—বোধ হয় বিছুটি লেগেছে। উৎকণ্ঠার

উত্তেজনা কেটে গেছে, হতাশায় সকলেরই মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আর পারা যায় না! এইবার ফিরতে হবে। অরণ্যকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরতে হবে।...

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে ক্লান্তভাবে মুখ তুলে চেয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চম্‌কে উঠলাম।—আমার ঠিক সামনে পথের ওপাশে অর্থাৎ জঙ্গলের বিপরীত দিকে একটা ছোট পাহাড়—নীচের দিকটা ঘাসে ঢাকা মাটি, উপরদিকটা উলঙ্গ কালো পাথর। দ্রুত-পায়ে পথের উপর উঠে এসে জঙ্গলের কোণের দিকে অর্থাৎ নদীতীর ও পথের সংযোগস্থলের দিকে চেয়ে দেখলাম—ঠিক! সেই দীর্ঘদেহ স্থূলকাণ্ড শালগাছ আর তার দু-পাশে ঝাঁকড়া-ডালপালাওয়ালা দুটো ছোট ছোট গাছ।—নদীর ওপারে চেয়ে দেখলাম, ঢেউখেলানো কাঁকুরে ডাঙা, মাঝে মাঝে বনফুল আর পলাশের ঝোপ!

আর কোন সন্দেহ নেই। তবু প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ব্রিজের উপর দাঁড়ালাম। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে বার বার চেয়ে দেখলাম—নাঃ, কোন ভুল হয় নি! এই তো সেই নদী আর পথের স্বস্তিক-চিহ্ন।—একুশখানা ছবিতে একুশবার দেখা দৃশ্য, এ কি সহজে ভুলে যাবার জিনিস!

তাহলে কি—? সব যেন কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে। এতবড় একটা আবিষ্কার—কিন্তু তাতেই বা রহস্যের সমাধান হল কই?...

বড়দার কণ্ঠস্বরে চট্‌কা ভাঙল—আমাকেই ডাকছেন। কাছে যেতে, বললেন, 'কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিপদের সময়?—শুনুন, আমরা ঠিক করেছি, কাছেপিঠে যে থানা পাব সেখানে সব কথা খুলে বলে একটা ডাইরি করিয়ে দিয়ে যাব। জলজ্যান্ত একটা ছেলে এমন ভাবে হারিয়ে গেল—এ তো ভাল কথা নয়। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

শক্ত গলায় জবাব দিলাম, 'না, এ নিয়ে থানা-পুলিসের হাঙ্গামা করবার কোন দরকার নেই। অরণ্য আর ফিরবে না। সে ইচ্ছে করেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে—তার পিছনে পুলিস লেলিয়ে দিলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হবে।'

হিতেনবাবু উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এসব আপনি কি বলছেন, যাদুবাবু!'

—'যা বলছি ঠিকই বলছি। অরণ্যের জীবনে আমরা নেহাৎই অবান্তর—উপলক্ষ্য মাত্র। সে যা খুঁজতে বেরিয়েছিল আজ তার সন্ধান পেয়েছে, তাই চলে গেছে। তার মা নেই বাপ নেই, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই—কারও কাছে তার জন্যে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। শুধু শুধু পুলিসে এত্তালা দিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে যাব কেন আমরা?'

বড়দা বলে উঠলেন, 'এসব তোমার মনগড়া কথা। অরণ্য আমাদের ইচ্ছে করে ছেড়ে গেছে—একথা তুমি কেমন করে জানলে? কোন প্রমাণ আছে তোমার?'

গাড়ির ভিতর থেকে অরণ্যের পোর্ট্‌ফোলিও ব্যাগটা বের করে নিয়ে এলাম; সেটা খুলে একে একে সেই একুশখানা ছবি সবাইকে দেখালাম। তার পর তাঁদের ব্রিজের উপর নিয়ে গিয়ে ওপারের প্রান্তর ও এপারের পাহাড় আর জঙ্গল দেখালাম, কোণের শালগাছ দেখালাম, নদী আর পথের স্বস্তিক-চিহ্নের ডিজাইন দেখিয়ে দিলাম। তার পর বললাম, 'এইবার আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখুন। এই জায়গাটার খোঁজেই সে বারবার আমাদের সঙ্গে এদিকে বেড়াতে এসেছে। আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি, সে কিন্তু এক মিনিটের জন্যেও তার উদ্দেশ্যের কথা ভোলে নি—সর্বক্ষণ ঐ সামনের সীটে বসে পথ আর পথের আশপাশের উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মেলে চুপ করে আজকের এই মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করেছে। যে জায়গা সে খুঁজছিল, আজ সেইখানে এসে পড়েছে, তাই গাড়ি থেকে নেমে চলে গেছে।—যদি শুধু জায়গাটা একবার দেখাই তার উদ্দেশ্য হত তাহলে সে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকত না, ঢুকলেও অনেক আগে ফিরে আসত। তা যখন আসে নি তখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সে আমাদের ইচ্ছে করেই ছেড়ে চলে গেছে—আর ফিরবে না।'

হিতেনবাবু তখনও পোর্ট্‌ফোলিওর ছবিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কিন্তু দেখুন, অরণ্য আমাদের সবাইকে বলেছে সে কখনও কলকাতার বাইরে আসে নি। আমরাও তাকে নিয়ে এর আগে কখনও এ পথে আসি নি। তবে সে এ জায়গার এমন নিখুঁত ছবি আঁকল কি করে? এক-আধখানা নয়, একুশখানা ছবি—ভিন্ন ভিন্ন সময়ের, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর—এ কি করে সম্ভব হল?'

বড়দা অধীরভাবে বলে উঠলেন, 'তাছাড়া, সে এমন ভাবে চলে গেল কেন? আর গেলই বা কোথায়?'

আমি বললাম, 'এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই। শুধু এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমরা তার মনের খবর কিছুই পাই নি—আসল মানুষটা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি নি। যাই হ'ক আপনারা দয়া করে পুলিসে-টুলিসে খবর দেবেন না—তাহলে নিজেরাও বিপদে পড়বেন, ছেলেটাকেও বিপদে ফেলবেন।'...

এমনি করে অরণ্যকে আমরা হারিয়ে ফেললাম। একদিন পথ থেকে উঠে এসে হঠাৎ সে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আবার একদিন আমাদের ছেড়ে পথেই নেমে কোথায় চলে গেল!

পথের দান পথই ফিরিয়ে নিল।

সোজা কলকাতায় ফিরে এলাম। কয়েকটা দিন বড়ই অস্বস্তিতে কাটল। ব্যাপারটা এমন যে বাইরের কাউকে বলবারও উপায় নেই—কি জানি কে কি সন্দেহ করে বসবে। নিজেরাই একান্তে বসে গুজগুজ ফুসফুস করি, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি, কিন্তু কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারি না। অরণ্য সম্বন্ধে আমাদের কি আর কিছু করবার নেই?

উত্তর কলকাতার যে মেস্‌টার ঠিকানা অরণ্য আমাদের দিয়েছিল সেখানেও একদিন গিয়েছিলাম সবাই মিলে। কোন কথা ভাঙি নি, শুধু তার খোঁজ করেছিলাম।

মেসের লেসী বুড়ো ভদ্রলোকটি একগাল হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'বড়

ভাল ছেলে মশাই—একালে অমন ছেলে সত্যিই দুর্লভ। এক বছরের সীট-রেণ্ট আমার হাতে আগাম তুলে দিয়েছে। তবে কি জানেন—আর্টিস্ট তো! ওরা ঐ যেন কেমন এক ধরনের মানুষ। গেছে কোথায় চলে—আবার ফিরে আসবে একদিন হুট্ করে!'

খুব সতর্কভাবে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম মেসিং বাবদও তার কোন দেনা নেই, বরং কিছু বেশি টাকাই আগাম দেওয়া আছে।

আর একদিন আমি একা গিয়েছিলাম আমার সেই সহপাঠী ব্যারিস্টার বন্ধুর কাছে। তিনি তখন দিল্লী-যাত্রার আয়োজন নিয়ে মহা ব্যস্ত। আমার মুখে অরণ্যকুমারের নাম শুনে বলেছিলেন, 'কে? আমাদের মাস্টার মশাই-এর ছেলে? তোমার সঙ্গেও আলাপ আছে নাকি? বড় ভাল ছেলে—বুঝলে হে? এই তো আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে—ওর মা ছিলেন আমার মায়ের গঙ্গাজল—তা কোনদিন পাঁচটা টাকাও ধার চেয়েছে বলে মনে পড়ে না। আজকাল কি যে করে, কোথায় থাকে,—খবরই রাখতে পারি নে। দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই, মরবার সময় নেই। পরশু থেকে আবার পার্লামেণ্টের সিটিং শুরু হবে—'

নাঃ—হারিয়ে যাওয়া অরণ্যকুমারের সন্ধান করতে কেউ কোনদিন আমাদের কাছে আসবে না।

তবু মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ে।…

কোথায় গেল সে?

কেমন আছে?

আবার কি কোনদিন দেখা হবে?

পনেরো

অরণ্যের অন্তর্ধানের পর প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেছে। বিস্ময় ও বেদনা দুইএরই ধার একটু ভোঁতা হয়ে এসেছে। এমন সময় একদিন এক চিঠি এল—অরণ্যেরই চিঠি। ছোট বড় নানা সাইজের মস্তবড় একতাড়া কাগজ, নানান রঙের কালিতে লেখা—দেখলে বোঝা যায়, অনেক দিন ধরে একটু একটু করে লেখা হয়েছে।

শ্রীচরণেষু,

আমি মরি নি। আমাকে সাপে বা বাঘে খায় নি। আমি বেঁচে আছি, সুখে আছি, যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি।

আমার জন্য নিশ্চয় আপনাদের অনেক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়েছে—কিছু দুঃখও বোধ হয় দিয়েছি। সেজন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি।

সেদিন যখন চিনিবাবুকে নদীর ধারে গাড়ি থামাতে বলি তখন আমার মস্তিষ্ক বেশ ঠাণ্ডা, মনেও কোনরকম দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল না: এইবার সময় হয়েছে—এইবার আপনাদের ছেড়ে পালাতে হবে।—জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কিছুদূর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম। প্রথমে আপনাদের কানের নাগাল পেরিয়ে যাওয়া দরকার। মিনিট পাঁচ-সাত এমনি ভাবে কোনাকুনি চলার পর নদীর কাছে এসে পড়লাম। তার পর জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে নদী বাঁ-হাতে রেখে সোজা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলাম। মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিট সময় আমার হাতে আছে, তার পরই আপনারা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, ডাকাডাকি খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেবেন—তার আগেই আমাকে আপনাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। পথ হারাবার কোন আশঙ্কা নেই—যা নেই তা হারাব কি করে? পথ চিনি না, পথের শেষে কি আছে তাও জানি না। মনে মনে শুধু এইটুকু বিশ্বাস আছে, যে শক্তি আমাকে এতদূর টেনে এনেছে সে-ই আমাকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে

যাবে। স্বপ্নে-দেখা হাতছানির পথ! চোখ মেলে অন্ধের মত সেই পথেই ছুটে চললাম।

গভীর জঙ্গল—একেবারে নদীর খাড়া পাড় পর্যন্ত এসে পড়েছে। শুকনো মরা ডালপালা আর কাঁটার খোঁচা লাগছে, মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি—পায়ের জুতোজোড়াটা এর মধ্যেই প্রায় অকর্মণ্য হয়ে উঠেছে। কলকাতার ছেলে, ছোটাছুটির বড় একটা অভ্যাস নেই—বেশ হাঁপাচ্ছি। অনেকটা পথ এসে পড়েছি, এইবার আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কতদূর যেতে হবে, কতক্ষণ এইভাবে চলতে হবে—কিছুই জানা নেই। শুধু জানি, এই আমার পথ, এই পথেই আমাকে যেতে হবে। এই পথের শেষে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—কি ? তাও জানি না।

নদীটা এইখানে বাঁ-দিকে মোড় ঘুরেছে, জঙ্গলও তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-দিকে বেঁকেছে। নদীর বাঁক ধরে চলতে চলতে এই প্রথম মনে চিন্তার উদয় হল—না জানি আপনারা কি ভাবছেন, আমার ফিরতে এত দেরি হচ্ছে দেখে কত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন!

হঠাৎ শুনতে পেলাম, আপনাদের গাড়ির হর্ন বাজছে—অস্পষ্ট একটানা আওয়াজ। এতদিনকার পরিচিত জগৎ আমাকে ডাকছে—ফিরে যেতে বলছে। পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই হাতে কান চেপে আবার পাগলের মত ছুটতে আরম্ভ করলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছুটেছিলাম জানি না। যখন থামলাম তখন একেবারে বে-দম হয়ে পড়েছি। মেঘলা ঠাণ্ডা দিন, তবু সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে। পাথরে ঠোকর লেগে পায়ের আঙুল থেঁতো হয়ে গেছে। বোধ হয় কখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম—বাঁ হাতের চেটোর খানিকটা কিসে লেগে কেটে গেছে।

কিন্তু আর হর্নের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। পিছুটানের বাঁধন এইবার ছিঁড়েছে।

তার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর ধারের সেই জঙ্গলে পথ ধরে হেঁটে চললাম। মনটা একদম খালি—চিন্তাও নেই দুশ্চিন্তাও নেই! মাঝে মাঝে তেষ্টায় গলা

কাঠ হয়ে গেছে—খিদের যন্ত্রণাও অনুভব করেছি মাঝে মাঝে। তখন নদীর মধ্যে নেমে সেই ঘোলা জল আকণ্ঠ পান করেছি। তার পর আবার চলতে শুরু করেছি।

আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যদেব যখন দেখা দিলেন তখন বেলা বোধ দুটো-আড়াইটে হবে। আমার সামনে জঙ্গলও তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। জঙ্গলের পরই আরম্ভ হয়েছে ধানের ক্ষেত—নতুন-রোয়া ধানের চারায় টিয়া-পাখির পাখনার মত রঙ ধরেছে তার উপর। তার ওধারে একটা পাহাড়—কিছুদূর পর্যন্ত ঢেউ-খেলানো ঢালু জমির একটা ছোট্ট অধিত্যকা সৃষ্টি করে তার পর খাড়া পাথর আর জঙ্গলের জটিলতার মধ্য দিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। এই অধিত্যকার উপর নদীর ধার ঘেঁসে একখানা গ্রাম। কেন্দ্, মহুয়া ও পলাশ গাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো ছোট ছোট কুঁড়েঘরের বিচালি-দিয়ে-ছাওয়া চাল দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে ছবির মত অবাস্তব দেখাচ্ছে—আমার অদৃষ্টদেবীর নিজের হাতে আঁকা ছবি!

মনে হচ্ছে যেন সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি। সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত নিরুৎসুক জড়িমা। পিছনে সারারাত্রির সুদীর্ঘ স্বপ্ন পড়ে আছে—সামনেও কি স্বপ্ন? কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা সত্য বিচার করে দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। সে বিচারের অধিকারও কি আছে আমার?

ধানের ক্ষেত ডান দিকে রেখে নদীর পাড়ের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম। ঐ দিক থেকেই হাওয়া বইছে—হাওয়ায় কিসের গন্ধ এসে নাকে লাগছে। জল-জঙ্গল ক্ষেত-পাহাড় কিছুর গন্ধ নয়—এ অন্য একটা গন্ধ। অনেক ছোট ছোট পৃথক পৃথক গন্ধের সংমিশ্রণে তৈরি একটা বিচিত্র নতুন ধরনের গন্ধ—যেন একটা গন্ধের অর্কেস্ট্রা। নরম তুলোর কম্বলের মত আমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরছে, অত্যন্ত মৃদু আকর্ষণে আমাকে গ্রামের দিকে টানছে। কেন জানি না, রক্তের মধ্যেও একটা মৃদু চাঞ্চল্যের উত্তাপ আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। অনেক দিন আগে লোহারডগার কাছে সেই হাটের মধ্যে এই ধরনের গন্ধ একবার পেয়েছিলাম। তবে

আজকের গন্ধটা তত তীব্র নয়—এর শান্ত মাধুর্যের মধ্যে উত্তেজনার প্রাখর্য নেই।

ধানক্ষেত যেখানে শেষ হয়ে গেছে অথচ গ্রাম আরম্ভ হয় নি—সেইখানে একটা আঁকাবাঁকা-ডালপালা-ওয়ালা পাতায়-ছাওয়া মহুয়া গাছের গোড়ায় সাদা পুঁটুলির মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি, পুঁটুলি নয়, একটা আদিবাসী মেয়ে—বুকের কাছে দুই হাঁটু জড়ো করে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার মধ্যে মুখ গুঁজে বসে ঘুমুচ্ছে। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘুম থেকে জেগে উঠে মুখ তুলে আমার দিকে চাইল, তার পর তন্দ্রাচ্ছন্ন অলস কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার নাম ঝুম্‌রি। তুই কতক্ষণ এসেছিস?'

মিষ্টি নরম গলায় ভাঙা হিন্দির সঙ্গে বাঁকা বাংলা মেশানো মিষ্টি বুলি।—অত্যন্ত কচি নিটোল একখানা কালো মুখ, তাতে অত্যন্ত শান্ত কালো কালো দুটি চোখ আর অত্যন্ত নিরীহ মন্থর একটু হাসি।

ক্লান্ত কিন্তু নিশ্চিন্ত ভাবে ধপ্ করে তার সামনে মাটির উপর বসে পড়লাম।—আর ভয় নেই। ঠিক ঠিকানায় এসে পৌঁছে গেছি।

এই পর্যন্ত লিখে গোড়া থেকে চিঠিটা একবার পড়ে দেখলাম। পড়ে নিজেরই হাসি পেল। এসব আমি কি লিখেছি? এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হল আপনাদের সব কথা বুঝিয়ে বলা: কিসের সন্ধানে আপনাদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম? কেনই বা সেদিন ওরকম ভাবে আপনাদের ছেড়ে চলে এলাম? কি আমি চেয়েছিলাম? কেনই বা তা চেয়েছিলাম? এখন আমি কি অবস্থায় আছি?—এইসব কথা। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, কিছুই বোঝাতে পারি নি, বরং ব্যাপারটা আপনাদের কাছে আরও জটিল করে তুলেছি। আপনারা এতক্ষণ নিশ্চয় ভেবে বসে আছেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—পাগলামির ঝোঁকে যা-তা আবোল-তাবোল বকছি।

লৌকিক অর্থে ঠিক পাগল হয়তো আমি নই, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ মানুষ আমাকে বলা চলে কিনা পূরো চিঠিখানা পড়ার পর সেকথা আপনারাই বিচার করে দেখবেন।

আমার সত্যিকারের জীবন আরম্ভ হয় বাবার মৃত্যুর পর থেকে। কিন্তু তারও আগের দু-একটা কথা বলে নিলে হয়তো আমার পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা একটু সহজ হবে।···

অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় মাকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিলাম, 'তোমার এমন টুকটুকে ফরসা রঙ মা, তবে আমি এত কালো হলাম কি করে?'

এখন মনে পড়ে, সহসা প্রশ্নটা শুনে মা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তার পর শুকনো হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তোর বাবা যে কালো রে!'

ঠোঁট উলটে জবাব দিয়েছিলাম, 'তাই না আর কিছু! বাবা কি আমার মত এই রকম বিচ্ছিরি কুচকুচে কালো?'

তার পর মা আমাকে কোলে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলেছিলেন যে, আমি যখন তাঁর পেটে তখন তিনি দিনরাত্তির কেষ্টঠাকুরের ধ্যান করতেন। তাই তাঁর ছেলের গায়ের রঙ কেষ্টঠাকুরের রঙের মত কালো হয়েছে।

এ নিয়ে আর কোনদিন আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় নি।

তার পর, আমারি হাতের উল্‌কির সাপটির কথা। ছেলেবেলায় ওটার দিকে চাইলেই আমার কেমন ভয় ভয় করত। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে আতঙ্কে একেবারে সিটিয়ে যেতাম, ককিয়ে কেঁদে উঠতাম। ঠিক যেন মনে হত সাপটা অন্য কোথা থেকে এসে আমার হাতের উপর বাসা বেঁধেছে, ফাঁক পেলেই আমার গলায় কুণ্ডলির ফাঁস জড়িয়ে হিড় হিড় করে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে।—মাঝে মাঝে, বিশেষ করে রাত্রে, মা আমার বাঁ হাতের কবজিতে একটা চওড়া ন্যাকড়ার ফেট্টি বেঁধে দিতেন—যাতে উল্‌কিটা আমার নজরে না পড়ে। বড় হবার পর উৎকট ভয়টা অবশ্য কেটে গিয়েছিল, কিন্তু তবু

উল্‌কিটা দেখলেই মন অস্বস্তিতে ভরে উঠত। পারত-পক্ষে ওটার দিকে চাইতাম না।

মায়ের মৃত্যুর পরই কিন্তু উল্‌কির সাপের চেহারা বদলে গেল। একদিন চেয়ে দেখি, আর ভয় বা অস্বস্তি কিছুই অনুভব করছি না—বরং মনে হল যেন সাপটা অতি প্রিয় বান্ধবের মত আমাকে আকর্ষণ করছে। একবার তার দিকে চাইলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করছে না। এই সময় থেকে নির্জনে একা বসে উল্‌কির দিকে চেয়ে থাকা যেন আমার একটা গোপন নেশার মত দাঁড়িয়ে গেল। অথচ পরিণত বুদ্ধি দিয়ে নিজের আচরণের যুক্তিহীনতাও আমি বেশ বুঝতে পারতাম।···

বাবা মা দুজনেই আমাকে বড় বেশি ভালবাসতেন। একমাত্র সন্তানকে বেশি ভালবাসাই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু আমার নিজেরও মনে হত যেন এঁদের ভালবাসার প্রকৃতিটা একটু বেশি উগ্র, বেশি ঝাঁঝালো ধরনের। আর্ট কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ছুটিতে একবার হাজারিবাগ বেড়াতে যাব প্রস্তাব করেছিলাম। সেকথা শোনামাত্র মা দেয়ালে কপাল ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলেছিলেন। বাবা একবার আমাকে নিয়ে তাঁর কোন্ এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন—সেখানে নাকি তাঁর বন্ধুপত্নী আমার রং ও চেহারা নিয়ে দু-একটা বিদ্রূপ মন্তব্য করেছিলেন। তার পর থেকে বাবা আর তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। তাঁর বন্ধু একবার বাড়ি বয়ে দেখা করতে এসেছিলেন, বাবা দেখা করেন নি—দরজা থেকেই তাঁকে বিদায় করে দিয়েছিলেন।

আমিও তাঁদের ভালবাসতাম বই কি—খুবই ভালবাসতাম। কিন্তু তবু তাঁদের মৃত্যুর পর আমার মনের মধ্যে যে বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল সেটাকে বোধ হয় শোক বলে বর্ণনা করা ঠিক হবে না। দু-বারই আমার মনে হয়েছিল যেন আমি কি এক মহামূল্যবান বস্তুর মালিক ছিলাম, হঠাৎ তা হারিয়ে ফেললাম—আর কখনও ফিরে পাব না; যেন খুব একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল আমার চোখের সামনে, হঠাৎ দপ করে সেটা নিভে গেল।

নিজেকে রিক্ত বলে মনে হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা মুক্ত বলেও মনে হয়েছিল। মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলাম ; কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ে নি। প্রতিবেশীরা আমার আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

বাবার মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে থেকেই স্বপ্নটা দেখতে আরম্ভ করি।

একটা জায়গার স্বপ্ন।—জায়গাটার ছবি আপনি দেখেছেন : সেই নদী আর পথের স্বস্তিক-চিহ্ন, এপারে ঢেউ-খেলানো কাঁকুরে ডাঙা আর ওপারে মুখোমুখি-দাঁড়িয়ে-থাকা পাহাড় আর জঙ্গল। সবসুদ্ধ একুশবার আমি ঐ একই জায়গার স্বপ্ন দেখেছি, আর প্রত্যেকবার ঘুম ভেঙে উঠেই একখানা করে ছবি এঁকে ফেলেছি। আপনাদের সঙ্গে মোটর-ভ্রমণ শুরু করবার পর থেকে আর কখনও ও স্বপ্ন দেখি নি।

ছবিতে আমি ল্যাণ্ডস্কেপটাই শুধু এঁকেছি, কিন্তু স্বপ্নে প্রতিবার ঐ দৃশ্যের মধ্যে দুটো মনুষ্যমূর্তিও দেখতে পেতাম। একজনকে দেখতাম, নদীর উপরকার ব্রিজের উপর নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নদীতীরের জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে—এই লোকটা আমি নিজে। আর একজনের শুধু মুখখানা দেখতে পেতাম—অত্যন্ত কচি কোমল একখানা কালো মুখ, অত্যন্ত শান্ত এক-জোড়া কালো চোখ, আর অত্যন্ত নিরীহ মন্থর একটুখানি হাসি—জঙ্গলের কোণের মোটা শালগাছটার আড়াল থেকে উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে আছে। ওর চোখে চোখ মিলতেই আমার নিশ্চল দেহ চাপা উত্তেজনার তাড়সে থর্ থর্ করে কাঁপতে আরম্ভ করত—ঘুম যেত ভেঙে।

প্রথম যেদিন স্বপ্ন দেখি তার পরের দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয়েছিল যেন হঠাৎ আমি বহুদিন-আগে-হারিয়ে-যাওয়া কোন্ এক অমূল্য রত্ন আবার কুড়িয়ে পেয়েছি—অস্পষ্ট কুয়াশার জাল ছিঁড়ে যেন কোন্ এক অতিপরিচিত জগতের উজ্জ্বল আনন্দের আলো আমার মাথার উপর ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছিল যেন সত্যিকারের আমিটা সেই ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন

দেখছে—আমার কলকাতার সমগ্র জীবনটা বুঝি সেই স্বপ্ন! সমস্ত দিন ধরে আমি এক অদ্ভুত ধরনের হালকা উল্লাসের বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছিলাম।

বাবা মারা যাবার আগে পাঁচবার ঐ একই স্বপ্ন দেখি। ক্রমে ক্রমে আমি যেন দুটো বিভিন্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়লাম। মন-মেজাজও আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগল। বাইরের জীবনের চাঞ্চল্য কমে আসতে লাগল—সবই যেন কেমন অবাস্তব ঠেকত। একটা সম্ভাবনার কথা মাঝে মাঝে ভাবতাম। এমনও তো হতে পারে যে প্রতিদিন স্বপ্ন যেখানে শেষ হয় এক-দিন সেখানে শেষ হবে না—ব্রিজের উপরকার আমিটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠবে, পথ বেয়ে ওপারে চলে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ঐ কালো মুখখানার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। সেদিন এখানকার এই আমিটার ঘুম আর ভাঙবে না।

স্বপ্নের কি কোন গন্ধ আছে? আমি কিন্তু যখনই স্বপ্ন দেখতাম তখনই একটা গন্ধ পেতাম—অদ্ভুত একটা বুনো-বুনো গন্ধ, ভারী মিষ্টি গন্ধ! ঘুম ভাঙবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত গন্ধটা আমার নাকে লেগে থাকত।

আমার স্বভাবের পরিবর্তনটা বাবারও দৃষ্টি এড়ায় নি। একদিন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, "হ্যাঁরে, তোর শরীরটা কি আজকাল একটু খারাপ যাচ্ছে? একটা টনিক কিনে দেব—খাবি?'···

বাবার মৃত্যুর পরের রাত্রেই আবার স্বপ্ন দেখলাম। কিন্তু এবার সেই কালো মুখখানার পাশে সবুজ রঙের কাচের চুড়িপরা একখানা নরম কালো হাতও দেখা গেল—আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তার পর ঘন ঘন সেই একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। হাত-ছানির টান ক্রমশ দুর্নিবার্য হয়ে উঠল। স্বপ্নের আনন্দমোহ কেটে গেল, তার জায়গায় দেখা দিল বেদনা। প্রতিবার স্বপ্ন দেখবার পর সারাদিন ধরে বুকের মধ্যে মগজের মধ্যে টন্‌টন্ করতে থাকত। মনে হত যেন আমার সমগ্র চেতনার কেন্দ্রে কে একটা ধারালো বঁড়শি বিঁধিয়ে দিয়েছে আর বহুদূর থেকে অতি নির্মম ভাবে সেই বঁড়শির সুতো ধরে টানছে।

আমাকে যেতেই হবে। শিক্ষা, সভ্যতা, ছবি-আঁকা, জীবিকার্জন, কলকাতার

সদাচঞ্চল জীবনপ্রবাহ—সব ছেড়ে চলে যেতে হবে সেই স্বস্তিকচিহ্নিত পথ ও নদীর সঙ্গমস্থলে, যেখানে জঙ্গলের মধ্যে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে এক-জোড়া কালো চোখের শান্ত দৃষ্টি আর একখানা কালো হাতের হাতছানি।

কিন্তু কেমন করে যাব? এত চেনা জায়গা, কিন্তু সেখানে যাবার পথ তো চিনি না!

সারা ভারতবর্ষে কত পাহাড় প্রান্তর নদী জঙ্গল ছড়িয়ে পড়ে আছে, কত বনান্তরাল থেকে কত কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ উঁকি মেরে চেয়ে আছে। তার মধ্যে থেকে আমার নিজস্ব স্বপ্ননীড়টিকে আমি কেমন করে খুঁজে বের করব?

অসহ্য মানসিক বেদনার অন্তর্দাহ নিয়ে দিন কাটতে লাগল।

চিঠি বড় বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। বাকি বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে বলে ফেলা প্রয়োজন। বোঝাবার আর কিছুই নেই। এখন শুধু কয়েকটা ঘটনার বর্ণনা করলেই যথেষ্ট হবে।...

আপনার সঙ্গে দেখা করবার মাসখানেক আগে বাবার একটা তোরঙ্গের মধ্যে ছোট একতাড়া পুরনো চিঠির সন্ধান পাই। বিশ-বাইশ বছর আগেকার চিঠি—বাবাকে লিখেছিলেন তাঁর এক বন্ধু রাঁচি থেকে। স্পষ্ট কিছুই কোথাও লেখা নেই, তবু আভাসে ইঙ্গিতে চিঠিগুলো থেকে যা জানতে পারলাম তাতে আমার জীবনের মূল রহস্যটার সমাধান হয়ে গেল।

আমি বাবা-মায়ের আপন সন্তান নই—কুড়নো ছেলে। বাবা তখন রাঁচিতে কি কাজ করতেন। বন্ধ্যা স্ত্রীর অতৃপ্ত অপত্যস্নেহের আবেগ যখন প্রায় উন্মত্ততার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তখন একদিন কোথা থেকে তিনি একটা আদিবাসী ছেলে কুড়িয়ে এনে তাঁকে দিয়ে বলেন, 'এই তোমার ছেলে—একেই মানুষ করে তোল।'—তখন আমার বয়স বছর-তিনেক হবে।

[কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, না চুরি করে এনেছিলেন?—একখানা চিঠি থেকে জানতে পারলাম, আমাকে পাবার পরের মাসেই বাবা রাঁচির চাকরিতে

রিজাইন দিয়ে মাকে আর আমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তার পর আর কোনদিন তাঁরা কলকাতার বাইরে যান নি, আমাকেও যেতে দেন নি—একদিনের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল হতে দেন নি।—এত ভয় কিসের ?]

আমি সুসভ্য নাগরিক বাঙালীর ছেলে নই, আরণ্যক আদিবাসীর সন্তান।

অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল—কেন আমার গায়ের রঙ এত কালো, কেন বাঙালীর চোখে আমার চেহারাটাকে এত কুৎসিত ঠেকে, কেন আমার এমন একটা ন্যাকা ধরনের অদ্ভুত নাম রাখা হয়েছে, কেন আমার হাজারিবাগ বেড়াতে যাবার প্রস্তাব শুনে মা পাগলের মত মাথা কুটতে শুরু করেছিলেন।

উল্‌কির সাপ আর বারবার দেখা স্বপ্ন—এ দুটো রহস্যেরও সমাধান আমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে উঠল—অন্তরঙ্গ অনুভূতির দিক দিয়ে। আপনাদের বিচার হবে মনস্তাত্ত্বিক। সে-সম্বন্ধে আমার কিছু বলতে যাওয়া অনধিকারচর্চা হয়ে দাঁড়াবে।···

রাঁচি!

ঠিকানা মিলে গেছে। এইবার সন্ধানের পালা।

এর পরের কথা আপনারা সবই জানেন, যেটুকু জানতেন না চিঠির প্রথমাংশে তা জানিয়ে দিয়েছি। এইবার শেষ পর্বের ক'টা খবর দিয়েই বিদায় নেব।···

··· আর ভয় নেই। ঠিক ঠিকানায় এসে পৌঁছে গেছি।

হঠাৎ ঝুম্‌রির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই তো একটা বাবু বটিস্। এখানে কিজন্যে এসেছিস্? আমার কাছে কেন এসে বসেছিস্?'

মুখ তুলে শ্রান্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, 'আমি বাবু নই ঝুমরি—আমি এই গাঁয়েরই ছেলে, তোমাদেরই একজন। শহরের এক বাবু আমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, এতদিন পরে ফিরে এসেছি। তুমি আমাকে ডেকেছ তাই ফিরে আসতে পেরেছি।'

ঝুম্‌রি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর বিভ্রান্ত ভাবে থেমে থেমে বলে উঠল, 'আমি ? আমি আবার তোকে কবে ডাকলাম ?'

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ওর চোখের উপর চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগলাম, 'ভাল করে ভেবে দেখ তো ! তুমি কি আমাকে কখনও দেখ নি ? সেই নদীর ধারে—সেই মোটা শালগাছটার আড়াল থেকে উঁকি মেরে হাতছানি দিয়ে ডাক নি আমাকে ? মনে পড়ে ?—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—স্বপ্নের মধ্যে—?'

ঝুম্‌রির দুই চোখ আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে উঠল—বিহ্বল মুখের উপর ধীরে ধীরে আবার সেই নিরীহ মন্থর হাসির আভাস ফুটে উঠল।

একটা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, 'কি জানি !—চল্ তোকে বুড়ার কাছে নিয়ে যাই।'

বুড়ো সর্দার আমার কথা শুনে একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'সব বুঝেছি। গাঁয়ের ছেলে ! অমন গাঁয়ের ছেলে অনেক শালাই হতে চায়। তোর মত লুচ্চা বাবুদের আমি খুব ভাল করে চিনি। আমার এই ছুক্‌রি নাতনিটাকে নজরে লেগেছে, তাই এসেছিস্ গাঁয়ের ছেলে হতে। যা—পালা—ভাগ আমার গাঁ থেকে !'

হাত জোড় করে বললাম, 'সর্দার, তুমি গাঁয়ের সর্দার—আমারও সর্দার। তোমার কাছে আমি সুবিচার চাই। আচ্ছা, বল তো—একুশ বছর আগে, মানে এক কুড়ি এক বছর আগে তোমার গাঁ থেকে কি কোন ছোট ছেলে হারিয়ে যায় নি ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বুড়ো জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সে কথাটা ঠিক বটে।

এক কুড়ি এক বছর আগে—পরবের সময়—গাঁয়ের সবাই দল বেঁধে রাঁচি শহরে যাচ্ছিল, পথে জঙ্গলের মধ্যে মুন্নাবুড়ির বাপ-মা-মরা নাতিটা হারিয়ে যায়। তা—সেটাকে তো হুড়ারে খেয়েছিল!'

—'না সর্দার, হুড়ারে খায় নি। আমিই সেই ছেলে। কলকাতার এক বাবু আমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

—'তা তুই এতদিন বাদে কি করে পথ চিনে এখানে ফিরে এলি?'

এইবার কি জবাব দেব? আম্‌তা আম্‌তা করে পুরনো চিঠির কথা, স্বপ্নের কথা, সব বলতে শুরু করলাম। বুড়ো এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

—'চুপ কর্! বোকা জংলি পেয়ে ঠকাতে এসেছিস্—না? পালা এখুনি এখান থেকে, নইলে ঠেঙিয়ে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব, তার পর ঐ নদীর জলে ভাসিয়ে দেব।'

গ্রামের বাইরে সেই মহুয়া গাছের তলায় এসে বসলাম। আর কোথায় যাব আমি? এই গাঁয়ের কোন এক কুঁড়ে ঘরের মধ্যে চব্বিশ বছর আগে আমার জন্ম হয়েছিল—এই গাঁয়েই আমাকে বাঁচতে হবে, এই গাঁয়েই মরতে হবে। নিয়তির বাঁধনে আমার হাত-পা বাঁধা। কোথায় যাব?

সন্ধ্যাবেলা ঝুম্‌রি এল আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে—এক কোঁচড় মুড়ি আর কতকগুলো কাঁচা পেঁয়াজ নিয়ে।

সেইখানেই রাত কাটল। রাত্রে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। শরীরটা মজবুত আছে এই যা রক্ষা।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি ঝুম্‌রি এসে পাশে বসে আছে। নীরবে কাঁদছে—চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে। কেন কাঁদছে জিজ্ঞাসা করতে কোন জবাব দিল না—শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

গায়ের পাঞ্জাবি আর গেঞ্জি ভিজে জবজবে হয়ে গেছে—খুলে দূর করে টান মেরে ফেলে দিলাম। কি হবে আর ঐ সব ফেলে আসা ভুলে যাওয়া অস্তিত্বের জের টেনে বেড়িয়ে?

হঠাৎ ঝুম্‌রি চীৎকার করে উঠল, 'ও কি ?—তোর হাতে ওটা কি ? দেখি !'

বাঘিনীর মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দু-হাতে আমার বাঁ হাতখানা চেপে ধরল। তার পরই যেন ক্ষেপে উঠল মেয়েটা। হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাকে হিড়হিড় করে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল সর্দারবুড়োর সামনে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার হাতের উল্‌কিটার দিকে চেয়ে রইল বুড়ো। তার পর ফোকলা গাল অনাবিল খুশির হাসিতে ভরে উঠল।

—'হ্যাঁ—ঠিক, গাঁয়ের ছেলেই বটিস্‌ তুই। আমাদের এই পাহাড়ের শিঙাল সাপের ছবি—মুন্নাবুড়ির আপন হাতে আঁকা। এমন লাল রঙের উল্‌কি আর কাউকে কখনও আঁকতে দেখি নি।'

তার পর ?

বুড়োর বাড়িতেই খাই থাকি। ক্ষেতে কাজ করি, বনে কাঠ কাটি। তীর-ধনুক চালাতে শিখেছি—মাঝে মাঝে শিকারেও বেরুই।—সুখে আছি।

এখন ধানকাটা শুরু হয়েছে। শেষ হলে আমিও একটা ভাগ পাব—মজুরি হিসেবে। তখন গাঁয়ে নিজের ঘর বাঁধব।

তার পর—বড় পরবের পরের পূর্ণিমায় ঝুম্‌রির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

আর জানেন ? ঘুম্‌রি বলেছে—আমি নাকি খুব সুন্দর দেখতে ! আমার মত গায়ের রঙ, আমার মত নাক মুখ চোখ নাকি গাঁয়ের আর কোন ছেলের নেই ! গাঁয়ের আর সব মেয়েরা নাকি ঝুম্‌রির সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত !

এমন কথা জীবনে এই প্রথম শুনলাম।—ইতি

আপনাদের স্নেহধন্য

বাবুয়া ওঁরাং

(অর্থাৎ যে একদিন অরণ্যকুমার ছিল)

ষোলো

উচ্চৈঃশ্রবার কথা মনে হলে এখনও দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে পারি না—চিনিবাবুর এখনও চোখ ছলছল করে ওঠে।

চোখে দেখে নামকরণ করেছিলাম—পুষ্পক। কিন্তু চড়ে একপাক ঘুরে আসবার পরই নাম পাল্টাতে বাধ্য হলাম—পুষ্পক নয়, উচ্চৈঃশ্রবা।

চিনিবাবুর অসাধারণ যান্ত্রিক নৈপুণ্য অগ্রাহ্য করে সে তার হ্রেষাধ্বনির তীব্রতা ও অবিচ্ছিন্নতা পুরোপুরিই বজায় রেখেছে। এ বাহন নিয়ে কলকাতার শৌখিন অঞ্চলে বেড়াতে বেরুলে আপৎপাত অনিবার্য; লোকে টিটকারি দেবে, ছেলেরা ঢিল ছুঁড়বে, পুলিসেও নম্বর নিতে পারে।

সুতরাং সে চেষ্টা আমরা কখনও করি নি। কিন্তু বনে-পাহাড়ে ভ্রমণ উপলক্ষে বহুবার সে আমাদের সাথী হয়েছে, যেখানে আর কোন গাড়ি যেতে পারে না সেখানে অনায়াসে চলে গেছে, মালপত্রসুদ্ধ প্রমাণ সাইজের ছ-সাত জন আরোহীকে বিনা আপত্তিতে মাইলের পর মাইল টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে।

এমন বিশ্বস্ত বাহন আর আমরা কোথাও পাব না।

উচ্চৈঃশ্রবার আদি মালিক ছিলেন মল্লিকমশাই—চিনিবাবুর চেনা মানুষ। পি-ডব্লিউ-ডি-র ঠিকাদারি করতেন—একটানা বিশ বছর ধরে হুগলি-হাওড়া-চব্বিশ পরগনার আদাড়ে-বাদাড়ে কাঁচাপাকা নানা পথে এই এক গাড়ি দাবড়ে বেড়িয়েছেন। তিনিও নাকি কিনেছিলেন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

তার পর একদা প্রভাতকালে চিনিবাবুর গ্যারাজের দরজায় উচ্চৈঃশ্রবার শুভ আবির্ভাব হল। মহিষের গাড়ির পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে। সে দৃশ্য যে দেখেছিল সেই হেসেছিল।

মান্ধাতার আমলের ফোর্ডগাড়ি। প্রকাণ্ড ঢাউশ চেহারা। উপরে হুডের কঙ্কাল-কাঠামোটি মাত্র খাড়া আছে, আচ্ছাদন-বস্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই।

সাইকেল-স্পোক-ওয়ালা চাকা চারখানার উপর গাড়ির শ্যাসি মাটি থেকে দেড়হাত উঁচু হয়ে আছে—মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড ঢ্যাঙা ও মোট্‌কা চেহারার একটা মানুষ আট হাত বহরের ধুতি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রঙ-চটা বিবর্ণ মূর্তি, সর্বাঙ্গে টোল-খাওয়া তোবড়ানো দাগ, একটা দরজা কাতার দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে, সামনের দুটি মাডগার্ডই জঙ ধরে ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এমন গাড়ি দেখে কে না হাসবে বলুন? গ্যারাজের ছোকরা মিস্তিরিরা নাম দিয়েছিল—বালতি-গাড়ি।

চিনিবাবু কিন্তু হাসেন নি, ভড়কেও যান নি। সযত্নে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের পর রায় দিয়েছিলেন: 'কোন চিন্তা করবেন না মল্লিক মশাই; পুরনো জিনিস, হাড় মজবুত আছে। মাস দেড়েক পরে আসবেন—দেব ঠিক খাড়া করে।'

তার পর কি যে হল,—হাতের আর সব কাজ ফেলে রেখে চিনিবাবু এই এক কাজ নিয়ে মেতে উঠলেন। মিস্তিরিদের অন্য কাজে লাগিয়ে দিয়ে নিজে সারাদিন ধরে উচ্চৈঃশ্রবার পরিচর্যা করেন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের সন্ধানে নূতন-পুরাতন নানা বাজার ঢুঁড়ে বেড়ান, নিয়মিত স্নানাহার করবার পর্যন্ত সময় পান না। যান্ত্রিক জরা জয় করবার নেশায় তিনি তখন মশগুল। আমরা বলাবলি করতাম, চিনিবাবু বোধ হয় বুড়ো গাড়িখানার প্রেমে পড়ে গেছেন।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল। ব্যাটারি-এঞ্জিন-গিয়ার-ব্রেকের জটিল ব্যাধি নিরাময় হল, মাথায় নতুন হুডের ঘোমটা উঠল, নবীভূত কলেবর রঙ-পালিশের মেক-আপে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল।

চিনিবাবুর কায়কল্প-চিকিৎসার গুণে উচ্চৈঃশ্রবার হারানো যৌবন আবার ফিরে এল।

শুধু সেই পিলে-চমকানো হ্রেষাধ্বনির তিনিও কোন প্রতিবিধান করতে পারলেন না।

দেড় মাস পরে মল্লিক মশাই এলেন। গাড়ি দেখে খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না, কারণ চিনিবাবুর সাড়ে-চার শ টাকার বিলখানা দেখে তখন তাঁর প্রায় নাড়ী ছাড়বার উপক্রম হয়েছে। ঠিকাদারির দিনকাল আর তেমন ভাল চলছে না। বয়স হয়েছে, ভাল ভাল কাজ ধরবার মত তদ্বির-তাগাদা আর করে উঠতে পারেন না। কাজের মুনাফাও অনেক কমে গেছে—নানা নতুন নতুন বখরাদারের আবির্ভাব হয়েছে। এতদিন ধরে যা রোজগার করেছেন ছ-ছটা মেয়ের বিয়ে দিতে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় চা র শ টাকা! নেহাৎ গাড়িখানাকে ভালবাসেন, তাই—

চিনিবাবু সব খবরই রাখেন। তবু নীরস কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'কি গাড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন মনে আছে তো? আর আমি কি করেছি—ঐ চেয়ে দেখুন। পয়সা তো লাগবেই।'

রবিবার রাত্রে আসবেন বলে মল্লিক মশাই বিদায় হলেন। এলেন যখন, তখন গাড়ির ব্লু-বুক টোকেন সব সঙ্গে নিয়েই এলেন। সেগুলো চিনিবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'তোমার বিল আর আমি শোধ করতে পারব না বাবা, ও গাড়ি তোমার কাছেই থাক। ভাঙা হ'ক, বুড়ো হ'ক, গাড়িখানাকে বড় ভালবাসতাম। তা থাক তোমার কাছে—তবু যা হ'ক যত্নে থাকবে।'

এমনি ভাবে উচ্চৈঃশ্রবা আমাদের বাত্তিক-বাহিনীর বাহনে পরিণত হল।

•

পারিবারিক বা অন্যবিধ কারণে বাইরে বেরুবার সময় বড়দা কি হিতেন-বাবুর গাড়ি না পেলে আমরা উচ্চৈঃশ্রবার শরণাপন্ন হতাম। মাঝে মাঝে সহযাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধিও বাধ্য করত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে।

উচ্চৈঃশ্রবা আমাদের অনেক পথে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে—আমাদের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অংশীদার ছিল সে। কোনদিন আমাদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নি। সাধারণ ড্রাইভারেরা অবশ্য তার উৎকট হ্রেষাধ্বনি শুনে বিষম ভয় পেয়ে যেত, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইত না যে এ গাড়ি নিয়ে

কোন দূরের পাল্লায় পাড়ি দেওয়া সম্ভব। চিনিবাবুও এর স্টিয়ারিঙে আর কাউকে কোনদিন বসতে দেন নি।

পথে অন্যান্য গাড়ির মালিকেরা তার চেহারা দেখে আওয়াজ শুনে হেসেছে, লরিওয়ালারা কটু-কষায় মন্তব্য করেছে, ভয়-পেয়ে-পালানো গরুর পালের রাখালেরা গালাগাল দিয়েছে। কিছুই আমরা গায়ে মাখি নি। সাত-আটজন যাত্রী বইতে পারে, প্রয়োজন হলে চারজনের রাত্রে শোবার ঠাঁই জোগাতে পারে—এমন গাড়ি পাবার সৌভাগ্য যখন আমাদের হয়েছে তখন পরের কথায় কান দিতে যাব কোন্ দুঃখে ?

উচ্চৈঃশ্রবা সঙ্গে না থাকলে গুণিবুড়ির গ্রাম সেবার আমাদের দেখা হত না—ভ্রাম্যমাণ জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম।…

আসছি গিরিডি থেকে, যাব বগোদর। ত্রিভুজের দুই বাহুর দীর্ঘতর পথ ঘুরেই আমাদের যেতে হবে, কারণ কোন হ্রস্বতর তৃতীয় বাহুর সন্ধান আমরা জানি না।

বেলা দেড়টা বেজেছে, সামনে আরও প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। কেন জানি না, সবাই বড় ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। অবিলম্বে আশ্রয় ও বিশ্রাম প্রয়োজন। অথচ ডুমরিতে থামবার উপায় নেই—আগে থাকতে কথা দেওয়া রয়েছে, বড়দা তাঁর গাড়ি নিয়ে বগোদরে আমাদের জন্য পথ চেয়ে বসে আছেন।

এমন সময় চিনিবাবু স্পীড কমিয়ে গাড়ি থামিয়ে ফেললেন। ডান দিক দিয়ে একটা মোরামের রাস্তা বেরিয়ে গেছে। খুব ভাল রাস্তা নয়, তবে বেশ চওড়া আছে, আর কোনাকুনি যেদিকে চলে গেছে তাতে মনে হয় বগোদরের কাছাকাছিই কোথাও গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মিশেছে।

ত্রিভুজের তৃতীয় বাহু !

ঈষৎ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে হিতেনবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এ পথে কি গাড়ি যাবে ?'

পাশের জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে গাড়ির গায়ে একটা চাপড় মেরে

চিনিবাবু উত্তর দিলেন, 'কোন ভয় নেই, আমার উচ্চৈঃশ্রবা ঠিক চলে যাবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বগোদরে পৌঁছে যাব।'

এমন সময় দেখা গেল সেই পথ দিয়েই একজন রাহী আসছে—খালি গা, খালি পা, পরনে নেংটি, কিন্তু মাথায় প্রায় পাঁচ গজ কাপড়ের একটা প্রকাণ্ড পাগড়ি। কাঁধে লাঠি, তা থেকে ঝুলছে একটা ছোট্ট পুঁটুলি—নতুন গামছা দিয়ে পরিপাটি করে বাঁধা। দেখলেই বোঝা যায় দূরের যাত্রী।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ পথ দিয়ে বগোদরে যাওয়া যাবে তো ভাই?'

হন হন করে চলতে চলতে লোকটা জবাব দিল, 'হঁ বাবু, আমি তো বগোদর থেকেই আসতেছি।'

চিনিবাবু নিশ্চিন্ত মনে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।.....

পথ মন্দ নয়, উচ্চৈঃশ্রবার পক্ষে বেশ ভালই বলা চলে। এর চেয়ে ঢের বেশি খারাপ রাস্তায় সে সারাজীবন চলে এসেছে। তার অভ্যস্ত হ্রেষাধ্বনির মধ্যে আর্তনাদের কোন আভাস নেই।

পথের দুপাশের দৃশ্যের শান্ত সৌন্দর্য চোখে বড় মধুর লাগছে। ঢেউখেলানো ঘাসে ঢাকা জমির উপর হরীতকী আমলকী আর পলাশের বন। মাঝে মাঝে দু-একখানি কুঁড়েঘরের গ্রাম—দ্বৈপ্রাহরিক নিস্তব্ধতায় যেন ঝিম্ ধরে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দুটো-একটা টিলার মত পাহাড়, তার গায়ে গরু বা ছাগলের পাল চরে বেড়াচ্ছে। পথ-চল্‌তি মানুষ খুব কমই নজরে পড়ছে।

এ পথে আর কখনও আসি নি, তাই বোধ হয় এত ভাল লাগছে। আস্তে আস্তে মন থেকে ক্লান্তির ভাবটা কেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ অগ্রগমনে বাধা পড়ল। সামনে একসারি পাহাড়। বাঁ দিক থেকে মোড় ঘুরে পাঁচিলের মত এদিকে এসে পড়েছে—সোজা পথের সম্ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়ে। পথও তার সঙ্গে তাল রেখে ডান দিকে বেঁকে গেছে।

লাবু বলে উঠল, 'একি! আমরা যে উলটো দিকে চললাম!'

চিনিবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'না, উলটো দিকে যাব কেন। এই পাহাড়টা কাটিয়ে নিয়েই আবার সোজা পথ পাওয়া যাবে। খানিকটা ঘুর হয়ে গেল—এই যা।'

কিন্তু পাহাড়টা কাটাতে কাটাতেই আড়াইটে বেজে গেল। আর তার পরই আরম্ভ হল এ পথের আসল মজাটুকু।

চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়। তার কোনটা শুধু ঘাসে ছাওয়া, কোনটার উপর ঝোপ-জঙ্গলের দুর্ভেদ্য জটিলতা—নানা আরণ্য আতঙ্কের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, কোনটায় বা ঘাস মাটি গাছপালা কিছুই নেই—শুধু কতকগুলো ন্যাড়া পাথর গাদা হয়ে পড়ে আছে, বিরাটকায় প্রাগৈতিহাসিক দানবের কঙ্কালস্তূপের মত।

এই অযত্নবিন্যস্ত শৈলব্যূহের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পথও যেন ক্ষেপে উঠেছে। কখনও ডাইনে বেঁকেছে, কখনও বাঁয়ে, কখনও বা কুকুরের লেজের মত ক্রমাগত কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে যেন কোন্ অজ্ঞাত রহস্যকেন্দ্রে পৌঁছুবার চেষ্টা করছে।

কোথায় যাচ্ছি, কোন্‌দিকে যাচ্ছি, কিছুরই আর ঠিক হদিশ করে উঠতে পারছি না।

হঠাৎ বাঁ-দিকের দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দূরে যেন দেখতে পেলাম গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই পাশের বৃক্ষবীথিকার অস্পষ্ট আভাস। কোথায় যেন রেল-গাড়ি চলার ঘস্ ঘস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না?

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই পথ আর পাহাড়ের গোলকধাঁধার মধ্যে দিশা হারিয়ে ফেললাম—ক্ষীণদীপ্তি আশার প্রদীপ একবার একটু জ্বলেই আবার নিভে গেল।

চলেছি তো চলেইছি—এ চলার যেন আর শেষ নেই। সাড়ে তিনটে অনেকক্ষণ বেজে গেছে। পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণতর হয়ে উঠছে।

চারটে বেজে গেল। হতাশ কণ্ঠে হিতেনবাবু বললেন, 'এ পথের উপর আর কোন ভরসা নেই, চিনি। এবার ফিরলে হত না?'

চিনিবাবু কোন জবাব দিলেন না। তিনি তখন মাথা নীচু করে গাড়ির এঞ্জিনের দিকে কান ফিরিয়ে একমনে কি যেন শুনছেন।

উচ্চৈঃশ্রবার হ্রেষাধ্বনির মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক শুকনো ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। উচ্চৈঃশ্রবা হাঁপাচ্ছে।

চিনিবাবু গাড়ি থামিয়ে ফেললেন, তার পর নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'তেল ফুরিয়েছে।'

তিনজনে একসঙ্গে আঁৎকে উঠলাম।

—'বলেন কি আপনি! এই অজানা জায়গা—চারিদিকে জঙ্গল আর পাহাড়—এখন উপায়?'

—'এতক্ষণ ধরে এত দূর পথে ঘোরবার তো কথা ছিল না। অজানা পথে এমন ভাবে হুট্ করে ঢুকে পড়া ঠিক হয় নি। দোষ আমাদেরই, আমার উচ্চৈঃশ্রবার কোন অপরাধ নেই।'

লাবু প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি আর কক্ষনো চিনিকাকার সঙ্গে গাড়িতে বেরুব না। আমাকে সঙ্গে নিলেই উনি একটা না একটা বিভ্রাট বাধিয়ে বসেন। সেবার সারান্দার জঙ্গলে জীপগাড়ি বিগ্‌ড়ে গেল, এবার আবার—'

অদূরে পথের ধারে ছোট একখানা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। চিনিবাবু ও লাবুকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে আমরা দুজন সেইদিকে রওনা হলাম। তেল এখানে পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। দেখি, তবু যদি কোন ব্যবস্থা করা যায়।

গ্রামে ঢুকতেই দাড়িওয়ালা যে লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সে আমাদের সব কথা ভাল করে শোনার আগেই বলে উঠল, 'বাত-চিত পিছু হোগা, অব্ মেহেরবানি কর্‌কে চলিয়ে তো হমারা সাথ।'

গ্রামখানি ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কুঁড়েঘরের চালগুলি নতুন খড় দিয়ে পরিপাটি করে ছাওয়া। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির পাশেই দেখতে পেলাম এক টুকরো করে তরি-তরকারির বাগান।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে দুখানা বড় বড় চালাঘর—তারই একখানার সামনে আমাদের নিয়ে এল লোকটি। চওড়া বারান্দার দুই প্রান্তে দুখানা দড়ির খাটিয়া, মাঝে ছোট একটা ময়লা পুরনো টেবিলের পাশে একখানা লম্বা বেঞ্চি ও কয়েকখানা ছোট ছোট মোড়া ও চৌকি ; একখানা হাতল-ভাঙা জরাজীর্ণ চেয়ারও আছে তার মধ্যে। আমাদের আসন-গ্রহণ করতে বলে লোকটি বাড়ির ভিতর চলে গেল—বোধ হয় গৃহস্বামীকে খবর দেবার জন্য।

একটু পরেই যাঁকে সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে এল তিনি গৃহস্বামী নন—গৃহস্বামিনী।

কিন্তু এ কি চেহারা! মনে হল যেন রূপকথার কোন ডাইনি-বুড়ি মূর্তি ধরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাত-বিরেতে হঠাৎ সামনে পড়লে ছেলেমেয়েরা তো দাঁতকপাটি লেগে মূর্চ্ছা যাবেই, বড়-রাও যে খুব স্বস্তি অনুভব করবেন তা মনে হয় না।

দীর্ঘ শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। কালো কুচ্‌কুচে রঙ। মুখের লোলচর্মের ভাঁজে ভাঁজে বলিরেখার আঁকিবুকি। অতিপ্রকট দুই গণ্ডাস্থির নীচে ভাঙা গালের গহ্বর, তার নীচে লম্বাটে ছাঁচের চিবুক সামনের দিকে একটু বেঁকে বেরিয়ে এসেছে—ঠিক নাকের ডগার উপর একটা মস্তবড় সরোম আঁচিল। মাথার কাঁচাপাকা চুল পুরুষদের মত ছোট করে ছাঁটা। গায়ে একটা আধ-ময়লা হলদে রঙের আলখাল্লা-জাতীয় সেকেলে গাউন। পায়ে ছেঁড়া ন্যাকড়ার চটি।

কিন্তু এই বীভৎস মুখখানার দিকে চাইতেই নজরে পড়ল দুটি চোখ—ঝাঁকড়া দুই ভ্রূর নীচে সুগভীর কোটর-কূপের মধ্য থেকে স্থিরদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। আশ্চর্য, অসাধারণ দুটি চোখ! মনে হল যেন শরীরের সমস্ত জীবনী-শক্তি ঐ দুটি চোখের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে সেখানে এক অপূর্ব প্রসন্নতার উজ্জ্বল দীপ্তি জ্বালিয়ে রেখেছে। তীক্ষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ সেই দৃষ্টি। অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে একটু চমকে উঠলাম।

আরও বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন—ইংরেজিতে: 'আমি মিসেস্ গুণবর্ধন।'—তার পর দূরে পথের উপর দাঁড়ানো উচ্চৈঃশ্রবার দিকে একবার চেয়ে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কজন আছেন?'

অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত স্পষ্ট, বাঁশির মত সুরেলা কণ্ঠস্বর। ঐ শুকিয়ে-যাওয়া অস্থিচর্মসার দেহের ভিতর থেকে এমন মধুর আওয়াজ বেরুতে পারে! কানে শুনেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

উত্তর শুনে লোকটিকে হুকুম দিলেন, 'ভিতর যাও আবদুল, মেবেল-দিদিমণিকো বোলো কি চার মেহ্মান আয়া—চায় বানানে হোগা!'

আমাদের দুর্ভোগের কথা শুনে একটু হেসে বললেন, 'আপনারা বেজায় ভুল করেছেন। যে পথ বগোদরে গেছে সেটা পায়ে-চলা পথ—সেই পাঁচিলের মত পাহাড়টার উপর দিয়ে অনেক নদী-নালা পার হয়ে বাঁ-দিকে কোনাকুনি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিশেছে। আমাদের এ পথ ধরে সারাদিন ঘুরলেও আপনারা বগোদরের কাছে পৌছুতে পারতেন না—বরং ক্রমশ আরও দূরে গিয়ে পড়তেন। বগোদর যেতে হলে আপনাদের ঐ ডুম্‌রি ঘুরেই যেতে হবে—আর কোন পথ নেই।'

আবদুল ফিরে এলে তাকে বললেন গাঁ থেকে জনকয়েক লোক যোগাড় করে গাড়িখানাকে ঠেলে নিয়ে আসতে।

তার পর একটু চিন্তিত ভাবে বললেন, 'তাই তো! পেট্রোল তো কাছাকাছি কোথাও মিলবে না। তার জন্য সেই বগোদরেই যেতে হবে।—আচ্ছা, সে যা হ'ক একটা ব্যবস্থা হবে এখন। আপাতত একটা রাত্রি দয়া করে আপনারা আমাদের আতিথ্য স্বীকার করুন।'

বড়দা বগোদরের ডাকবাংলোয় বসে বসে ভাবছেন—সারারাত তাঁর দুশ্চিন্তায় কাটবে। ভবিষ্যৎ ভ্রমণের সব সিডিউল ওলট-পালট হয়ে গেল। তবু বিশেষ কোন উদ্বেগ অনুভব করছি না। মনটা আস্তে আস্তে যেন জুড়িয়ে নিরুত্তাপ হয়ে আসছে।

বড় শান্ত গ্রামখানা। সামনে একটা মাঠের মত জায়গায় কতকগুলো

ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে, কলরব করছে। এ ছাড়া আর কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। বিকেলের আলো সোনালি হয়ে উঠেছে। দূরের পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে মাথার উপর নীলাভ কুয়াশায় অবগুণ্ঠন টেনে দিচ্ছে।—আজকের রাত আমাদের এখানেই কাটাতে হবে—চিন্তাটার মধ্যে কেমন যেন একটা নিশ্চিন্ত তৃপ্তির আমেজ অনুভব করছি।

লাবু ও চিনিবাবুকে নিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজায় এসে হাজির হল। কিন্তু পারিশ্রমিক বা বকশিশের কথা তোলবার আগেই দেখি আবদুল ও তার সহকর্মীরা নিঃশব্দে কোথায় সরে পড়েছে।

তার পর মেবেল চা নিয়ে এল। তের-চোদ্দ বছরের গোলগাল চেহারার একটি মেয়ে। পরনে মোটা রঙিন কাপড়ের ফ্রক, খালি পা, মাজা-মাজা শামলা রঙ। মুখে মিষ্টি লাজুক হাসি। শুনলাম, আগে কোন্ খ্রীষ্টান অনাথাশ্রমে ছিল—মিসেস্ গুণবর্ধন নিয়ে এসে মানুষ করছেন।

চায়ের সঙ্গে এল তেল-নুন-মরিচ মাখা ছোলাসিদ্ধ আর মুড়ির মোয়া।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম সবাই। কে এই মিসেস্ গুণবর্ধন? ইংরেজি বলেন ঠিক মেমসাহেবের মত, অথচ মেমসাহেব নন। সুশিক্ষিতা বলেই মনে হয়। তবে কেন এই গরিব গাঁয়ে গরিবদের মধ্যে গরিবের মত জীবন যাপন করছেন? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলাম।

না, কোন মিশনরী সঙ্ঘের সদস্যা তিনি নন। এ গাঁয়ে হিন্দু মুসলমান আদিবাসী সবই আছে—খ্রীষ্টান একমাত্র তিনি ও মেবেল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এখানে আস্তানা গাড়েন নি।

তবে?

মিসেস্ গুণবর্ধন সিংহলের একজন ধনী প্ল্যাণ্টারের একমাত্র কন্যা। ছেলেবেলায় মা মারা যান। বাবা তাঁকে কন্ভেণ্টে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বিয়েও দিয়েছিলেন বড় ঘরে—বিলাতফেরত ব্যারিস্টারের সঙ্গে।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই তিনি বুঝতে পারলেন, স্বামী চরিত্রহীন, মদ্যপ, জুয়াড়ী। শুধু টাকার লোভেই তাঁকে বিয়ে করেছেন।

তবু আট-দশ বছর সহ্য করেছিলেন তিনি। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর স্বামী একেবারে চরমে উঠলেন—টাকার জন্য মারপিটও শুরু করে দিলেন। অবশেষে মরীয়া হয়ে মিসেস্ গুণবর্ধন ডিভোর্সের মামলা জুড়ে দিলেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। মা-বাপ-মরা যুবতী মেয়ে, হাতে অনেক টাকা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব নানা হিতৈষীরা এসে চারিদিকে ভিড় জমাতে লাগল। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—মোটা রকমের কিছু বাগিয়ে নেওয়া। হবু স্বামীরাও একে একে এসে দেখা দিতে লাগলেন। কিন্তু দাম্পত্য-সুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁর একবারেই মিটে গিয়েছিল—আর সে ফাঁদে পা দিলেন না।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। কিন্তু জীবনে শান্তি নেই—বড় কিছু করবার সুযোগও নেই। মন ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ স্পেনদেশীয় এক সর্বত্যাগী খ্রীষ্টান সাধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এঁর কাছ থেকে তিনি এক বিচিত্র বিশ্বব্যাপী ধর্মসমাজের সন্ধান পেলেন। মন তাঁর মেতে উঠল।

প্ল্যান্টেশন বেচে দিলেন। কিছু টাকা দুঃস্থ আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিলেন, বাকি হাজার ত্রিশেক টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে এলেন।

তার পর তিনি অনেক ঘুরেছেন, অনেক রকম কাজ করেছেন, অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। শেষকালে প্রায় দশ-বারো বছর হল এই গাঁয়ে এসে ডেরা বেঁধেছেন।

তখন এ গাঁয়ের লোকের বড় দুরবস্থা ছিল। কারও এক কাঁচ্চা জমি নেই —পরের জমিতে মজুর খেটে আর পাহাড়ের জঙ্গল থেকে চুরি করা কাঠ বেচে দিন গুজরান করে। দিনান্তে একবেলা কাঁদা আর খেসারির ডালের 'খিচুড়ি

জুটল তো খুব জুটল। নেংটি পরে থাকে। গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি খুপড়ির মধ্যে রাত্রিবাস করে।

মিসেস্ গুণবর্ধন এতদিনে একটা কাজের মত কাজ পেয়ে গেলেন। এদের দুঃখ দূর করতে হবে।

অনেক খুঁজে-পেতে গ্রামের কাছাকাছি পাহাড়ের মধ্যে একলপ্তে দেড়-শ একর অনাবাদী জমি তিনি কিনে ফেললেন। কিনলেন বেশ সস্তাতেই। তার পর নিজের পয়সায় এদের দিয়ে মজুর খাটিয়ে সেই জমি সাফ করে তাকে চাষের উপযুক্ত করে তুললেন।

তার পর তিনি গাঁয়ের লোকদের ডেকে বলে দিলেন, এ জমি তাদের সকলের—সবাই মিলে চাষ করবে, মাথা-গুন্তি হিসেব করে চাষের ফসল সমান ভাবে ভাগ করে নেবে। গাঁয়ের যে বাড়িতে কাজ করবার মত জোয়ান লোক নেই তাদেরও ভাগের ভাগ দিতে হবে। জমি গাঁয়ের—গাঁ সকলের। গাঁয়ের মধ্যে যখন যা কাজ পড়বে, যার অবসর থাকবে তাকেই তা করে দিতে হবে—নিজের কাজ কি পরের কাজ হিসেব করলে চলবে না।

তিনি নিজেও তাদের মত ফসলের একটা ভাগ ছাড়া আর কিছুই চান না।

একটা মাত্র শর্ত। তাঁর ধর্মসমাজের একটা আইন সবাইকে মেনে চলতে হবে। সেটা হচ্ছে—

বাধা দিয়ে হিতেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু ধরুন, যদি অজন্মা হয়?'

—'আমাদের জমি খুব ভাল। পাহাড়ের প্রচুর জল পায়—অজন্মা হবার সম্ভাবনা কম। আর যদিই হয়—সেই ত্রিশ হাজার টাকার এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, তার সদ্ব্যবহার হয়ে যাবে। তাতেও যদি না কুলোয়, একটা বছর সবাই মিলে না হয় আবার দিনমজুরি করে আর কাঠ কুড়িয়ে চালিয়ে নেব।'

রূপকথা শুনছি কি? বাইরের জগতে এখন মেরুতে মরুতে আণবিক

বোমা ফাটছে, নররূপী জানোয়ারের দল ভবিষ্যৎ হত্যা-উৎসবের প্রত্যাশায় নখদন্তে শাণ দিচ্ছে, মুনাফাখোরদের নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে শতাব্দীর অন্তরাত্মা শিউরে উঠছে। আর এখানে ?—এখানে বসে আমরা এসব কি শুনছি !

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লণ্ঠন হাতে আবদুল এসে খবর দিল, মেহ্‌মানদের বিস্ত্রা বিছানো হয়ে গেছে, তাঁরা এখন নিজেদের ঘরে গিয়ে থোড়া আরাম করুন।

মিসেস্ গুণবর্ধন ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন : 'তাই তো, কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে ! আপনারা ক্লান্ত—যান যান, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।'

আবদুল আলো ধরে পাশের চালাঘরখানায় নিয়ে গেল আমাদের। ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। পাশাপাশি চারখানা খাটিয়ার উপর বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে। এক কোণে এক কলসি জল ও একটা পিতলের গেলাস। বাইরের বারান্দায় একখানা জলচৌকির সামনে বড় এক বালতি জল ও একটা লোটা বসানো রয়েছে। •

কাপড়চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। তার পর যে যার বিছানায় গা ঢেলে দিলাম।

কারও মুখে কোন কথা নেই। মগজের মধ্যে নানা অদ্ভুত চিন্তার রাশি যেন গজ্‌গজ্ করছে—কিন্তু সে চিন্তার সঙ্গে আমাদের চেনা জগতের বা জানা জীবনের কোন সঙ্গতি নেই।—চিনিবাবু একমনে শুধু সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছেন।

রাত আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় আবদুল আবার এল—একখানা চিরকুট নিয়ে। মিসেস্ গুণবর্ধন লিখে পাঠিয়েছেন :

"আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ। রাত ঠিক আটটার সময় আপনারা সকলে যে যার বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বরের কাছে পাঁচ মিনিটের জন্য প্রার্থনা করবেন—যেন পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর সমস্ত জীবজন্তুর সমস্ত কীটপতঙ্গের মঙ্গল হয়।

আমার ধর্মসমাজের এই একটিমাত্র আইন এ গ্রামের সকলেই মেনে চলে।"

অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলাম। প্রার্থনা? আমরা করব প্রার্থনা? কার কাছে প্রার্থনা করব? কে শুনবে আমাদের প্রার্থনা?...

ঢং ঢং করে কোথা থেকে একটা পেটা ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—আটটা। হঠাৎ মনের ভিতর থেকে কে যেন একটা জরুরি তাগাদা দিয়ে উঠল—আর সময় নেই। বিছানায় বসেই চোখ বুজে বহুকাল আগে বাবার মুখে শোনা কতকগুলো কথা আবৃত্তি করতে শুরু করলাম:

'ওঁ দ্যৌঃ শান্তি রন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি
রাপঃ শান্তি রোষধয়ঃ শান্তি র্বনস্পতয়ঃ শান্তি
র্বিশ্বে দেবাঃ শান্তি র্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তিরেধি॥'

ভাল করে মানে না বোঝা কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতে মনে হল যেন চোখের সামনে একটা উজ্জ্বল প্রদীপের শিখা জ্বলছে—তার পর দেখলাম, একটা নয়, পাশাপাশি সারি সারি অসংখ্য আলোক-শিখা। ক্রমশ শিখাগুলি দীর্ঘতর হয়ে উঠছে—আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। উর্ধ্বে আকাশ যেন আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। তার পর মনে হল, এ আলো নীচে থেকে উপরে উঠছে না—উপর থেকে নীচের দিকে ঝরে পড়ছে। উর্ধ্বগামী শিখার মালিকা এ নয়—অধোগামী জ্যোতির্বিন্দুর বর্ষণ।

তার পর ফস্ করে সব মিলিয়ে গেল। চোখ মেলে দেখি, হিতেনবাবু, লাবু, এমন কি চিনিবাবু পর্যন্ত চোখ বুজে চুপ করে বসে আছেন। মেঝের উপর আবদুল পশ্চিম দিকে ফিরে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে মাটির উপর মাথা ঠেকিয়ে পড়ে আছে।

একটু পরেই মেবেল ও আর একটি মেয়ে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এল—গরম গরম, হাতে-গড়া, ভুষিসুদ্ধ আটার রুটি, আর তার সঙ্গে অড়হরের ডাল, আলু কুমড়োর ডালনা আর পুদিনার চাটনি।

মেবেলের হাতে আর একখানি চিরকুট : "এর সঙ্গে পেট্রোলের দামটা পাঠিয়ে দেবেন।"

এত রাত্রে আবার পেট্রোল কোত্থেকে আসবে? যাই হ'ক, আমাদের এত চিন্তা কিসের। মিসেস্ গুণবর্ধনই সব ব্যবস্থা করবেন—আমরা শুধু টাকা দিয়েই খালাস। চার গ্যালন পেট্রোলের দাম দিয়ে দিলাম।...

সকাল বেলায় উঠে দেখি, গাড়িতে তেল ভর্তি করা হয়ে গেছে—আবদুল ও আর একজন লোক অতি যত্নে উচ্চৈঃশ্রবাকে ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে করে তুলছে।

মিসেস্ গুণবর্ধন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, রাত্রে তেল তিনি কোথায় পেলেন। উত্তরে তিনি যা বললেন শুনে আবার একবার বিস্মিত হলাম।

এই চারটি সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুকের যাতে তেলের অভাবে কোন রকম অসুবিধায় পড়তে না হয় সেইজন্য গাঁয়ের দুটি জোয়ান ছোকরা কাল রাত্রি বারোটার সময় লণ্ঠন ও টিনের ক্যানেস্তারা হাতে নিয়ে এই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে খানা-খন্দ পেরিয়ে পাঁচক্রোশ দূরে বগোদরে গিয়ে তেল কিনে নিয়ে এসেছে।

অবিশ্বাস্য হলেও, সত্য। আবদুলকে বললাম ছোকরা দুটিকে ডেকে আনতে—তাদের কিছু বকশিশ দিতে চাই।

আবদুল সসম্ভ্রমে সেলাম করে উত্তর দিল, বকশিশ তারা কেউ নিতে পারবে না। মেহ্‌মানেরা খুশি হলে খোদার দরবারে প্রচুর বকশিশ মিলবে।

বিদায় নেবার সময় মিসেস্ গুণবর্ধন শেষ অনুরোধ জানালেন, 'আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবেন।'—মুখে অনাবিল আনন্দের হাসি, কোটরগত দুই চক্ষুতে নির্মল প্রসন্নতার দীপ্তি।

গ্রাম থেকে বেরুবার মুখেই আর একজন গ্রামবাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভাই, তোমাদের এ গ্রামের নামটা কি ?'

সে ঈষৎ দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'হমারা এ গাঁওকা নাম, বাবু, গুণিবুঢ়ীকা গাঁও। দুস্‌রা কোই নাম হমলোগ মানতে নেহি।'

ডুম্‌রিতে একটা দোকানে বসে চা খাচ্ছি। আমাদের ঠিক সামনেই পথের পাশে দুজন ভদ্রলোক কিসের গভীর আলাপনে নিমগ্ন—একজন পাঞ্জাবী, অপরজন বাঙালী।

হঠাৎ বাঙালী ভদ্রলোকটি হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'ওসব ছেঁদো কথা ছাড় তো সর্দারজি। নগদ কত ফেলতে রাজি আছ বল। হাতে কিছু রূপচাঁদ না পেলে এ শর্মা তোমার জন্যে কড়ে আঙুলটিও নাড়তে যাবে না—'

কলকাতার কণ্ঠস্বর !

কলকাতা এখান থেকে বেশিদূর নয়।

গুণিবুড়ির গ্রামখানা কি সত্যিই কোথাও আছে ?

সতেরো

কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম আটজন একসঙ্গে, কাজেই উচ্চৈঃশ্রবার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাও বেশ গাদাগাদি করে বসতে হয়েছিল, কারণ একজন ছাড়া সবাই পূর্ণবয়স্ক, তার মধ্যে দুজন আবার ভুঁড়িওয়ালা মারোয়াড়ী—হিতেনবাবুর মক্কেল।

রওনা হলাম রাত বারোটার পর—ভোর হল দুর্গাপুর ব্যারাজের ব্রিজের ওপারে গিয়ে। বেলা আটটার মধ্যেই বাঁকুড়া পৌঁছে গেলাম।

গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। বাঁকুড়া থেকে রওনা

হলাম বিকেল পাঁচটার পর। এবার গাড়ি হাল্‌কা, কারণ হিতেনবাবু তাঁর মুহুরি আর মক্কেলদের নিয়ে বাঁকুড়াতেই রয়ে গেছেন—মামলার খাতাপত্র-সংক্রান্ত কি সব জরুরি কাজ আছে।

আমরা চারজন—বড়দা, চিনিবাবু, আমি ও আমার বড়ছেলে শ্রীমান শৈল—মেদিনীপুরে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ঘণ্টাকয়েক বিশ্রামের পর শেষরাত্রে আবার রওনা হলাম দীঘার পথে। পরদিন পূর্ণিমা—সমুদ্রতীরে চন্দ্রোদয় দেখতে হবে।

পুরী ওয়াল্টেয়ার গোপালপুরের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভীষণ-সুন্দর সমুদ্র দেখে আসার পর দীঘার সমুদ্রকে বড় নিরীহ বড় গোবেচারী ধরনের বলে মনে হয়। এ সমুদ্রের নর্তনে আপনারা শিব-তাণ্ডব দেখতে পাবেন না, দেখবেন মণিপুরী লীলা-বিলাস কিংবা সাঁওতালী হিল্লোল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও নিশ্চিন্তে এর জলে নামতে পারে। বাঙালীর গৃহপ্রাঙ্গণে এই সমুদ্রই যেন মানায় ভাল।

কিন্তু পূর্ণিমার কোটালে দীঘার সমুদ্রেও ধ্রুপদের মৃদঙ্গ-নির্ঘোষ শোনা যায়—চড়া জ্যোৎস্নার কড়া মদের নেশায় মাতাল হয়ে আমাদের এই গৃহপালিত সমুদ্রও সহস্র বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করে উন্মাদ-নৃত্যে মেতে ওঠে।

সেই জল-জলসার জলুস দেখবার জন্যই এবার আমরা দীঘায় এসেছি।···

কিন্তু এসেই এমন একজন লোকের পাল্লায় পড়ে গেলাম যিনি পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির খোঁচায় আমাদের সবাইকে একেবারে জর্জরিত করে ফেললেন।

ভদ্রলোক কলকাতার কোন্ এক বিলাতী সওদাগরী আপিসের বড়বাবু—মোটা মাইনে পান, দিন-দশেকের ছুটি নিয়ে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নেবার জন্য চেঞ্জে এসেছেন। নাম—ধরুন—গোবিন্দবাবু।

প্রথম পরিচয়াদির পরেই বলে উঠলেন, 'জানেন, দীঘার সমুদ্রে ঢেউ নেই।'

তার পরই বললেন, 'সমুদ্র-স্নান করব যে, তা কোথাও একটা ন্থলিয়া নেই।'

দুটি উক্তির পরস্পর-বিরোধিতা আমাদের মনে একটু কৌতুকের সঞ্চার করল বটে, কিন্তু বক্তা নিজে সে সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন—নির্বিকার ভাবে বলে যেতে লাগলেন:

—'এখানে খাবারের দোকানে রসগোল্লা নেই।'

—'পানের দোকানে সিগারেট নেই।'

—'হোটেলে রেডিও নেই।'

—'একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই।'—

—'এখানকার মাছে সোয়াদ নেই।'

—'মাংসে চর্বি নেই।'

—'কাঁচালঙ্কায় ধক্ নেই।'

—'হাট নেই, বাজার নেই, সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, তাস খেলার আড্ডা নেই—কিচ্ছু নেই মশাই, কিচ্ছু নেই।'

এতবড় নাস্তিক আমি জীবনে আর দেখি নি। আমরা যে এর পূর্বেও কয়েকবার দীঘায় এসেছি, এখানে কি আছে না আছে সবই যে আমরা জানি—তা তাঁকে জানাবার সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না। নেতি—নেতি—নেতি, তাঁর নাস্তিক্যবাদী সূত্র-ভাষ্যের অনর্গল প্রবাহে আমাদের সমস্ত বাচন-প্রচেষ্টা খড়কুটোর মত ভেসে যেতে লাগল। বহু কষ্টে কোনমতে তাঁর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলাম।

চিনিবাবু অস্ফুট কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, 'যত্তো সব ইয়ে!'

''

বিকেল হতেই গাড়ি নিয়ে সমুদ্রতীরের বেলাভূমিতে গিয়ে নামলাম।

দীঘার সমুদ্রতট একটু বিচিত্র ধরনের। অত্যন্ত কম ঢালু, প্রায় সমতল বলাই চলে। তা ছাড়া, বালুকণার দানাগুলি খুব সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে ভাঁটার সময় সেগুলি পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে যে বিচরণ-ভূমির সৃষ্টি করে তা প্রায় সিমেন্টের

মেঝের মত দৃঢ় ও মসৃণ। তার উপর মোটরগাড়ি অনায়াসে পূর্ণগতিতে ছুটতে পারে, এরোপ্লেন এসে নামতে পারে।

নামবার মুখেই দেখা হল গোবিন্দবাবুর সঙ্গে। যেন আমাদের জন্যই ওত পেতে ছিলেন। দু-একটা টুকরো কথার পরই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কেন এসেছেন এখানে? কদিন থাকবেন?'

বললাম, 'এসেছি একটু আনন্দের সন্ধানে, কাল ভোরেই ফিরে যাব।'

ভদ্রলোক মনের আনন্দে হো-হো করে হেসে উঠলেন: 'আনন্দ? এখানে এসেছেন আনন্দের খোঁজে? আরে—অমন যে কলকাতা শহর, সেখানেই কি আনন্দ আছে? দেখুন না কেন—গরিবের ট্যাঁকে পয়সা নেই, বড়লোকের মনে শান্তি নেই, বেকারের কাজ নেই, চাকুরের মাগ্‌গি-ভাতা নেই দোকানীর খদ্দের নেই, ডাক্তারের রুগী নেই, উকিলের মক্কেল নেই—আর এখানে? ফুঃ! আনন্দ-ফানন্দ কিচ্ছু নেই এখানে, মশাই, কিচ্ছু নেই।'

গোবিন্দবাবুর সর্বগ্রাসী নৈরাজ্যবাদ চিনিবাবুরও অসহ্য হয়ে উঠল। হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই তো করছেন! কিন্তু জানেন, এখানে এমন একটা জিনিস আছে যা আর কোথাও নেই? বালির উপর পদ্মফুল ফুটতে দেখেছেন কখনও?'

—'কি যে বলেন মশাই, তাই কি কখনও হয়?'

—'হয়, হয়—দীঘাতে হয়। দুনিয়ায় কত কি হয়, তার কটার খবর রাখেন আপনি?'

—'তাই বলে, বালির উপর পদ্মফুল!—না মশাই, চোখে না দেখলে এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নে।'

—'বেশ, তবে চলুন, আপনাকে চোখে দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

গোবিন্দবাবুকে তুলে নিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরে চিনিবাবু গাড়ি ছোটালেন, কিন্তু মাইল-খানেক গিয়েই আবার থেমে পড়লেন। উচ্চৈঃশ্রবার হ্রেষাধ্বনির ধমকে গাংচিলের দল বেলাভূমির উপান্ত ছেড়ে দূর সমুদ্রের দিকে উড়ে পালিয়ে গেল।

—'এইবার সামনের দিকে চেয়ে দেখুন তো। জাল বাঁধবার খুঁটিটার চারপাশে ওগুলো কি?'

গোবিন্দবাবু অবাক! সত্যিই তো, খুঁটিটার চারদিক ঘিরে অসংখ্য লাল টুকটুকে পদ্মফুলের কুঁড়ি—বালির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার বালির উপরেই কাত হয়ে ঢলে পড়ে আছে। আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখে পুষ্পশিশুর দল যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—নব-সূর্যোদয়ের প্রস্ফুটন-মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে।

গোবিন্দবাবুর চোখদুটো ড্যাবডেবে হয়ে উঠেছে, মুখখানা কেমন বোকা-বোকা দেখাচ্ছে। করুণ স্বরে বললেন, 'ওখানে একটু এগিয়ে চলুন না, গোটা কয়েক ফুল তুলে নেব।'

কিন্তু—অবাক কাণ্ড! খুঁটির কাছে গাড়ি থামতেই গোবিন্দবাবু চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—একটা ফুলও কোথাও নেই।

গোবিন্দবাবু বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'এ কি হল! কোথায় গেল ফুলগুলো? এই তো এখানে ছিল দেখলাম, তবে এর মধ্যে গেল কোথায়?'

চিনিবাবু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন—গাড়ির সামনে প্রায় এক-শ গজ দূরে আবার সেই পদ্মকোরকপুঞ্জের বর্ণ-সমারোহ।

গোবিন্দবাবুর মুখে আর কথা নেই—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শুধু চিনিবাবুর দিকে চেয়ে আছেন। চিনিবাবু আঙুল নেড়ে নেড়ে গম্ভীরভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, 'আবার যদি আমরা এগিয়ে যাই, আবার ও ফুল অদৃশ্য হয়ে যাবে—আবার দূরে ওদের দেখতে পাব। একে বলে মরীচিকা-কমল,—বুঝলেন? পদ্মপুরাণের সিন্ধুখণ্ডে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শাস্তর-টাস্তর তো পড়েন না কোনদিন—এবার বাড়ি গিয়ে বইখানা পড়ে দেখবেন।'

পিছনের সীটে শৈল তখন নিঃশব্দ হাসির উচ্ছ্বাসে প্রায় বেসামাল হয়ে পড়েছে। আমাদের মুখ থেকেও গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ে আর কি!

সামুদ্রিক কাঁকড়ার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা লাল লাল দাড়াগুলোকে নিয়ে যে এমন চমৎকার পুরাণ-কাহিনী রচিত হতে পারে এর আগে কে জা

কবে ভাবতে পেরেছে ?

চিনিবাবু আবার গাড়িতে স্টার্ট দিলেন—কিন্তু বড়দার চোখের ইঙ্গিত পেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে লোকালয়ের দিকে ফিরে চললেন। কাফেটারিয়ার কাছে গোবিন্দবাবুকে নামিয়ে দিয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমরা সামনের দিকে আরও খানিকটা ঘুরে আসব।'

গোবিন্দবাবুর বিমূঢ় ভাবটা তখনও ভাল করে কাটে নি, তবু অভ্যাসের ঝোঁকেই বলে উঠলেন, 'ওদিকে? ওদিকে গিয়ে কি হবে? ওদিকে তো কিচ্ছু নেই।'

চিনিবাবু গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন।

নতুন দীঘার শহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে পিছাবনি নদীর মোহানার কাছে গিয়ে গাড়ি থামানো হয়েছে। বালিয়াড়ির কোল ঘেঁসে কম্বল বিছিয়ে তার উপর চারজন চুপ করে বসে আছি।

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, চাঁদ উঠছে। রাত্রি ও দিবসের রহস্যময় সন্ধিক্ষণটি ক্ষীণদীপ্তি যুগল আলোর সংমিশ্রণে এক বিচিত্র পীত-পাণ্ডুর আভায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে।

চাঁদ উঠছে। যেন ছোট ছোট এক-একটা লাফ দিচ্ছে আর জলের ভিতর থেকে এক-একবারে খানিকটা করে উপরে উঠে আসছে। একটু আগে স্বর্ণবৃত্তের যে বিরাট চাপখানি দিগন্তের সমগ্র কোণটি পরিব্যাপ্ত করে আস্তে আস্তে জেগে উঠেছিল, এখনকার চন্দ্রমণ্ডল তার তুলনায় অনেক ছোট কিন্তু অনেক বেশি উজ্জ্বল। এখনও তার নিম্নাংশ জলের নাগাল ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি—নীচের দিকটা একটু লম্বাটে হয়ে পেয়ারার বোঁটার দিকের মত দেখাচ্ছে; সমুদ্র যেন তাকে টেনে ধরে রেখেছে—ছাড়তে চাইছে না। তার সামনে সাগরের জল উত্তাল হয়ে উঠেছে—সোনায় রুপোয় জর্দায় জাফ্‌রানে রঙিন আলোর জলছবির পশরা সাজিয়ে বসেছে।—আমরা মন্ত্র-মুগ্ধের মত চেয়ে বসে আছি।……

বোঁটাছেঁড়া চাঁদ একলাফে আকাশের অনেকখানি উপরে উঠে থমকে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-দিকের নদীর মধ্যে কল্লোল-কোলাহল জেগে উঠল,—

সিন্ধুর বিজয়-রথ পশিল নদীতে,
আসিল জোয়ার।

চেয়ে দেখি, শুধু রথ নয়, হাজার হাজার সাদা ঘোড়া কেশর ফুলিয়ে নদীর উজানে ছুটে চলেছে—গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সিন্ধুর এই বিজয়-বার্তা পৌছে দেবার জন্য। জোয়ার এসেছে। পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার। মানুষের মাটির কেল্লার বিরুদ্ধে বারি-বাহিনীর বিপুল অভিযান।.....

হঠাৎ একটা অব্যক্ত আওয়াজ করে চিনিবাবু এক লাফে কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর তীরের মত ছুটে চললেন উচ্চৈঃশ্রবার দিকে। যে অপূর্ব অনুভূতির ছন্দ-ঝঙ্কার এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে বেজে চলেছিল হঠাৎ তার তাল কেটে গেল।—কি হল আবার চিনিবাবুর?

সর্বনাশ! উচ্চৈঃশ্রবার চারখানা চাকাই প্রায় পাঁচ ইঞ্চি করে বালির মধ্যে ডুবে গেছে। সামনের দিকে চেয়ে দেখি, ফেনা ও বালির সম্মিলিত পিঙ্গল উর্ধ্বোচ্ছ্বাসের আস্ফালন করতে করতে প্রায়-সমতল বেলাভূমির উপর দিয়ে জোয়ারের সমুদ্র প্রচণ্ড আক্রোশে আমাদের দিকে ছুটে আসছে—প্রতি সেকেণ্ডে দশ গজ করে এগিয়ে আসছে। একটু আগেই যে বালু-প্রান্তর শান-বাঁধানো মেঝের মত নিরেট শক্ত বলে মনে হচ্ছিল, এর মধ্যেই তা ভিতরে ভিতরে রসস্থ হয়ে উঠে আমাদের রথচক্র গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

আমরা তিনজনে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে প্রাণপণে ঠেলতে লাগলাম, চিনিবাবু পূর্ণবেগে এঞ্জিন চালিয়ে দিলেন—কিন্তু কিছুতেই উচ্চৈঃশ্রবাকে স্থানচ্যুত করা গেল না। ভরূর্ ভরূর্ করে পিছনের চাকা দুখানা ঘুরছে, কিন্তু যত ঘুরছে ততই শুধু ভিজে বালির রাশি ছিটকে এসে আমাদের জামা-কাপড়ে লাগছে—চাকা ততই আরও গভীর ভাবে বালির মধ্যে বসে যাচ্ছে।

ওদিকে ফুটন্ত ফেনার রেখা হুড় হুড় করে এগিয়ে আসছে—এই এসে

পড়ল বলে। আতঙ্ক উৎকণ্ঠা হতাশায় মিলিয়ে তখন আমাদের মনের সে এক বিচিত্র অবস্থা। জ্যোৎস্না-প্লাবিত সমুদ্রের সেই সৌন্দর্য-স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেছে—আমরা তখন দেখছি শুধু এক দুর্দান্ত হিংস্র শ্বাপদের ক্ষুধার্ত দংষ্ট্রা-বিকাশ, শুনছি শুধু তার উন্মত্ত হুহুঙ্কার।

চিনিবাবু গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে অ্যাক্‌সিলারেটর চেপে ধরেছেন—উচ্চৈঃশ্রবার হ্রেষাধ্বনি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে শেষকালে একটা করুণ গোঙানিতে পর্যবসিত হয়েছে।

আমরা হাঁপাচ্ছি, কপাল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে।

এসে পড়েছে! পায়ের জুতো ভিজে উঠেছে। আমাদের খুব কাছে, চারিদিকে বিজয়ী সমুদ্রের খল্ খল্ অট্টহাসির বিদ্রূপধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আর রক্ষা নেই।……

জল প্রায় এক-কোমর হয়েছে। চিনিবাবু এঞ্জিন বন্ধ করে ড্রাইভিং সীটের উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তাঁর পা দুখানাও জলে ডুবে গেছে।

এক রকম জোর করেই তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামালাম। তার পর সবাই মিলে কূলে এসে হাঁচড়-পাঁচড় করে বালিয়াড়ির উপর উঠে পড়লাম।

চিনিবাবু বালিয়াড়ির মাথার উপর ধুপ করে বসে পড়লেন—সমুদ্রের দিকে মুখ করে। তার পর ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন।

বড়দা বললেন, 'আবার বসলে কেন? এখুনি দীঘায় যেতে হবে - যদি কোন ব্যবস্থা করা যায়!'

চিনিবাবু বললেন, 'আপনারা যান, আমি এখানেই থাকব।'

অগত্যা শৈলকে তাঁর কাছে রেখে আমি আর বড়দা প্রায় ছুটতে ছুটতে চার মাইল পথ অতিক্রম করে শহরে এসে পৌছুলাম। স্থানীয় ফরেস্ট অফিসার তখন দীঘাতেই ছিলেন—তাঁর একখানা জীপগাড়ি আছে জানা ছিল। তাঁরই শরণাপন্ন হলাম।

সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'তাই তো—বড়ই বিপদে পড়েছেন দেখছি। তবে আপনারাই প্রথম নন। বছরখানেক আগে বাঁকুড়ার এক ডাক্তারবাবুও

ঠিক এমনি করে তাঁর গাড়িখানি খুইয়ে গেছেন। কিন্তু এখন তো এর কোন সুরাহা করা সম্ভব নয়—আবার ভাঁটা পড়লে তবে লোক-লস্কর রশারশি নিয়ে গিয়ে গাড়ি টেনে তুলতে হবে।—তবু চলুন একবার, দেখে আসি ব্যাপারটা, আর ঐ সঙ্গে আপনাদের বন্ধুকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসি।'

গাড়িতে উঠে ষ্টিয়ারিঙে বসে আবার বললেন, 'কিন্তু আপনাদের গাড়ি আর আপনারা ফিরে পাবেন না। নোনা জল ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে, এঞ্জিন ব্যাটারি টায়ার হুড বডি সব ক্ষইয়ে দেবে—কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে। সমুদ্র যাকে গ্রাস করে তাকে একেবারে জীর্ণ করে ফেলে। আপনারা ফিরে পাবেন শুধু স্ক্র্যাপ-আয়রন—ভাঙা লোহা-লক্কড়—তাতে গাড়ির গাড়িত্ব আর কছুই থাকবে না।'...

বালিয়াড়ির টিলার উপর চিনিবাবু তখনও ঠিক তেমনিভাবে চুপ করে বসে আছেন—মুখে সিগারেট জ্বলছে। পাশে শৈল দাঁড়িয়ে আছে—ম্রিয়মাণ নৈরাশ্যের প্রতিমূর্তি।

জল অনেক উঁচু হয়ে ফেঁপে উঠেছে। জোয়ারের ঢেউ বালিয়াড়ির পাদমূলে এসে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের সহস্র হস্তে নীল করতালি বাজছে, উৎক্ষিপ্ত লাজাঞ্জলির মত বিচ্ছিন্ন ফেনপুঞ্জ চাঁদের আলোয় ঝকমক করে উঠছে। অখণ্ড অনন্ত বারিবিস্তার ছাড়া আর কোথাও কিছু নজরে পড়ে না।

চিনিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'গোবিন্দবাবু ঠিকই বলেছিলেন বড়দা, এখানে কিছু নেই। ঐ দেখুন, আমার উচ্চৈঃশ্রবাও আর নেই।'

চাঁদের আলোয় চিনিবাবুর দুই চোখের কোণে কি যেন চিকচিক করে উঠল।

মুখে তাঁর কান্নার চেয়েও করুণ একটু ম্লান হাসি।

এই হল উচ্চৈঃশ্রবার অপমৃত্যুর ইতিহাস।

শেষ